বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

লক্ষ্মীপুর

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

লক্ষ্মীপুর

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মোঃ মাইন উদ্দিন পাঠান

সংগ্রাহক
মহব্বত উল্লাহ
মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন
মোঃ আনোয়ার হোসেন

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
লক্ষ্মীপুর

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২২/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩১৪

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : LAKSHAMIPUR (Present state of Folklore in Lakshamipur District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain., Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 300.00 only. US$: 5

ISBN-984-07-5323-1

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায়

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক

www.pathagar.com

কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল, বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান।

www.pathagar.com

২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান লক্ষ্মিপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্মিপুরের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৭১

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. জনবসতির পরিচয়
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল
চ. প্রসিদ্ধ হাট-বাজার
ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
ঝ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
ঞ. মুক্তিযুদ্ধ
ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়াল

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৭২-১০৬

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকপুরাণ
ঘ. লোকছড়া
ঙ. ভাট কবিতা
চ. বন্দনা

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material folk culture) ১০৭-১৩২

লোকশিল্প (folk art)
১. শীতল পাটি
২. মুড়িশিল্প
৩. মৃৎশিল্প
৪. বাইনশিল্প
৫. বাঁশ ও বেতশিল্প
৬. সুচিশিল্প
৭. লোহাশিল্প
৮. স্বর্ণশিল্প
৯. আয়না বাঁধাই শিল্প
১০. নারকেলের ছোবড়ার হস্তশিল্প

www.pathagar.com

লোকখাদ্য (folk food) ১৩৩-১৪১

১. খেজুরের রস
২. পিঠাপুলি
৩. চিতল পিঠা
৪. পাটিসাপটা
৫. ডিমের পিঠা
৬. চমচম
৭. খোয়াসাগর
৮. সানকি পিঠা
৯. চাঁইয়া পিঠা (মুষ্ঠি পিঠা) বা শীতের পিঠা
১০. ভাঁপা পিঠা
১১. তালের পিঠা
১২. ঝালপিঠা
১৩. মুড়ি

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৪২-১৪৫

১. দোচালা খড় বা ছনের ঘর
২. খড়ের পুঞ্জি বা পারা

লোকসংগীত (folk song) ১৪৬-২০০

ক. কবি গান
খ. খিস্তি-খেউড়
গ. দ্বিন-দুনিয়ার জারি
ঘ. ৬ দফার গান/বঙ্গবন্ধুর গান
ঙ. গজল
চ. মারেফাত
ছ. আঞ্চলিক গান
জ. বারোমাসি
ঝ. ধর্মসংগীত
ঞ. গাছ টানার বুলি (বোল)
ট. করাতির গান/বুলি
ঠ. বিয়ের গান
ড. লোকগীতি-নকশা/শাবাল কন্যার গান
ঢ. মাজারের গান (ধর্মসংগীত)
ণ. উড়ি গান
ত. রস-সংগীত
থ. আসরের গান
দ. কীর্তন

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২০১-২০৬

১. মৃদঙ্গ
২. ঢোল
৩. ঢাক
৪. দোতরা
৫. জুড়ি
৬. তবলা
৭. বাঁশি
৮. শিঙ্গা
৯. নাল
১০. পাতার বাঁশি
১১. শঙ্খ
১২. ঘণ্টা
১৩. কাঁসা
১৪. ডুগডুগি
১৫. পাতিলের তলা কলসী

লোকনাট্য (folk theatre) ২০৭-২১৪

লোকউৎসব (folk festival) ২১৫-২২৩

১. নবান্ন
২. নববর্ষ
৩. রথযাত্রা
৪. ওরস
৫. পৌষ-পার্বণ

লোকাচার (ritual) ২২৪-২৩১

১. লক্ষ্মীপূজা
২. ব্রত পার্বণ (ব্রতের ভাত)
৩. লোকশ্রুতি
৪. ওরস-মাজার, সদর
৫. দরবেশ হুজুরের মাজার-কুশাখালীল হুজুর (রহ.), সদর
৬. প্রবাদ-প্রবচন, লোকশ্রুতি, লোক-বিশ্বাস
৭. জন্মাষ্টমী
৮. বিয়ে
৯. জন্মদিন
১০. অন্নপ্রাসন

লোকমেলা (folk fair) ২৩২-২৩৪

১. বুড়াকর্তার মেলা
২. খানকা মেলা

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া (folk games) ২৩৫-২৫২
ক. চিরি খেলা-জক্করজানি
খ. হাঁস খেলা
গ. কেলাপোপা ভোঁ-ভোঁ
ঘ. ছড়ি খেলা
ঙ. লাঠি খেলা
চ. মার্বেল খেলা
ছ. ষাঁড়ের লড়াই
জ. নৌকা বাইচ
ঝ. গোল্লাছুট
ঞ. মাছ মাছ খেলা
ট. মাংস চুরি
ঠ. আকাশের তিন তারা
ড. মালাছাড়ি
ঢ. লাটিম খেলা
ণ. লতালতা খেলা
ত. সাপের খেলা
থ. লোকখেলা

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২৫৩-২৭৯
১. নৌশিল্প,
২. জেলে পল্লী
৩. খেজুরের রস ও গাছি
৪. মৃৎশিল্পী
৫. ফসল

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ২৮০-২৮৬
ক. লোকচিকিৎসা
খ. তন্ত্রমন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ২৮৭-২৮৯

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings and proverb) ২৯০-২৯৩

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ২৯৪-৩০৫
ক. লোকবিশ্বাস
খ. লোকসংস্কার

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩০৬-৩১২
১. ঢেঁকি
২. যাঁতা
৩. বাঁশ বেতের মাছ ধরার যন্ত্র

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

'লক্ষ্মী' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ধন-সম্পদ বা সৌভাগ্যের দেবী (দুর্গাকন্যা ও বিষ্ণু-পত্নী) এবং 'পুর' হলো শহর বা নগর। সুতরাং লক্ষ্মীপুর-এর সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় সম্পদসমৃদ্ধ শহর বা সৌভাগ্যের নগরী। কখন কীভাবে লক্ষ্মীপুর নামকরণ হয়েছে তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। ঐতিহাসিক কৈলাশচন্দ্র সিংহ 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরা'র ইতিহাস লিখতে গিয়ে তৎকালীন নোয়াখালীর পরগনা ও মহলগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। এতে দেখা যায়, বাঞ্ছানগর ও সমসেরাবাদ মৌজার পশ্চিমে 'লক্ষ্মীপুর' নামে একটি মৌজা ছিল। আজকের পশ্চিম লক্ষ্মীপুর মৌজাই তৎকালীন লক্ষ্মীপুর মৌজা।

সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা আরাকান থেকে পলায়ন করে ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি ধাপা ও শ্রীপুর হয়ে ৯ মে 'লক্ষ্মীদহ পরগনা' ত্যাগ করে ভুলুয়া দুর্গের ৮ মাইলের মধ্যে আসেন। ১২ মে ভুলুয়া দুর্গ হস্তগত করতে না পেরে আরাকান চলে যান। লক্ষ্মীপুর শহরের পূর্ব পাশের একটি সড়ক 'সুজা বাদশা'র রাস্তা নামে পরিচিত। সেই লক্ষ্মীদহ পরগনা থেকে লক্ষ্মীপুর নামকরণ করা হয়েছে বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে মগ ও ফিরিঙ্গিদের মিলিত বাহিনী ভুলুয়া, ভবানীগঞ্জ ও ইসলামাবাদ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। স্যার যদুনাথ সরকার এ সংক্রান্ত বর্ণনায় লিখেছেন, ইসলামাবাদ চাটগাঁ শহর নয়। ভুলুয়া পশ্চিমে একটি দুর্গসমৃদ্ধ শহর। ঐতিহাসিক ড. বোরাহ ইসলামাবাদকে লক্ষ্মীপুর বলে ধারণা করেছেন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বর্তমান কামানখোলা নামক স্থানটি তৎকালের মেঘনার পাড়ে দুর্গসমৃদ্ধ ইসলামাবাদ এবং তা লক্ষ্মীপুর মৌজার অংশ ছিল। শ্রীসুরেশ চন্দ্রনাথ মজুমদার 'রাজপুরুষ যোগীবংশ' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে লিখেছেন, দালাল বাজারের জমিদার রাজা গৌরকিশোর রায়চৌধুরী ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে রাজা উপাধি পেয়েছেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ১৬২৯-১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দালাল বাজারে আসেন। তাঁর বংশের প্রথম পুরুষের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (বৈষ্ণব) এবং রাজা গৌরকিশোরের স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। ধারণা করা হয় যে, এদের কারোর নাম অনুসারে লক্ষ্মীপুর নামকরণ করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুর নামকরণ দালাল বাজারের জমিদার কর্তৃক হয়েছিল একথা অধিক স্বীকৃত। লক্ষ্মীপুর জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি।

মূলত লক্ষ্মীপুর একটি মৌজা ও গ্রামের নাম। দালাল বাজারের জমিদারগণ এই মৌজা ও গ্রামের মালিক ছিলেন। তারা এখানে মহল, মন্দির, দিঘি, হাট-বাজার, স্কুল ও কলেজ তৈরি করে বসবাস করতেন। বর্তমান 'পশ্চিম লক্ষ্মীপুর' গ্রাম নিয়ে লক্ষ্মীপুর গ্রাম গঠিত হয়েছিল। এ গ্রামটি পশ্চিমে আরো বড় ছিল।

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

পশ্চিমাংশে এক সময় ইসলামাবাদ নামে একটি ছোট শহর ছিল। শহরের পাশ দিয়ে মেঘনা নদী বয়ে যেত। প্রমত্ত মেঘনা ইসলামাবাদ ভেঙে চুরমার করে এবং লক্ষ্মীপুর গ্রামটি পূর্বে সরে আসে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে নতুন থানা গঠনকালে প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন দালাল বাজারের তৎকালীন জমিদার থানার নাম 'লক্ষ্মীপুর' নামকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। বাঞ্ছানগরের দক্ষিণাংশে রহমতখালী নদীর পাড়ে নতুন থানা সদরের নামকরণ হয় 'লক্ষ্মীপুর' এবং মূল লক্ষ্মীপুর গ্রামটির বর্তমান নাম 'পশ্চিম লক্ষ্মীপুর'। উপজেলার নামকরণে প্রচলিত রয়েছে, লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের নামে, রায়পুর রায়বাহাদুরের নামে, রামগঞ্জ দেবতা রামের নামে, রামগতি ব্যবসায়ী রামগতি চরণ বাবুর নামে এবং কমলনগর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাকনামে নামকরণ করা হয়েছে।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে অবস্থিত লক্ষ্মীপুর জেলা পশ্চিম ও দক্ষিণে মেঘনা নদীর বিস্তৃত প্রমত্ত ও বিশাল অংশ দ্বারা বেষ্টিত। জেলার উত্তরে চাঁদপুর জেলা, পূর্বে নোয়াখালী জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ভোলা জেলা এবং পশ্চিমে ভোলা ও বরিশাল জেলা। লক্ষ্মীপুর জেলা ২২°৩০′ থেকে ২৩°১০′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°৩৮′ থেকে ৯০°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

আয়তন

লক্ষ্মীপুর জেলার আয়তন ১৪৪০.৩৮ বর্গ কিলোমিটার, এর মধ্যে ২০২.৩৪ বর্গ কি.মি. বনভূমি। সদর ৪৮০.৩৫ বর্গ কি.মি., রায়পুর ১৯৫.৯৮ বর্গ কি.মি., রামগঞ্জ ১৬৯.৩১ বর্গ কি.মি., রামগতি ২৭৯.৮৮ বর্গ কি.মি., কমলনগর ৩১৪.৮৬ বর্গ কি.মি.। মেঘনার ভাঙনে জেলার ভূ-ভাগ প্রতিনিয়ত কমছে।

জলবায়ু

জলবায়ু গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। আবহাওয়া মৃদু উষ্ণ ও আর্দ্র। সাধারণত এপ্রিল থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত গ্রীষ্ম, শেষ জুন থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষা এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল দেখা যায়। তাপমাত্রা : সর্বোচ্চ ৩৪.৩° সে., সর্বনিম্ন ১৪.৪° সে.। গড় বৃষ্টিপাত : ৩.৩০২ মি.মি.।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে লক্ষ্মীপুর ভুলুয়া রাজ্যের অংশ ছিল। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই এলাকায় প্রচুর লবণ উৎপাদন ও রপ্তানি হতো। তখন এখানে লবণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। জেলাবাসীর নীল বিদ্রোহ ও স্বদেশি আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরপরই মহাত্মা গান্ধী এ অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি রামগঞ্জের শ্রীরামপুর রাজবাড়ি ও কাফিলাতলী আখড়াতে অবস্থান করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল

www.pathagar.com

ইসলাম লক্ষ্মীপুর সফর করেন। এ ছাড়া শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বহুবার লক্ষ্মীপুরে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে এখানে ২৯টি ছোট-বড় লড়াই হয়। তন্মধ্যে ১৭টি বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। জেলার বধ্যভূমি, গণকবর ও স্মৃতিস্তম্ভ সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত। এ জেলা ছোট-বড় অনেক নদী ও খাল নিয়ে মেঘনা বিধৌত অঞ্চল। এক সময় লক্ষ্মীপুর ছিল রহমতখালী নদীর উভয় পাড়ে বাঞ্ছানগর মৌজার দক্ষিণাংশ, পার্শ্ববর্তী সমসেরাবাদ ও মজুপুর মৌজার কতক অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট শহর। পরে লক্ষ্মীপুর নামে থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ৫ নম্বর বাঞ্ছানগর ইউনিয়ন লক্ষ্মীপুর পৌরসভায় রূপান্তর হয়। পরে পৌরসভার বিস্তৃতি ঘটে আরো নতুন নতুন মৌজা নিয়ে। রায়পুর, রামগঞ্জের কয়েকটি ইউনিয়ন এবং লক্ষ্মীপুর সদর ও তৎকালীন রামগতি উপজেলা নিয়ে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুলাই লক্ষ্মীপুর মহকুমা এবং একই আয়তনে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্মীপুর জেলা গঠিত হয়। বর্তমানে জেলায় ৫টি উপজেলা, ৫৮টি ইউনিয়ন, ৪৫৫টি মৌজা, ৫৪৭টি গ্রাম এবং ৪টি পৌরসভা, ৩৯টি ওয়ার্ড, ৬৬ মহল্লা রয়েছে। উপজেলা ও থানাসমূহ হচ্ছে : লক্ষ্মীপুর সদর (১৮৬০), রায়পুর (১৮৭৭), রামগঞ্জ (১৮৯১), রামগতি (১৮৬২) ও কমলনগর (২০০৬)। পৌরসভাসমূহ হচ্ছে : লক্ষ্মীপুর (১৯৭৬), রামগঞ্জ (১৯৯১), রায়পুর (১৯৯৪), রামগতি (২০০০)। পূর্বে লক্ষ্মীপুর জেলা নোয়াখালীর অধীনে ছিল।

যে ভূখণ্ড নিয়ে বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা অবস্থিত তার আদি চিত্র এ রকম ছিল না। অধিকাংশ বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গে মত্ত থাকত। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর 'সিউতি' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে 'কমলাঙ্ক' কে সমুদ্র তীরবর্তী বলে বর্ণনা করেছেন। কমলাঙ্ক বর্তমানে কুমিল্লা ও পূর্ববর্তী ত্রিপুরা জেলার প্রাচীন নাম। কবি কালিদাস তাঁর 'রঘু বংশ' কাব্যে 'সুহ্ম দেশকে' 'তালিবান শ্যামকণ্ঠ' বলে অভিহিত করেছেন। কুমিল্লা জেলার দক্ষিণাংশ এবং নোয়াখালীর উত্তরাংশকে 'সুহ্ম দেশ' বলে বুঝিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকে এ এলাকাসমূহে প্রচুর তালবৃক্ষ জন্মে।

কথিত আছে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকের গোড়ার দিকে ভুলুয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বম্ভর শুর মুর্শিদাবাদ থেকে চট্টগ্রাম (চাঁটগাও) নৌকাযোগে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে যাবার পথে এ অঞ্চলে আসেন। এটা ছিল নিশ্চিতই নতুন জাগা চর। হয়তো তৎকালে ত্রিপুরা জেলার সাথে সম্পৃক্ত রায়পুর ও রামগঞ্জের উত্তরের ক্ষুদ্রতম কোনো একাংশ প্রাচীন ভূখণ্ড ছিল। বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার অধিকাংশ ভূমি, নদী বা সমুদ্রগর্ভ থেকে ক্রমশ চর বা দ্বীপ হিসেবে জেগে ওঠে। এ জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকার নামের সাথে চর, দ্বী, দি, দিয়া যুক্ত হয়। যে সব এলাকার সাথে 'পুর' বা 'গঞ্জ' যুক্ত হয়েছে সেগুলোও প্রাচীনতম নয়। নতুন বসতি স্থাপনকারীগণ এসব যুক্ত করেছেন। মাত্র দুশো বছর পূর্বে এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করে স্কটিশ ভ্রমণকারী ডা. ফ্রান্সিস বুখানন

www.pathagar.com

লিখেছেন, (২ মার্চ ১৭৯৮)... 'এ অঞ্চল সম্ভবত বিভিন্ন সময় চর ছিল অথবা এমনও হতে পারে এ অঞ্চল নদীর বালুকা নিয়ে গড়ে উঠেছে। সব জায়গার মাটি নরম, ঠিলেঢালা, তার সঙ্গে মিশ্রিত আছে অভ্রাল বালুকণা এবং এ মাটির স্তর বিন্যস্ত নয়। তাছাড়া কাদামাটি এখানে নেই বললেই চলে। (৫ মার্চ ১৭৯৮)...'পাতারহাট' (চরপাতা, রায়পুর) এবং লক্ষ্মীপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে নরম মাটিতে চাষাবাদ করা হয়েছে, লক্ষ্মীপুর এবং নোয়াখালীর মধ্যবর্তী এলাকা ততটা আবাদী নয়। গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে গ্রামীণ মানুষের বসতবাড়ি বেশ ছাড়া এবং অনেক অঞ্চল এখনও প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়ে আছে।'... 'পাতার হাটের তুলনায় এখানকার জমি নিচু এবং প্রত্যেক ডোবা সুন্দরবনের গাছ-গাছালিতে ভরা।'

নোয়াখালীর ইতিহাস লেখক প্যারীমোহন সেন (১৯৪০)-এর বর্ণনায় দেখা যায় যে, 'লক্ষ্মীপুর অঞ্চল এক সময় বঙ্গোপসাগরের অংশ ছিল। সে স্থানে ভীষণ ঊর্মিমালা উত্থিত হইয়া মানবের ভীতি সঞ্চার করত, সেই স্থান এক সময়ে অর্ণবচরগণে পরিব্যাপ্ত ছিল। অধুনা সেই স্থানে বহু মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতেছে'। ড. কাদের (১৯৯১)-এর বর্ণনায় জানা যায়, 'ফেনী নদীর পশ্চিমে, মেঘনা নদীর পূর্ব, ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার অন্তর্গত মেহারের দক্ষিণ এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগই সমুদ্র গর্ভজাত।' এখানে নতুন ভূমি জেগে উঠলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ চাষাবাদ উপলক্ষে এবং আরব দেশীয় বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে জনবসতি গড়ে তোলে। তারপর মেঘনা নদীর ভাঙা-গড়ার মধ্যে এবং প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে লক্ষ্মীপুরের মানুষ টিকে আছে। এক সময়ের সমৃদ্ধ নগরী ইসলামাবাদ মেঘনা নদীর গর্ভে বিলীন হয়। কালক্রমে নদী গর্ভে আরো বিলুপ্ত হয় সমুদ্র উপকূলবর্তী ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী অনেক জানা-অজানা প্রসিদ্ধ জনপদ ও শহর বন্দর—ইবনে বতুতার বর্ণনায় যার উল্লেখ আছে।

আজকের লক্ষ্মীপুর জেলা যে ভূ-খণ্ড নিয়ে গঠিত ইতিহাসে তার কোনো অতীত অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর বলে সমকালীন ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন সময় মন্তব্য করেছেন। বিশ্বম্বর শুরের 'ভুলুয়া' রাজ্য পত্তনের সময় থেকে এ এলাকাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। এসময় পশ্চিমের মেঘনা নদী পর্যন্ত ভুলুয়া সীমানা বিস্তৃত ছিল। এ হিসেবে লক্ষ্মীপুর জেলা ভুলুয়ার অধীন ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ভুলুয়া জয় করেন। এখানে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মেঘনা উপকূলীয় সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী দুর্গ ও নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। তখন প্রমত্ত মেঘনা নদী ফরাশগঞ্জ ও ভবানীগঞ্জের উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত ছিল। উল্লেখ্য, ভুলুয়া পরগনায় ভুলুয়া নামক একটি গ্রাম ছিল, যা মাইজদী (নোয়াখালী) শহরের দক্ষিণ পশ্চিমের ১৫ মাইল এবং ভবানীগঞ্জের (লক্ষ্মীপুর) ৩ মাইল পূর্বে ছিল। বর্তমান শহর কসবা ও তেওয়ারীগঞ্জ গ্রামগুলোর কোনো এক জায়গায় ভুলুয়া গ্রামের সীমানা ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মোঘলরা ভুলুয়া দখল করে। তারা শহর কসবায় একটি মিলিটারি আউট পোস্ট স্থাপন করেন। যা ছিল পূর্বাঞ্চলে মোঘলদের প্রধান নৌ-ঘাঁটি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট শাহজাহানের সময় বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান

www.pathagar.com

সন্দ্বীপ ও চটগ্রামে পর্তুগিজ জলদস্যু ও আরাকানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এজন্য ঢাকার 'লালবাগ দুর্গ' থেকে পাঠানো স্থল বাহিনী চাঁদপুর হয়ে ডাকাতিয়া ও মেঘনা নদীর পথ ধরে শহর কসবায় এসে নৌবাহিনীর সাথে মিলিত হয়। এভাবে নদী দিয়ে লক্ষ্মীপুর জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমানা চিহ্নিত করা যায়। উত্তর ও পূর্ব সীমানা বর্তমানের মতোই ছিল।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সিরাজ উদ-দৌলার পতনের পর রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ভুলুয়াকে ঢাকার অধীনে, ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের অধীনে এবং ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে নিয়ে যায়। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে ভুলুয়াকে পৃথক জেলায় রূপ দেয়া হয়। ১৮২৯ সালে ভুলুয়া চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে আসে। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এ ভূ-খণ্ডের মর্ধবর্তী অঞ্চলে চাষাবাদ ও যোগাযোগের স্বার্থে একটি নতুন খাল খনন করা হয়। ওই নতুন খালের গুরুত্ব বিবেচনায় ভুলুয়ার নামকরণ হয় নোয়াখালী ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে লক্ষ্মীপুর ছিল লবণ ও বস্ত্রশিল্পে সমৃদ্ধ। লক্ষ্মীপুরের উৎপাদিত লবণ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং ইংল্যান্ডে রপ্তানি হতো। তাঁত শিল্পগুলো স্থানীয় চাহিদার অনেকাংশ মেটাতে সক্ষম ছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীগণ এ অঞ্চলে কাপড়ের ব্যবসায় সম্পৃক্ত ছিল। 'সল্ট হাউজ' ও 'কুঠি বাড়ি'গুলো এ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করত। সাহাপুর কুঠি বাড়ি, জকসিন কুঠি বাড়ি ও রায়পুরের উত্তরে সাহেবগঞ্জ কুঠি বাড়ি লবণ ও বস্ত্র ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। পাশাপাশি নীল চাষে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বাধ্যকরণে নিয়োজিত ছিল। মেঘনা নদী, ডাকাতিয়া নদী, রহমতখালী নদী, ভবানীগঞ্জ খাল, ভুলুয়া খাল ও জারিরদোনা খাল অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে ভূমিকা রাখত। এসব নদীতে পণ্যবাহী বড় বড় বালাম নৌকা আসত। আবার ধান, সুপারি, নারিকেল, লবণ, মরিচ ও অন্যান্য ফসল নিয়ে দূরবর্তী কোনো গঞ্জ বা বন্দরে চলে যেত। মেঘনার অববাহিকায় সমুদ্রগামী নৌকা-জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে ওঠে। এখানে নৌকা-জাহাজ নির্মাণ উপযোগী বনজ কাঠ সহজে পাওয়া যেত। প্রাচীন তুরস্কের সুলতানগণ এ অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ করাতেন বলে জানা যায়। রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, দালাল বাজার, ভবানীগঞ্জ, তেওয়ারীগঞ্জ (শহর কসবা) ও ফরাশগঞ্জ ছিল এ জেলার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। ভবানীগঞ্জকে তৎকালে 'ছোট কোলকাতা' বলা হতো। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্মীপুরে মুন্সেফি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর মুন্সেফ ও উকিল-মোক্তারগণ এখানে আসতে থাকেন। তাঁরা নিজেদের বাসযোগ্য নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে লক্ষ্মীপুরকে আধুনিক জীবনযাপননির্ভর শহর গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তাঁরা লক্ষ্মীপুরে একটি ইংলিশ স্কুল (পরবর্তী সময়ে লক্ষ্মীপুর মডেল হাই স্কুল), পাবলিক লাইব্রেরি ও টাউন হল, বাণী রঙ্গালয় মিলনায়তন ও বার লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। শহরের স্বর্ণকার পট্টি ছিল শহুরে লোকের মদিরালয় বা নিষিদ্ধ পল্লী।

লক্ষ্মীপুর জেলার মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সাহসী ও কর্মদ্যোগী, বুদ্ধিদীপ্ত, কৌশলী ও নেতৃত্বাধীন। শত বছর থেকে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বহিঃগমনমুখিতা জেলাবাসীকে

www.pathagar.com

অধিকতর সামর্থ্যবান করেছে। স্থানীয়ভাবে যারা বসবাস করেছেন তাদের কৃষিকাজ, মাছধরা এবং হাট-বাজারে ব্যবসায় রয়েছে এবং তারা সেসব কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বড় একটা অংশ দেশের বিভিন্ন স্থানে কিংবা বিদেশে যোগ্যতর অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনেছে। মূলত নদী, পানি, বৃষ্টি, বন্যা, পলিযুক্ত নরম সবুজ প্রকৃতি এ জেলার মানুষকে সহজ-সরল জীবনযাপন উপহার দিয়েছে। ফলে এক সময় এ জেলা ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার দূরবর্তী জেলা হওয়ায় মানসম্মত জীবন যাত্রার ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় মানুষ কঠোর পরিশ্রমী হয় এবং তাদের বহিমুর্খী দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়ে উঠেছে।

ঘ. জনবসতির পরিচয়

ভুলুয়া রাজ আমলে এ অঞ্চলে ঘনবসতি ছিল না। ঢাকা (বিক্রমপুর) ও বরিশাল (চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলা) প্রভৃতি জেলা থেকে লোক এসে এ জেলায় বসতি স্থাপন করেন। তুর্কি শাসনের সময় নৌ-ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে এখানে আরো নতুন বসতি স্থাপিত হয়। মোঘল-দখলে আসার পূর্বে পর্তুগিজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচারে (খাজনা, ধান, সোনাদানাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে) দেশের সম্পূর্ণ দক্ষিণাঞ্চলের সাথে এ অঞ্চলও বিরাণভূমিতে পরিণত হয়। তবে মোঘল আমলে নবপর্যায়ে জনবসতি শুরু হয়। শহর কসবা বন্দর জমজমাট হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দর থেকে বাণিজ্য জাহাজ নোঙ্গর করত বলে জানা যায়। শহর কসবা ছিল সেকালের উপকূলীয় প্রধান নৌ-বন্দর। এসময় দিল্লি থেকে আগত রাজকর্মচারীসহ কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার, আরব ও ইরান থেকে আগত কিছু ধর্মপ্রচারক, শেরশাহের আমলে আগত পাঠান এবং ঈশা খাঁর যুদ্ধে বিদ্রোহী পাঠানগণ এ অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করেন। এ ছাড়া পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল থেকে আগতরা কিছু নতুন বসতিও স্থাপন করে। ফলে লক্ষ্মীপুর জেলার সংস্কৃতি বহুমাত্রিক ধারায় গড়ে ওঠে। স্থানীয় অধিবাসীগণ দীর্ঘসময় ধরে এসব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে কোনোটি নিজেদের মধ্যে চর্চায় এসেছে, আবার কোনোটি হিন্দু-মুসলিমের ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এসেছে।

জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,২৯,১৮৮ জন। পুরুষ ৮,২৭,৭৮০ জন ও মহিলা ৯,০১,৪০৮ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২০০ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮। জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম ১৬,৬৯,৪৯৫ জন, হিন্দু ৫৯,৪১৭ জন, খ্রিস্টান ১০৬ জন, বৌদ্ধ ১২০ জন, অন্যান্য ৫০ জন। মোট জনসংখ্যার ৯৬.৫৫% মুসলিম, ০৩.৪৪% হিন্দু ও ০০.০১% অন্যান্য।

ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল

লক্ষ্মীপুর জেলার বিভিন্ন তথ্যমতে, মোট পুকুর ৪১,৭২২টি, দিঘি প্রায় ১০০টি, নদী ৩টি, খাল ৬২টি। তার মধ্যে অনেকগুলো নদী, দিঘি ও পুকুরের সঠিক নাম কালের গর্ভে চাপা পড়ে গেছে। এসব ঐতিহ্যবাহী নদী, দিঘি ও পুকুরের ইতিবৃত্ত, খননকাল ও খননকর্তাদের পরিচিতি সব না পাওয়া গেলেও এখনো মানুষের মনে কৌতূহলের উদ্রেক ঘটায়।

www.pathagar.com

মেঘনা : লক্ষ্মীপুর শহর এবং জেলার রায়পুর উপজেলার সদর থেকে প্রায় ৭ কি. মি. পশ্চিম দিক দিয়ে দেশের প্রধানতম নদী মেঘনা প্রবাহমান। দক্ষিণে কমলনগর ও রামগতি উপজেলার পশ্চিমাংশ দিয়ে প্রবল ভাঙনের ফলে মেঘনা উপজেলা সদরের সন্নিকটে চলে এসেছে, জেলার সব নদ-নদী ও খাল-বিল মেঘনার জলধারার উৎস। ১৬৬০ সালের ফ্যামডেন-এর প্রকাশিত মানচিত্রে মেঘনার অনুরূপ চিত্র দেখা যায়। লক্ষ্মীপুর সদরের ভবানীগঞ্জের দক্ষিণ ও রামগতি উপজেলার উত্তরাংশ দিয়ে মেঘনা প্রবাহিত ছিল। ১৯৫৪ সালে এ অংশ বাঁধ দেয়ার পর মেঘনা বর্তমান অবস্থানে বাঁক নেয়।

ডাকাতিয়া : নদীর নাম ডাকাতিয়া। কথিত আছে যে, বহুকাল পূর্বে এ নদীপথে বর্তমান লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলত । শতমনি ও হাজারমনি নৌকায় মালামাল পরিবহন করত। মাঝে মাঝে এসব নৌকা ডাকাতের কবলে পড়ত বলে এ নদীর নাম ডাকাতিয়া। কিন্তু আরো প্রতিষ্ঠিত যে কথা, মানুষের মুখে মুখে তা হলো, এক সময় ডাকাতিয়া নদী তীব্র খরস্রোতা ছিল। মেঘনার শাখা এ নদী ডাকাতিয়ায় মেঘনার উত্তাল ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠত। ফলে ডাকাতিয়ার ছোবলে দুপাড়ের লোকজন ঘর-বাড়ি হারাত, ব্যবসা-বাণিজ্যেও নৌকা হারিয়ে যেত এবং বহু মানুষ ডাকাতিয়া পাড়ি দিতে গিয়ে আত্মাহুতি দেয়। এঁকেবেঁকে মেঘনা থেকে ওঠে রায়পুরের গ্রাম থেকে গ্রাম পেরিয়ে চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে চাঁদপুর শহরের মধ্যভাগ দিয়ে মেঘনার উৎসস্থলে শেষ হয়। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ডাকাতিয়ায় ঢাকামুখী লঞ্চ চলাচল হতো। ডাকাতিয়াকে কেন্দ্র করে এ দুপাড়ে বহু শহর-নগর-গঞ্জ গড়ে উঠেছে।

রহমতখালী : রহমতখালী নদী লক্ষ্মীপুর শহরের বুক চিরে চলে গেছে অনেক দূরে জেলার সীমানা ছাড়িয়ে অন্য জেলায়। শুরু হয় সদর থানার মজু চৌধুরীর হাটের নিকট মেঘনার মুখ থেকে। স্বাধীনতার পর রহমতখালীর মুখে একটি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়। এতে মেঘনার পথে সাগরের লোনা পানি লক্ষ্মীপুরে প্রবেশের পথরুদ্ধ হয়ে যায়। এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ রহমতখালীর বদৌলতে সবুজ-সজীব হয়। তবে স্লুইসগেট বন্ধ্যাত্বতা এনে দেয় লক্ষ্মীপুর শহরের প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য ধারায়। শত বছর থেকে এ শহরে যে নৌ-বাণিজ্য চলে আসছে তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আশার কথা, রহমতখালীর মুখে বিকল্প নেভিগেশন লক তৈরি হচ্ছে। ফলে এখানে শত শত বছরের পুরোনো নৌ-বাণিজ্য গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

ভুলুয়া : প্রাচীন ভুলুয়া পরগনার একটি নদী ভুলুয়া। জেলার রামগতি উপজেলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নোয়াখালী জেলার সীমান্ত ঘেঁষে মেঘনায় মিশেছে ভুলুয়া নদী। কালের স্রোতে ভুলুয়া মরে যায়। এতে অর্ধশত কিলোমিটার এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। সরকার প্রায় ৬৫ কিলোমিটার নদী পুনঃখনন করে ভুলুয়ার স্রোতধারা ফিরিয়ে এনে নৌপথ সৃষ্টি এবং বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠে সেচ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় পুনঃপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জানা যায়, শত শত বছর পূর্ব থেকে এ নদী পথে বিদেশি বণিক ও পর্যটকগণ এ অঞ্চলে আসে। এদের কেউ কেউ বসতি স্থাপন করে আজকের জনপদ স্থাপনে ভূমিকা রাখেন।

www.pathagar.com

ওয়াপদা খাল : চন্দ্রগঞ্জ থেকে পশ্চিম-দক্ষিণে চরশাহী, দিঘলী, চাঁদখালী, পিয়ারাপুর ও ভবানীগঞ্জের মধ্য দিয়ে পশ্চিমে মেঘনার সাথে মিলিত হয়। এটি ১৯৬৫ সালে রহমতখালীর নদীর ভাঙন থেকে লক্ষ্মীপুর শহর টুমচর মাদ্রাসা ও চন্দ্রগঞ্জ বাজার রক্ষার জন্য পানি নামার বিকল্প পথ হিসেবে ওয়াপদা কর্তৃক খনন করা হয়। এটি রহমতখালী নদীর মতোই প্রশস্ত এবং স্রোতস্বিনী। এই খালটি পূর্ব থেকে দক্ষিণ হয়ে পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাকে বিভাজন করেছে।

মহেন্দ্র খাল : ভুলুয়ার জমিদার মহেন্দ্র বাবু বন্যার পানি নামার জন্য এই খালটি খনন করেন। চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে বসুরহাট, দাশের হাট, কল্যাণপুর এবং ফরাশগঞ্জ দিয়ে দক্ষিণে ফোঁড়াখালি হয়ে মেঘনায় পতিত হয়।

কোদাল ধোয়া দিঘি : খোয়া সাগর দিঘির ১০০ গজ পশ্চিমে কোদাল ধোয়া দিঘি নামে একটি দিঘি আছে। কথিত আছে যে, খোয়া সাগর দিঘি খনন করে শ্রমিকরা কোদাল ধোয়ার জন্য ছোট্ট একটি কূঁপে এসে দৈনিক এক কোদাল করে মাটি কাটত। এরূপ দৈনিক এক কোদাল করে মাটি কাটতে কাটতে স্থানটি দিঘিতে রূপান্তর হয়। তাই এটি কোদাল ধোয়া দিঘি নামে পরিচিত।

দেওয়ান শাহ দিঘি : সদর উপজেলার ১১ নম্বর চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর গ্রামে দেওয়ানশাহ দিঘি নামে একটি দিঘি আছে। হযরত দেওয়ানশাহ ১২০৩ হিজরিতে চট্টগ্রাম থেকে এ এলাকায় আসেন বলে জানা যায়। দিঘির পাড়ে তাঁর মাজার রয়েছে। দিঘিটি ৭.৪০ একর জমিতে অবস্থিত। এর চার পাড় উঁচু টিলার মতো। দিঘির পানি মজা পানির মতো কালো। আশ্চর্য ব্যাপার হলো হযরত দেওয়ান শাহ এ দিঘিটির পানির উপর দিয়ে সবসময় হাঁটা-চলা এবং পানির উপর এবাদত করতেন। কোনো কালে এটি পানিশূন্য হয়েছে বলে কারো জানা নেই। কথিত আছে, এ দিঘির মাছ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ভোগ দখল করতে পারে না। করলে তাকে কঠিন পীড়ায় ভুগতে হয়।

জোড় দিঘি : সদর উপজেলার সমসেরাবাদ গ্রামে পাশাপাশি দুটি দিঘি আছে। এ দুটি দিঘিকে জোড় দিঘি বলে। যেন তারা ভাই-বোন কিংবা সহপাঠী। দুটি দিঘি দুই তালুকে অবস্থিত। প্রায় দুশো বছর পূর্বে এসব এলাকা নিচু ভূমি ছিল। দিঘি খনন করে সেই মাটি দিয়ে আশপাশের এলাকা ভরাট করে এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে।

হাজার দিঘি : আনুমানিক দুশো ত্রিশ বছর পূর্বে আটিয়াতলী গ্রামে কোনো এক পোদ্দার পরিবার প্রায় ৯ একর জমিতে দিঘিটি খনন করে। পরবর্তী সময়ে অগণিত অংশীদার হওয়ার কারণে দিঘিটির নামকরণ করা হয় হাজার দিঘি। দিঘির উত্তর-পশ্চিম পাড়ে এখনও পোদ্দার পরিবারের নিদর্শন রয়েছে।

বড় পুকুর : কামান খোলার জমিদার হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর বসতবাড়িতে বহু পুরোনো একটি বিশাল আকৃতির পুকুর রয়েছে, তার নাম বড় পুকুর। বর্তমানে ঐ জমিদারের ক্ষয়িষ্ণু পরিবার বিশ্বাস করে, কোনো এক সময় বড় ধরনের পূজা বা ধর্মীয় উৎসবে অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য থালা-বাটির প্রয়োজন হলে ঐ পরিবারের একজন পুকুর পাড়ে একটি চিরকুট লিখে দিয়ে আসলে কে যেন গায়েবিভাবে থালা, বাসন, বাটি দিয়ে যেত। অনুষ্ঠান শেষে আবার পুকুর পাড়ে থালা বাসনগুলো

www.pathagar.com

রেখে দিলে নিয়ে যেত। কোনো এক অনুষ্ঠানে জমিদারদের গৃহপরিচারিকা লোভ করে একটি বাসন লুকিয়ে রেখে দেয়। তারপর স্বপ্নযোগে তাকে ভয় দেখানো হলে বাসনটি দিয়ে দেয়। তারপর থেকে আর থালা-বাটির সন্ধান মেলেনি।

কোচ্চার ডগি : কোচ্চার ডগির (কচুয়ার বিল) পূর্ব-দক্ষিণে সুধারাম (নোয়াখালী), পূর্ব-উত্তরে বেগমগঞ্জ উপজেলা (নোয়াখালী), উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণে লক্ষ্মীপুর সদর। আয়তন প্রায় ৩০ বর্গ কি. মি.। স্বাধীনতার পূর্বে এ ডগি দিয়ে মেঘনায় পানি প্রবাহকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিম অঞ্চলে ভয়াবহ আত্মঘাতী যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল অসংখ্যবার। বর্ষায় শুধু আমন ধান হতো স্বল্প জমিনে, বাকিটা খালি থাকত, বর্তমানে বিশাল ইরি-বোরো প্রজেক্ট রয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বর্ষায় তালের কোঁদা ও কোষা নৌকায় শাপলা তুলত, তা খেয়ে জীবন ধারণ করত ও পার্শ্ববর্তী বাজারগুলোতে বিক্রি করে সংসার চালাত।

কিংবদন্তি : হেত্তুনীর পুকুর, ঘোড়া মারা ক্ষেত ও বুত হেত্তুনীর আড্ডা। প্রবাদ : হাঁতরেহাঁতরে হোন্দ মারায় হেতে। শ্রুতি : দিয়া ভুতে হঁত বুলায়। শুকনো মৌসুমে চারপাশের মানুষ ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি শালুক কুড়িয়ে পুড়ে খেত যা খুবই সুস্বাদু।

কাজির ডগি : কাজির ডগির (বিল) দক্ষিণে চরশাহী পশ্চিমে দিঘলী-মান্দারী, উত্তরে হাজির পাড়া ও পূর্বে চন্দ্রগঞ্জ-কামার হাট। আয়তন প্রায় ২৪ বর্গ কি. মি.। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে দুটি জঙ্গি বিমান সংঘর্ষে ভূপাতিত হয়। হাজার হাজার লাল বাহিনী (ব্রিটিশ) এই ডগিতে আসে এবং কয়েক দিন অবস্থান করে বিমানের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও লাশগুলো নিয়ে যায়। এই ডগিতে বিপুল পরিমাণ ধানসহ বিভিন্ন রবিশস্য উৎপন্ন হয়।

কিংবদন্তি : বিলের মাঝখানের বেশ কয়েকটি তাল গাছ ও একটি বড় পুকুরে ভূত প্রেতের আখড়া রয়েছে। যা নিয়ে অনেক লোকশ্রুতি স্মৃতি ও প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে।

লালাম চর : প্রায় ৩০ বর্গ কি. মি. আয়তন নিয়ে কমলনগর উপজেলার একটি বিখ্যাত বিল লালাম চর। বিশাল এই বিল নিয়ে অনেক উপকথা রয়েছে, যেমন—গরু গোতান ছাড়ি দেছ কিল্লাই, এটা কি লালাম চর হাইছোতনি।

এছাড়াও রয়েছে কামানখোলা দিঘি, ঐদারা দিঘি, কমলা সুন্দরী দিঘি, দত্তপাড়া চৌধুরীর দিঘি, দুই সতিনের দিঘি, দমদমা দিঘি, চুংদার দিঘি, লক্ষ্মীধর পাড়া দিঘি ও মাদারিয়ার দিঘি, কোরালিয়া খাল, জকসিন খাল, কাঞ্চনপুর খাল, মিঠালিয়া খাল, মুসার খাল, চাঁদর খাল, কাটাখালি, ছেঁউয়া খালি খাল, মহেন্দ্র খাল, ছয়ানীর ঝোরা, রবিয়ার খাল, জারির দোনা, গোয়াইল্লার ডগি, রমাপুরের ডগি, নলডগি, জাউডগি, আঁধার মানিক, কাজির খিল, বাদুর ডগি, নাগরাজপুর হাঁতর, রায়পুর জাউডগি, বিরবিরি চর, চর কাদিরা, বিবির হাঁতর কচুয়ার ডগি ইত্যাদি।

চ. প্রসিদ্ধ হাট-বাজার

এলাকার ঐতিহ্যবাহী হাট : ১. ভবানীগঞ্জ, ২. তেওরীগঞ্জ, ৩. দালাল বাজার, ৪. দত্তপাড়া বাজার, ৫. চন্দ্রগঞ্জ বাজার, ৬. মাদারী বাজার, ৭. ফরাশগঞ্জ, ৮. পোদ্দার হাট,

www.pathagar.com

৯. দাশের হাট, ১০. রসুলগঞ্জ, ১১. হাজির পাড়া বাজার, ১২. জকসীন বাজার, ১৩. বাইশমারা বাজার, ১৪. পালের হাট, ১৫. কালী বাজার, ১৬. বাংলা বাজার, ১৭. রায়পুর বাজার, ১৮. হায়দরগঞ্জ, ১৯. বউরব, ২০. চরবংশী খাসের হাট, ২১. বাসা বাড়ি বাজার, ২২. বাবুর হাট, ২৩. রাখালিয়া বাজার, ২৪. মোল্লার হাট, ২৫. ভূঁইয়ার হাট, ২৬. কাফিলা তলী বাজার, ২৭. কাজির দিঘির পাড় বাজার, ২৮. পান পাড়া বাজার, ২৯. মিরগঞ্জ, ৩০. পদ্মাবাজার, ৩১. রামগঞ্জ, ৩২. সোনাপুর বাজার, ৩৩. কাঞ্চনপুর চৌধুরী বাজার, ৩৪. পানিওয়ালা বাজার, ৩৫. দন্টা বাজার, ৩৬. ভাট্টা বাজার, ৩৭. করপাড়া বাজার, ৩৮. মতির হাট, ৩৯. তোরাবগঞ্জ, ৪০. লরেঞ্চ খাসের হাট, ৪১. হাজির হাট, ৪২. করুণা নগর বাজার, ৪৩. জমিদার হাট, ৪৪. আলেকজান্ডার বাজার, ৪৫. রামদয়াল বাজার, ৪৬. বিবির হাট, ৪৭. রামগতি বাজার, ৪৮. লুধুয়া বাজার, ৪৯. মুন্সীর হাট, ৫০. মাতাবক্ষর হাট, ৫১. ফাজিল ব্যাপারীর হাট, ৫২. সাহেবের হাট, ৫৩. রাস্তার হাট, ৫৪ চৌধুরীর হাট, ৫৫. দাসের হাট ইত্যাদি ।

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কলেজ : লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ (১৯৬৪), রামগঞ্জ সরকারি কলেজ (১৯৬৭), রায়পুর সরকারি কলেজ (১৯৭০), আ.স.ম আবদুর রব সরকারি কলেজ (১৯৭০), লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজ (১৯৭২), দত্তপাড়া ডিগ্রি কলেজ (১৯৬৯), রামগতি আহমদিয়া কলেজ (১৯৮৩)।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় : লক্ষ্মীপুর মডেল হাই স্কুল (১৮৮৭), এইচ এ সামাদ একাডেমী (১৯১২), লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৮১), লক্ষ্মীপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯৮), লক্ষ্মীপুর কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭০), দত্তপাড়া রামরতন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১২), দালাল বাজার এন, কে, উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৪), হাজির পাড়া হামিদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩২), প্রতাপগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৪), মান্দারী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৭), ভবানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৭), খিল বাইছা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৫), শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৮২), রামগঞ্জ মধুপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৫), রামগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭২), রায়পুর এল.এম. হাই স্কুল (১৯১১), রায়পুর মার্চেন্টস একাডেমী (১৯৫৩), রায়পুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৩), আলেকজান্ডার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৭), রামগতি আছিয়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৮), হাজির হাট মিল্লাত একাডেমী (১৯৫৮)। এছাড়াও আরো অনেক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় : লক্ষ্মীপুর পি.টি আই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় (১৯৫৩), লক্ষ্মীপুর সরকারী বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৬৫), শহীদ স্মৃতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৭২), ধর্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩৬), কাকলী স্কুল (...), রায়পুর স্টেশন মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩০), রামগঞ্জ স্টেশন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১৮), পশ্চিম আঙ্গার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৮৫), আলেকজান্ডার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১৫), মহাদেবপুর সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় (১৯৪৭)।

www.pathagar.com

কারিগরি বিদ্যালয় : লক্ষ্মীপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (২০০১), লক্ষ্মীপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (২০০৪), লক্ষ্মীপুর পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (২০০৬)।

মাদ্রাসা : লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা (১৮৫৭), ভবানীগঞ্জ কারামতিয়া ফাজিল মাদ্রাসা (১৯০৪), টুমচর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা (১৯২১), আয়েশা (রা.) মহিলা কামিল মাদ্রাসা (১৯৮৭), রায়পুর কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা (১২১৭), রামগঞ্জ রাব্বানিয়া কামিল মাদ্রাসা (১৯৬৪), রামগতি আলেকজান্ডার কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা (১৯৩৮)।

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

উপকূলীয় জেলা লক্ষ্মীপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য বার বার নদী ভাঙনে বিলীন হলেও কয়েকটি জমিদার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও এ জেলার সমৃদ্ধ অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাচীন ভুলুয়া রাজবাড়ি, ভুলুয়া বন্দর, ভুলুয়া দিঘি, ভুলুয়া দুর্গ লক্ষ্মীপুরের অন্তর্গত হলেও বর্তমানে তার চিহ্ন মাত্র নেই। তবে তাদের ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে আধুনিক সভ্য জগতের কাছে তাদের হারিয়ে যাওয়া প্রভাব প্রতিপত্তির কথা জানা যায়। লক্ষ্মীপুরের উপকূলীয় নরম মাটির মতোই মানুষের মন অতি কোমল। এ কোমলমতি মানুষগুলো স্বভাবগতভাবে ধর্মপ্রাণ। এ জনপদে নানা ধর্মীয় ও মতের

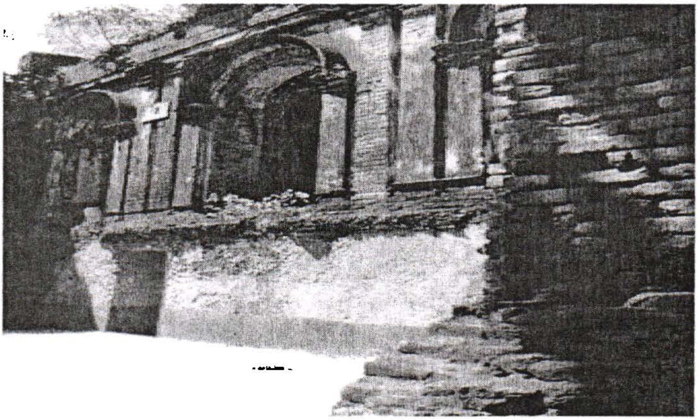

দালাল বাজার জমিদার বাড়ি

মানুষের সমাগম ঘটলেও মুসলমানদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মীপুর এলাকায় বেশকিছু প্রাচীন মসজিদ তারই ঐতিহ্য বহন করে। এক সময় এসব এলাকায় হিন্দু জমিদারদের প্রাধান্য ছিল বেশি। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন পূজা অর্চনার জন্য নির্মিত মন্দিরগুলো সে কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দালাল বাজার জমিদার বাড়ি : লক্ষ্মীপুরের অন্যতম প্রাচীন জমিদার বাড়ি দালাল বাজার জমিদার বাড়ি। দালাল বাজার সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে লক্ষ্মীপুর মৌজায় অবস্থিত প্রাচীন এই জমিদার বাড়িকে ঘিরে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। পাঁচ একর

www.pathagar.com

জমির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ গেট, জমিদার প্রাসাদ, অন্দর মহল, অন্দর পুকুর, শান বাঁধানো ঘাট এ সবই পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব নামে জনৈক ব্যক্তি কাপড়ের ব্যবসা করার উদ্দেশে এ স্থানে আসেন। তার পুত্র ব্রজবল্লভ স্বীয় দক্ষতায় ব্যবসার প্রসার ঘটান। ব্রজবল্লভ পুত্র গৌরকিশোর কলকাতায় লেখা-পড়ার সুবাদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহচর্যে আসেন এবং জমিদারি কেনেন। গৌরকিশোর ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা উপাধি লাভ করেন। গৌরকিশোর রায় ও রানি লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন নিঃসন্তান। তারা ঢাকার বিক্রমপুর থেকে গোবিন্দ কিশোরকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কিশোরের পুত্র নলিনী কিশোর রায় চৌধুরী তাদের জমিদারির খাজনা আদায়, তদারকি ও প্রসারে দক্ষতার পরিচয় দেন। জমিদার বাড়ির প্রাচীর, অন্দরমহল, নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে কয়েক টন ওজনের লোহার বিম বিরাটাকার লোহার সিন্ধুক, নৃত্যশালা বহিরাঙ্গন দেখতে আজো মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে। দালাল বাজার এন. কে উচ্চ বিদ্যালয়, চব্বিশ একর আয়তনের বিশালাকার খোয়াসাগর দিঘি, কোদাল ধোয়া দিঘি জমিদারদের স্মৃতি বহন করছে।

শায়েস্তা নগর জমিদার বাড়ি : পরগনায় শায়েস্তা নগরের জমিদার প্যারীলাল রায় বাহাদুরের দানশীলতার কথা আজও মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। রায়পুর উপজেলার শায়েস্তা নগরে এই জমিদারের বাড়িটি এখন আর অক্ষত নেই। বাড়ির সামনে পুকুর এবং ভগ্নপ্রায় শান বাঁধানো ঘাট, মন্দির জমিদারের স্মৃতি বহন করছে।

কামানখোলা জমিদার বাড়ি : লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার কামানখোলা হরেন্দ্র বাবুর বাড়িটি অন্যতম প্রাচীন জমিদার বাড়ি। রায়পুরের ক্ষেত্রনাথ রায় বাহাদুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে কয়েকটি তালুক কেনেন। জমিদারি তদারকির সুবিধার্থে তারা পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামের কামানখোলা বাজার থেকে আধা কিলোমিটার উত্তরে এ বাড়িটি নির্মাণ করেন। তিন শতাধিক বছরের প্রাচীন এ বাড়ির সামনে দ্বিতল ঠাকুর ঘর, সুরক্ষিত প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে ভেতরে গেলে চোখে পড়ে প্রাসাদ। সেই জমিদারি আজ আর নেই। তবুও জায়গায় খসে পড়া জরাজীর্ণ দালানগুলো প্রাচীন জমিদারদের ক্ষত চিহ্ন বহন করছে। রয়েছে এক সময় হাতি, ঘোড়া সবই ছিল, কিন্তু আজ হাতি না থাকলেও মৃত হাতির দাঁত আছে। বাড়ির অভ্যন্তরে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে নৃত্য ও শালিসী দরবার কক্ষ নিয়ে নানা মুখরোচক কাহিনী এলাকার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

সাহাপুরের সাহেব বাড়ি : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় দায়িত্ব নিয়ে লক্ষ্মীপুরে আগত সাহাপুরে অবস্থিত জন ফিনির এ কুঠি বাড়ি এক ঐতিহাসিক নিদর্শন। এ বাড়িতে জন ফিনি সপরিবারে থাকতেন। পাশে আরেকটি বাড়ি আছে। আটচালা বাড়ি, এটিতে থাকতেন জেমস ফনি। তাঁর এ কুঠি বাড়িটি অক্ষত অবস্থায় আছে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জন ফিনির পুত্র জন ফিনি জুনিয়র এবং তার পৌত্র রিচার্ড ডিক ফিনি কুঠি বাড়িতে ছিলেন। জন ফিনির বংশধরদের কাছ থেকে বাড়িটি ডা. উপেন্দ্রনাথ ক্রয় করেন। ডা. উপেন্দ্রনাথের পুত্র উমাকান্ত এম.বি.বি.এস. পাশ করে এসে এ বাড়িতে প্রাইভেট ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেন। ডা. উমা কান্ত বৈদ্যুতিক জেনারেটর

www.pathagar.com

দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেন। লক্ষ্মীপুরে এটিই বিদ্যুতের প্রথম ব্যবহার। এ বাড়িটি ইংরেজ আমলের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

দত্তপাড়া চৌধুরী বাড়ি : লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দত্তপাড়া চৌধুরী বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে এ বাড়িটির অবস্থান। এ বাড়ির বংশধরগণ নিজেদেরকে ভুলুয়া জমিদার রাজধর্ম প্রসন্ন কল্যাণ নারায়ণ চৌধুরীর বংশধর বলে দাবি করেন। ভুলুয়া রাজা রুদ্র মানিক্যের স্ত্রী শশীমুখী নরনারায়ণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্মচারির সাহায্যে জমিদারি পরিচালনা করতেন। অল্প সময়ের মধ্যে নরনারায়ণ রানির কৃপায় দেওয়ান পদে উন্নীত হন। এসময় থেকে কর্মচারীরা বাদশার নিকট জমিদারির বিভিন্ন অংশ বন্দোবস্ত নিতে থাকেন। এদের মধ্যে কবি কীর্তিনারায়ণ দত্তপাড়া বন্দোবস্ত নেন। দত্তপাড়া চৌধুরী বাড়ির অধিবাসীরা ভুলুয়া জমিদারের বংশধর নয় বরং রাজকর্মচারী যারা পরে জমিদারি ক্রয় করে। এই দত্তপাড়া চৌধুরী বাড়ি সম্পর্কে বিশেষ একটি শ্লোক প্রচলিত আছে— 'দত্তপাড়া পূর্ণকাশী বিষ খেয়ে মরে ১৮০'। জানা যায়, ব্রিটিশ আমলে এ চৌধুরী বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে এসে দেওয়ানজী বাড়ির লোকেরা চাকরাণির সাথে ষড়যন্ত্র করে খাওয়ার সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়। বিষমিশ্রিত খাবার খেয়ে ১৮০ জন আমন্ত্রিত অতিথি মারা যান।

রায়পুর চুন্নু মিয়ার (জমিদার) বাড়ি : লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার একটি প্রাচীন জমিদারি বাড়ি রায়পুর চৌধুরী বাড়ি। এ জমিদার বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা মুন্সি মনোহর মিঞার ছিল বিরাট জমিদারি। রায়পুরের কেরোয়া চর মোহনা এবং লক্ষ্মীপুরের মজুপুর গ্রামে ছিল তাদের তালুক। রায়পুর বাজার থেকে ১ কি. মি. উত্তর-পূর্ব দিকে রায়পুর-পানপাড়া সড়কের উত্তর পাশে এ জমিদার বাড়ির অবস্থান। জমিদারি নেই, জমিদাররা নেই। আছে জমিদারি আমলের কয়েকটি দালান, সুউচ্চ বাউন্ডারি ওয়াল, বাড়ির সামনে তহসিল অফিস এবং সুন্দর কারুকার্য খচিত একটি মসজিদ। এখনো মানুষ এ বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

করপাড়া চৌধুরী (জমিদার) বাড়ি : রামগঞ্জ উপজেলার করপাড়ার রাজেন্দ্র চৌধুরী জমিদার বাড়ি আজো জমিদারি আমলের স্মৃতি বহন করে চলছে। রাজেন্দ্র চৌধুরী, কালিপদ বসু প্রমুখ ছিলেন নোয়াখালী জেলা বারের আইনজীবী। করপাড়ার তালুক কিনে তারা এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে রাজকীয় বাড়ি নির্মাণ করেন। সুরম্য প্রাসাদ, অন্দরমহল, বৈঠকখানা, ভাণ্ডার ঘর, ঠাকুর বাড়ি, নাট মন্দির এসবের কোনোটিই আজ আর অক্ষত নেই। কেবল ধ্বংসাবশেষ মাটির সাথে মিশে আছে। বাড়ির সামনে নাট মন্দিরটি একা দাঁড়িয়ে জমিদার বাড়ির স্মৃতি পথচারীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

লক্ষ্মীপুর দায়রা বাড়ি মসজিদ : লক্ষ্মীপুরের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ আজিম শাহ দায়রা বাড়ি মসজিদ। জানা যায় ১৭৮৫ সালে মরহুম আজিম শাহ (র.) তদীয় পির, দায়েম শাহ (র.)-এর নির্দেশে লক্ষ্মীপুরে আসেন। লক্ষ্মীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে একশ গজ দক্ষিণে রাস্তার পশ্চিম পাশে যেখানে বর্তমান দায়রা বাড়ি; সে সময় এ স্থান ছিল ঝাড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আজিম শাহ যখন লক্ষ্মীপুরে এসে পৌঁছান তখন বেলা অপরাহ্ন। আজিম শাহ বাগানে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁর বের হতে বিলম্ব দেখে লোকজনের

www.pathagar.com

আশঙ্কা বেড়ে যায়। কারণ সে সময় এ বাগানে বাঘ ছিল। তারা ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পান একটি এবাদতখানা। আজিম শাহ ভেতরে সেজদায় রত। দরজায় দুটি জীবন্ত বাঘ। এই এবাদতখানাই আজকের দায়রা বাড়ি মসজিদ। ঝাড়-জঙ্গল পরিষ্কার করে আজিম শাহ (র.) বসতি স্থাপন করেন। বহু দূর থেকে মানুষ তাঁর কাছে কোরান হাদিস শিক্ষার জন্য আসত। আজিম শাহ নিজ হাতে পাটখড়ি দিয়ে কাগজ তৈরি করতেন। সে কাগজে তাঁর নিজের লেখা অসংখ্য কেতাব এখনও সংরক্ষিত আছে। উল্লেখ্য, আজিম শাহের পূর্ব-পুরুষ হযরত শাহ মোহাম্মদ লুদুন্নি হযরত শাহ জালালের সাথে এদেশে আসেন।

তিতা খাঁ জামে মসজিদ : শৈল্পিক কারুকার্য এবং দৃষ্টিনন্দন বিদেশি টাইলস-এর গাঁথুনিতে বর্তমান সময়ে লক্ষ্মীপুরের অন্যতম আকর্ষণ তিতা খাঁ জামে মসজিদ। লক্ষ্মীপুর বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে বাজারমুখী হলে প্রথমে যে মসজিদটি আগন্তুকের দৃষ্টি কেড়ে নেয় সেটি তিতা খাঁ জামে মসজিদ। মসজিদের প্রথম অংশ তিন গম্বুজবিশিষ্ট। জনৈক তিতা খাঁ-র উদ্যোগে ও দানে মসজিদটি ১২২৯ হিজরিতে নির্মিত হয়। মসজিদের ভেতরের দেয়ালে লতাপাতার কারুকাজ, নিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো জীবন্ত। সময়ের প্রয়োজনে মসজিদের দ্বিতীয় অংশ নির্মাণ করা হয়।

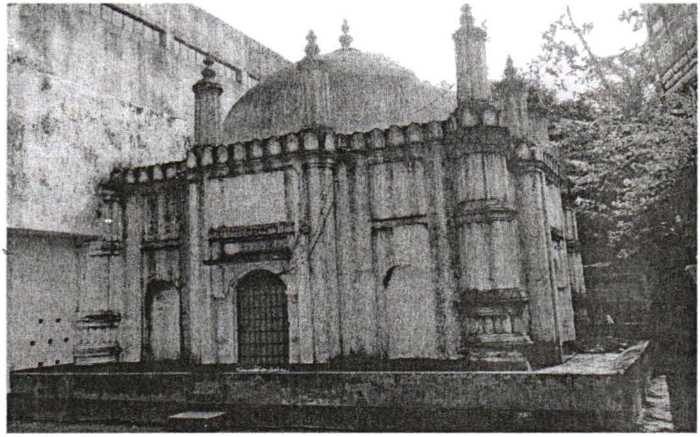

মজুপুর মটকা মসজিদ

মজুপুর মটকা মসজিদ : লক্ষ্মীপুর শহরের উপকণ্ঠে রামগতি সড়কের দক্ষিণ পূর্ব পাশে মজুপুর গ্রামে বিশাল আকারের একটি গম্বুজ মাথার উপর নিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে এ মসজিদটি। এটির নাম মটকা মসজিদ। বাংলা ১২০৬ সনে জনৈক দুল্লভ বানুর দানকৃত অর্থে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলালিপিতে আজও তা স্পষ্ট লেখা আছে। মসজিদের প্রথমাংশ বর্গাকার। ভেতরে ৪০ জন একসাথে নামাজ পড়তে পারে। মসজিদের ভেতরের দেয়ালে লতাপাতায় সুন্দর কারুকাজ তখনকার দিনের নির্মাতাদের শৈল্পিক দক্ষতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমান সময়ের প্রয়োজনে মসজিদটির বর্ধিতাংশ দ্বিতল করা হয়েছে। মসজিদের পাশে একটি দিঘি রয়েছে। মটকা মসজিদ এবং দিঘি পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

www.pathagar.com

মতির হাট জামে মসজিদ : প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা করিম (স্থাপিত : ১৯৪৫ খ্রি.), পরে মসজিদটি সংস্কার করেন খুরশিদ চেয়ারম্যান (১৯৬১ খ্রি.)। নদীর ভাঙনের মুখে কালের স্বাক্ষী এই মসজিদটির পশ্চিম অংশ নদীতে হেলে পড়েছে। মসজিদের সামনে পাকা মাঠে উত্তর-দক্ষিণে ১/১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি ফাটল ধরেছে। যে কোনো মুহূর্তেই ভেঙে মসজিদটি নদীতে তলিয়ে যেতে পারে।

সৈয়দপুর জামে মসজিদ : লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার লাহার কান্দি ইউনিয়নের পশ্চিমে সৈয়দপুর গ্রামে এ প্রাচীন মসজিদটির অবস্থান। স্থানীয়ভাবে মসজিদটি দিঘির পাড়ের মসজিদ নামে পরিচিত। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার কাল কারো জানা নেই। একটি শিলালিপি থাকলেও তার পাঠ উদ্ধার কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে মসজিদটির ইটের গাঁথুনি, গম্বুজ, দেয়াল ইত্যাদি দেখে এটিকে মজুপুর মটকা মসজিদের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়।

কাঞ্চনপুর চৌধুরী বাড়ি জামে মসজিদ : লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম কাঞ্চনপুর। পূর্বে এটি পরগনায়ে কাঞ্চনপুর নামে পরিচিত ছিল। এখানে রয়েছে হাছন আলী চৌধুরী বাড়ি নামে একটি প্রাচীন বাড়ি। এ বাড়ির সামনে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ আছে। মসজিদের উত্তরে দিঘি, দিঘির উত্তর পাড়ে মরহুম শাহ মিরান (র.)-এর মাজার। মসজিদের দেয়াল তিন ফিট চওড়া। ভেতরে তিন সারিতে ৭৫ জন মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করতে পারে। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হাছন আলী চৌধুরীর কোনো বংশধর ছিল না। ক্রয়সূত্রে মালিক সৈয়দ গোলাম আহম্মদ চৌধুরী পরবর্তী সময়ে মসজিদটি বর্ধিত করেন। প্রায় আড়াই শত বছরের পুরনো এ মসজিদের পূর্ব পাশে খোলা মাঠ। তার পূর্বে ওয়াপদা খাল উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত।

সোনাপুর বাজার জামে মসজিদ : বৃহত্তর নোয়াখালীর অন্যতম প্রাচীন এবং বৃহৎ বাজার রামগঞ্জে সোনাপুর বাজার। এ বাজারের জামে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন মরহুম পির ফজলুল হক সাহেব। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ১৩০০ সনে। মূল মসজিদটি বর্গাকারের চার দেয়ালের উপর বড় একটি গম্বুজ। মসজিদের এ অংশে একত্রে ৩৫ থেকে ৪০ জন নামাজ আদায় করতে পারে। বর্তমানে মসজিদটি চারদিক প্রশস্ত করা হয়েছে।

রায়পুর বড় মসজিদ : লক্ষ্মীপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী একটি মসজিদ রায়পুর বড় মসজিদ। মসজিদটি রায়পুর বাজারের উত্তর প্রান্তে ফরিদগঞ্জ সড়কের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এটি ১২১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মরহুম পির ফয়জুলল্লাহ এলাকার মানুষের সহযোগিতায় মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম অবস্থায় এটি খড় দিয়ে নির্মিত হয়। জমি দান করেন মরহুম রৌশন ব্যাপারী। বর্তমানে মসজিদটি গম্বুজবিশিষ্ট বিশাল আয়তনের এক মসজিদ। এখানে একসাথে পাঁচ হাজার লোক নামাজ আদায় করতে পারে। ১৯৩৫ সালে মসজিদটি পাকাকরণ, পুকুর ঘাট, মিনার, গম্বুজ, বারান্দা ও মাঠ পাকা করা হয়। প্রথম ইমাম পির ফয়জুলল্লাহ, দ্বিতীয় ইমাম পির ফজলুল হক। পরে বংশানুক্রমে ইমামতির দায়িত্ব পালিত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

জিনের মসজিদ : রায়পুর বাজার থেকে প্রায় ১কি. মি. পূর্ব দিকে রায়পুর মোল্লার হাট, সড়কের দক্ষিণে জ্বিনের মসজিদ নামে একটি মসজিদ আছে। মসজিদের পূর্ব পাশে দিঘি। কথিত আছে যে, এই মসজিদ এবং দিঘি জিনেরা নির্মাণ করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া করে এলাকায় এসে দিল্লির জামে মসজিদের অনুরূপ একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সে হিসেবে বহু লোকজন দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দিঘি এবং মসজিদের মূল অংশ সম্পন্ন করেন। তা দেখে এলাকার মানুষ মনে করে মসজিদটি জিনেরা তৈরি করে দিয়েছে। তাছাড়া মসজিদটি এ অঞ্চলের জন্য অভিনব। সচরাচর এমন মসজিদ দেখা যায় না। তিন গম্বুজবিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাচীরে মসজিদটি নির্মিত। পূর্ব ভাগে রয়েছে তিনটি অসম্পূর্ণ মিনার। মরহুম আবদুল্লাহ মসজিদের কাজ শুরু করলেও যেটুকু সম্পন্ন হয়েছে তা শেষ করেন তাঁর পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ। তিনিও দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। মসজিদের দক্ষিণ অংশে ভূমি সমতল থেকে নিচে অন্ধকার একটি প্রকোষ্ঠ আছে। যাকে জনগণ আঁধার মানিক নাম দিয়েছে। এটিতে বসে মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ এবাদত করতেন।

চৌধুরী পাটোয়ারী মসজিদ : মীরগঞ্জ বাজারের উত্তরে লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জ সড়কের পশ্চিম পাশে এনায়েতপুর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এটির নাম চৌধুরী পাটোয়ারী মসজিদ। মসজিদটি ১৮২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনৈক চৌধুরী পাটোয়ারী মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে এটির নাম হয় চৌধুরী পাটোওয়ারী মসজিদ। মসজিদের প্রথম ইমাম ছিলেন মরহুম আবদুল্লাহ মককী।

রেহান উদ্দিন পাটোয়ারী বাড়ি মসজিদ : রায়পুর উপজেলার শায়েস্তা নগর গ্রামে মরহুম হাজী রেহান উদ্দিন পাটোয়ারী সাহেব ১৩২০ বাংলা সনে নিজ বাড়ির সামনে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদের নাম শায়েস্তা নগর রেহান উদ্দিন পাটোয়ারী বাড়ি জামে মসজিদ। ভেতরে বড় একটি গম্বুজ এবং বাইরে সুন্দর কারুকার্য খচিত মসজিদটি এ অঞ্চলের অন্যতম মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

রামগতি দায়রা বাড়ি মসজিদ : রামগতি বাজারের উত্তর পাশে রামগতি দায়রা বাড়ি। সন্দ্বীপের অধিবাসী হযরত চাঁদশাহ ফকির রামগতির চরমেহের গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা নুরুল ১২৬৫ বাংলা সনে রামগতি বাজার সংলগ্ন দায়রা বাড়ির মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩০০ বাংলা সনে এটি টিনের ঘরে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে মসজিদটি পাকা ভবন।

মান্দারী বাজার জামে মসজিদ : সদর উপজেলার মান্দারী বাজারে রয়েছে শতাব্দীর প্রাচীন এক ঐতিহ্যবাহী মসজিদ। বিশাল আয়তনের এ মসজিদ মান্দারীবাসীর গর্ব। সুন্দর কারুকাজ এবং সুউচ্চ মিনার এতদঞ্চলে আর কোনো মসজিদের ছিল না। মসজিদটি লক্ষ্মীপুরের অন্যতম মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন।

শ্রী শ্রী গোবিন্দ মহাপ্রভু জিউ আখড়া : লক্ষ্মীপুরের অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী মন্দির শ্রী শ্রী গোবিন্দ মহাপ্রভু জিউ আখড়া। দালাল বাজারের জমিদার সত্যেন্দ্রকুমার রায়, শচীন্দ্রকুমার রায় প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দালাল বাজার সংলগ্ন পশ্চিম

www.pathagar.com

পাশে অবস্থিত। ঠাকুর মন্দির, নাট মন্দির, ভাণ্ডার ঘর, পূজারীদের থাকার ঘর, কমিটির অফিস, যাত্রীনিবাস সব মিলে বৃহদায়তনের এই মন্দিরে প্রতিটি উৎসবে হাজার হাজার ভক্ত পূজার্থীর সমাগম ঘটে। বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাস উৎসব, ঝুলন উৎসব, জগন্নাথের রথ যাত্রা, হরিনাম যজ্ঞ, অন্নকুট, দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজা প্রধান।

শ্রী শ্রী মহাপ্রভু জিউ আখড়া

শ্রী শ্রী শ্যাম সুন্দর জিউ আখড়া : লক্ষ্মীপুর বাজারের থানা রোডের দক্ষিণ মাথার পশ্চিম পাশে শ্যামসুন্দর জিউ আখড়া নামে একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি ১২৪২ বাংলা সনে মৃত ভারত চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। বৃহদায়তন জায়গার চারদিকে সুরক্ষিত দেয়ালের মাঝখানে প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণে নির্মিত এই মন্দির। প্রতিষ্ঠা দিবস ছাড়াও দূর্গা পূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, শ্রী কৃষ্ণের জন্মোৎসব, রথযাত্রা প্রভৃতি পূজা জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর জিউ আখড়া

www.pathagar.com

লক্ষ্মীপুর আনন্দময়ী কালী বাড়ি : লক্ষ্মীপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৭ সালে। এটি প্রতিষ্ঠা করেন প্যারীলাল চৌধুরী রায় বাহাদুর। তাকে সহযোগিতা করেন স্থানীয় লোকজন। এখানে ফাল্গুন মাসে দিনব্যাপী দোল পূর্ণিমা, আশ্বিন মাসে পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে দিনব্যাপী কালী পূজা, বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বৈশাখী মেলায় হাতের তৈরি কাঠের জিনিস, মিষ্টি ও মনোহরি দোকান বসে। বর্তমানে নতুন নকশায় মন্দিরের আধুনিকায়নের কাজ চলছে।

রামগঞ্জ আনন্দময়ী কালী বাড়ি : জেলার রামগঞ্জ উপজেলার সোনাপুর বাজারে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী বাড়ি নামে একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি ১৭ বৈশাখ ১২২৭ সনে বাবু রমনীমোহন গুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের সেবায়েত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ফরিদগঞ্জের গুট্টা ইউনিয়ন থেকে সোনাপুরে আসেন এবং বংশানুক্রমে তাঁরাই মন্দিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে আসছেন। এখানে প্রতি বছর কালীপূজা, দুর্গাপূজা মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। কয়েক হাজার লোকের সমাগম ঘটে।

রাম কৃষ্ণপ্রিয় নিকেতন : বাবু যদুনাথ মজুমদার ১৩৪৪ বাংলা সনে এক একর জমিতে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ প্রিয় নিকেতন নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি রামগঞ্জের চণ্ডিপুর গ্রামে অবস্থিত। পেশায় হোমিও ডাক্তার চিরকুমার প্রয়াত বাবু যদুনাথ মজুমদার পৈতৃক সম্পত্তিতে প্রাপ্ত নিজ অংশে এ মন্দির করেন। অন্যান্য পূজা অনুষ্ঠান ছাড়াও শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এখানে বড় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে প্রচুর জনসমাগম ঘটে এবং হাতে তৈরি জিনিসপত্রের মেলা বসে।

রাম কৃষ্ণ প্রিয় নিকেতন

জগন্নাথ দেব বিগ্রহ মন্দির : জেলার রায়পুর উপজেলার রায়পুর বাজারে সোনালী ব্যাংক লি. রোড সংলগ্ন উত্তর পাশে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব বিগ্রহ মন্দির নামে একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি ১ চৈত্র ১৩১৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৮ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জগন্নাথের পূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের পটিয়া থেকে আগত পূজারী নবকুমার বন্দোপাধ্যায় এবং তাঁর বংশধররা এ মন্দিরের সেবায়েত হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

মদনমোহন জিউর আখড়া : রায়পুর বাজারে পশ্চিম পাশে ১৩২৩ বাংলা সনে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রী শ্রী মদন মোহন জিউ আখড়া। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ চন্দ্র সাহা এই আখড়ায় রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, অন্নকূট, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে দুর্গাপূজা ও জন্মাষ্টমী বড় অনুষ্ঠান। উত্তর পশ্চিম পাশে শ্রী শ্রী মহামায়া মন্দির নামে আরও একটি মন্দির আছে। এখানে বিভিন্ন দিবসে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বুড়া কর্তার আশ্রম : রামগতি উপজেলার চর ডাক্তার গ্রামে বুড়া কর্তার আশ্রম নামে মন্দিরটি ১৩৩৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুড়া কর্তার পুরো নাম রাধা কান্ত স্বোহং স্বামীজি। তাঁর নিবাস ছিল নোয়াখালী জেলার কল্যাণদি গ্রামে। মৃত্যুর পর তাঁকে লক্ষ্মীপুর জেলার চর মটুয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ বাড়ির দরজায় সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বছরের মাঘীকৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী তিথিতে তাঁর তিরোধান উৎসব পালন করা হয়। প্রায় সাতদিনব্যাপী এ উৎসবে কীর্তন ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বহু লোকজনের সমাগম ঘটে।

মুন মুন্সির আস্তানা (নদীর অদূরে, মতিরহাট থেকে ২/৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত) এবং জাফর আহমদ সিদ্দিকীর আস্তানা (জৈনপুরী) :

মুন মুন্সির আস্তানা

এ দুটি দায়রা বা আস্তানায় প্রতি বছর ওয়াজ, মাহফিল ও জলসা হয়। এ অঞ্চলের, ধর্ম ভীরু মানুষগুলো এই দায়রাগুলোকে অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দায়রা ও মসজিদে মানত দেয়।

জোসেফ চার্চ : লক্ষ্মীপুরে খ্রিস্টানদের একমাত্র উপাসনালয়। এ. টি জোসেফ চার্চটি সাহাপুর গ্রামে অবস্থিত। এটি ১৯৯৩ সালের ২৯ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। নোয়াখালী সোনাপুর গির্জার ইটালিয়ান পুরোহিত ফাদার আতুরো এটি প্রতিষ্ঠা করেন। যীশুখ্রিস্টের জন্ম দিবস ২৫ ডিসেম্বর জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য,

www.pathagar.com

সাহাপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে আগত জেমস ফিনির বংশধররা এখনো আটচালাবাড়ি নামে খ্যাত এ বাড়িতে বসবাস করছে। এ পরিবারের সদস্যদের উপাসনার জন্যই নির্মিত হয় এ গির্জা।

এছাড়া রয়েছে শ্রীরামপুর রাজবাড়ি, মধু বানু মসজিদ, দায়েম শাহ মসজিদ, আবদুল্লাহপুর মসজিদ, ধোলাকান্দি জামে মসজিদ, রায়পুর (পীর ফজলুল হক) বড়মিয়া পির সাহেব মসজিদ, কচুয়া দরগাহ শরীফ, হরিশ্চর দরগাহ শরীফ, রায়পুর পির ফজলুল্লাহ মাজার, রায়পুর (পীর ফজলুল হক) বড়মিয়া পির সাহেব মাজার, রামগতি হাট দায়রা শরীফ, রামগঞ্জ সনাতন হরি সভা মন্দির, দালাল বাজার মঠ, রামগতি রানি ভবানী কামদা মঠ।

ঝ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মীপুর জেলা ভুলুয়া রাজ্যের অংশ ছিল। মোগল ও কোম্পানি আমলে এখানে একটি মিলিটারি আউটপোস্ট ছিল। এজন্য লক্ষ্মীপুরে মোগল কোম্পানির সৈন্য ও রাজকর্মচারী বাস করতেন। সদর উপজেলা ভবানীগঞ্জের পূর্বে নোয়াখালী জেলার সুধারাম উপজেলার পশ্চিমে ভুলুয়ার রাজধানী এবং মিলিটারি আউটপোস্ট স্থাপন করা হয়েছিল। তেওয়ারীগঞ্জের শহর কসবা ও ফরাশগঞ্জ এলাকায় রাজধানী ও আউটপোস্ট ছিল।

ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে বিপুল লবণ উৎপাদন ও রপ্তানি হতো। এ সময় এখানে লবণ আন্দোলন, পরবর্তী সময়ে লক্ষ্মীপুরে নীল প্রতিরোধ আন্দোলন, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, স্বদেশি আন্দোলন ও ঋণ সালিশি আন্দোলন সংঘটিত হয়। এছাড়া ফরায়েজি আন্দোলনের বাতাস এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহম্মদের ভাবশিষ্য মাওলানা ইমামুদ্দিন লক্ষ্মীপুর আসেন, পির ফজলুল্লাহ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী এ জেলায় ধর্ম প্রচারে ভূমিকা রাখেন । ১৯৪৬ সালে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ, সদর ও রায়পুরে পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে মারাত্মক ও নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গার পরপরই শান্তি মিশন নিয়ে এ অঞ্চলে ছুটে আসেন এবং সম্প্রীতির ডাক দেন। তিনি স্থানীয় কাফিলাতলী আখড়া ও শ্রীরামপুর রাজবাড়িতে অবস্থান করেন। ১৯২৭ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে পূর্ববঙ্গে সফর করেন । এ সময় তিনি নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে আসেন । লক্ষ্মীপুর মডেল হাই স্কুল মাঠে বক্তৃতা করে কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। তিনি লক্ষ্মীপুর টাউন হলে রাত্রিযাপন করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বিভিন্ন সময় লক্ষ্মীপুর জেলা সফর করেছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুবার বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে লক্ষ্মীপুর জেলা ভ্রমণ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে লক্ষ্মীপুরের বর্তমান সার্কিট হাউজ থেকে মজুপুর পর্যন্ত বিরাট খোলা প্রান্তরে অনুষ্ঠিত এক বিশাল সংবর্ধনা সমাবেশে যোগ দেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লক্ষ্মীপুরে ১৭টি বড় ধরনের লড়াই হয়। যুদ্ধে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মেজরসহ শত শত সৈন্য,

www.pathagar.com

রাজাকার ও শান্তিকমিটির নেতা নিহত হয়। জেলার বধ্যভূমি, গণকবর ও স্মৃতিস্তম্ভসমূহ সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।

লক্ষ্মীপুর জেলায় যুগে যুগে জন্ম নিয়েছেন বহু অসাধারণ প্রতিভা। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। এমন কয়েকজন স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্বের কথা আলোচনা করছি যারা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আমাদের গৌরব ও অনুসরণীয়।

মুহাম্মদুল্লাহ : রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদুল্লাহ ১৯২১ সালে রায়পুর উপজেলায় ৭ নম্বর ইউনিয়নের সাইচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে লক্ষ্মীপুর মডেল হাই স্কুল থেকে আরবিতে স্টার মার্কসহ ম্যাট্রিক পাশ করেন। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি.এ (অনার্স) এবং কৃতিত্বের সাথে এল.এল.বি. পাশ করেন। এছাড়া কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর মা চেয়েছিলেন ৭ বছর বয়সে পিতৃহারা এ ছেলেটি পিতামহের মতো কিছু আরবি শিখে মসজিদে ইমামতি করবেন। কিন্তু শৈশবে সংগ্রামী মুহাম্মদুল্লাহ অধ্যবসায়, কর্তব্যপরায়ণতা, অদম্য সাহস ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তিনি চারবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে সংসদের ডেপুটি স্পিকার এং পরবর্তীকালে স্পিকার নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। এই মহান ব্যক্তি ১৯৯৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা : কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা ১৯২২ সালে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা কুশাখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ. (অনার্স) পাশ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে। ছাত্রবেলা থেকে তিনি খাদি আন্দোলন, লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে তিনি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি বিচ্ছিন্ন রামগতি দ্বীপকে লক্ষ্মীপুরের ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করার জন্য তাঁর পরিকল্পনায় বিশাল বেড়িবাঁধ (তোয়াহা বাঁধ) নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে লক্ষ্মীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েক লাখ একর জমি নদীগর্ভে জেগে উঠে। এ বাঁধ ছিল তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ তোয়াহা ১৯৭৯ সালে রামগতি আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৮৭ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হন। ১৯৮৭ সনের ৭ মে ৯৯ বৎসর বয়সে এ মুসলিম মনীষী ইন্তেকাল করেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ : বাংলাদেশের নারী শিক্ষার পথিকৃৎ বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের জন্ম ১৯০৮ সালে ফেনী জেলায় হলেও তাঁর স্বামী ডা. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ফরাশগঞ্জের সন্তান। শামসুন নাহার তাঁর বড়

www.pathagar.com

ভাই প্রাক্তন মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের অনুপ্রেরণায় ম্যাট্রিক পাশ করেন। বিয়ের পর স্বামীর সহযোগিতায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। বি.এ. পাশ করার পর বেগম রোকেয়া তার সম্মানে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলে। শামসুন নাহার মাহমুদ ঢাকার ইডেন কলেজের বাংলার অধ্যাপক এবং কোলকাতা লেডি বেবোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। বেগম রোকেয়ার সাথে নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি মহিলা শাখার সভানেত্রী। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে পুণ্যময়ী, বেগম মহল, রোকেয়া জীবনী, আমার দেখা তুরস্ক, নজরুলকে যেমন দেখেছি ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী : স্বাধীনতাউত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর (১৯৭২) এবং সাবেক শিক্ষামন্ত্রী (১৯৭৫) ড. মুজাফফর আহমদের জন্ম ১৯২৩ সালে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বিরাহীমপুর গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ (অনার্স) এবং ১৯৪৪ সালে এমএ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬০ সালে লন্ডন থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৭ সনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য এবং পাকিস্তানের গণপরিষদের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। এ মনীষী ১৯৭৮ সালের ১৭ জানুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ড. আবদুল মতিন চৌধুরী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বোস প্রফেসর ও পদার্থ বিজ্ঞানী ড. আবদুল মতিন চৌধুরী ১৯২১ সালে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার নন্দনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে সকল শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারী ড. আবদুল মতিন চৌধুরী ১৯৩৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গ ও আসামে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন। ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে বিএসসি অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং ১৯৪৩ সালে এমএসসি প্রথম শ্রেণিসহ ৩য় স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৯ সালে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ড. আবদুল মতিন চৌধুরী আন্তর্জাতিক নোবেল পুরস্কার কমিটি ও নেহেরু শান্তি পুরস্কার কমিটির সদস্য হওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। ১৯৭৩ ও ১৯৭৬ সালে দু'বার তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ১৯৭৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোলোশিপ লাভ করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। দেশি-বিদেশি বহু জার্নালে তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সালের ২৪ জুন এই খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ পরলোক গমন করেন ।

সানাউল্লাহ নূরী : সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী ১৯২৮ সালে রামগতি উপজেলার চরফলকন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস, অর্থনীতি ও

www.pathagar.com

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫০ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে জনাব নূরী দৈনিক দেশ, দৈনিক জনতা ও দৈনিক দিনকালের সাংবাদিক ছিলেন। তাছাড়া দৈনিক আজাদ, ইত্তেফাক, সংবাদ ও দৈনিক বাংলার গুরুত্বপূর্ণ পদে সাংবাদিকতা করেন। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সাংবাদিক হিসেবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করায় তাকে দৈনিক আজাদের সিনিয়র সহ-সম্পাদকের চাকরি ত্যাগ করতে হয়েছে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ কাউন্সিল অব এডিটরস-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি ১৯৪৮ সালে ভাষা-আন্দোলনে পথিকৃৎ সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। সানাউল্লাহ নূরী শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৯৭৭-১৯৭৮ সালে শিশু-কিশোর পত্রিকা কিশোর বাংলার সম্পাদক ছিলেন। জনাব নূরী ১৯৮৩ সালে একুশে পদক, ১৯৮৪ সালে অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক, শিল্পাচার্য স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন জাতীয় পদকে ভূষিত হন। ২০০১ সালের ১৬ জুন এই মনীষী ইন্তেকাল করেন।

শহিদ মুনীর চৌধুরী

শহিদ মুনীর চৌধুরী : বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ শহিদ মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর মানিকগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী। শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, অনুবাদক, সমালোচক, বাগ্মী। পিতা আবদুল হালিম চৌধুরী (খানবাহাদুর) ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯৪১-এ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম

www.pathagar.com

বিভাগে মেট্রিক, ১৯৪৩-এ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আই.এসসি, ১৯৪৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বি.এ. (অনার্স) ও ১৯৪৭-এ একই বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা) থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (ইংরেজি) পাস। নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে জেলখানায় পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ। এম.এ. প্রথম পর্ব (১৯৫৩) ও এম.এ. দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫৪) উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯৫৮-তে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাস। ১৯৪৯-এ লিলি চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৪৯-১৯৫০ পর্যন্ত খুলনার দৌলতপুরের ব্রজলাল কলেজের ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯৫০-এ জগন্নাথ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক (১৯৫০-১৯৫২ ও ১৯৫৪-১৯৫৫), বাণিজ্য বিভাগের খণ্ডকালীন ইংরেজির প্রভাষক (১৯৫০-১৯৫১), বাংলা বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষক (১৯৫৫)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক (১৯৫৫-১৯৬২), রিডার (১৯৬২-১৯৭০), অধ্যাপক (১৯৭০-১৯৭১)। বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৬৮-১৯৬৯, ১৯৬৯-১৯৭১)। কলা অনুষদের ডিন (১৯৭১)। ছাত্র-জীবনেই বামপন্থি চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। ১৯৪৩-এ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদান। ১৯৪৮-এ কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যোগদান। ঐ বছরের শেষের দিকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ-বছরের ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড ও পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক সভায় বক্তৃতা করার দায়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার ও ১৯৫২-১৯৫৪ পর্যন্ত জন নিরাপত্তা আইনে কারাভোগ। ১৯৫৩-র ১৭ জানুয়ারি কারাগারে বসে বিখ্যাত 'কবর' নাটক রচনা। একুশের পটভূমিতে রচিত নাটকটি ঐ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজবন্দীদের দ্বারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিনীত হয। ১৯৫৪-র ৪ এপ্রিল পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হলে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। কেন্দ্রীয় সরকার একই বছর ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ববঙ্গে ৯২ (ক) ধারার শাসন প্রবর্তন করলে পুনরায় গ্রেফতার। সেই বছর অক্টোবর মাসে বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ। বাংলা টাইপ রাইটিংয়ের কী-বোর্ড যা মুনীর অপটিমা নামে পরিচিত, তার উদ্ভাবক (১৯৬৫)। ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে এক বিবৃতিতে রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। বাংলা বর্ণমালা সংস্কার পদক্ষেপের বিরোধিতা (১৯৬৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ-নাটক: রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৬), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)। অনুবাদ নাটক: কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)। প্রবন্ধ গ্রন্থ: ড্রাইডেন ও ডি.এল. রায় (১৯৬৩, পরে তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত), মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি

www.pathagar.com

(১৯৭০)। ১৯৬২-তে নাটকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬৫-তে মীর মানস গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার এবং ১৯৬৬-তে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব লাভ। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু-কর্তৃক আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন। নাট্যকার, অনুবাদক, শ্রোতাসম্মোহনকারী বক্তা, কৃতী অধ্যাপক, সমালোচক, প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত। মৃত্যু. ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে বিবৃতি দিলেও ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পাননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি বাহিনীর এ দেশীয় সহযোগী আলবদর বাহিনী-কর্তৃক অপহৃত এবং নিখোঁজ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

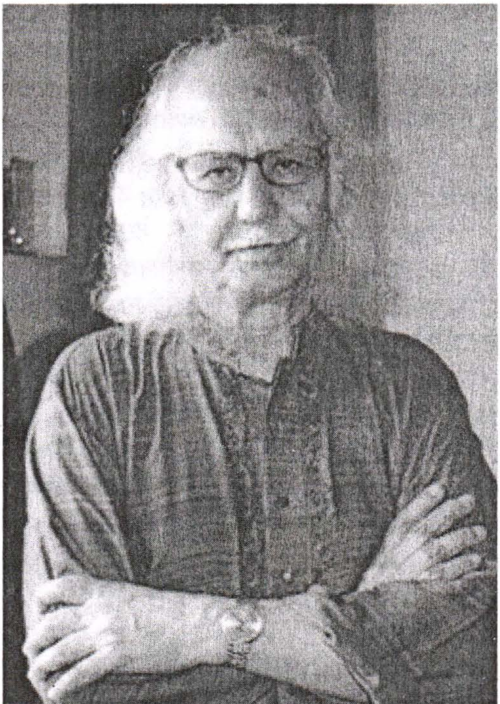

কবীর চৌধুরী

কবীর চৌধুরী : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক কবীর চৌধুরী ১৯২৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী। পিতা খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী এবং মা আফিয়া বেগম। তার পুরো নাম আবুল

www.pathagar.com

কালাম মোহাম্মদ কবীর ও ডাক নাম মাণিক। তিনি শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিসহ নানা বিষয় নিয়ে ভাবেন ও লেখালেখি করেন।

শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন : কবীর চৌধুরীর পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয় নিজ গৃহেই। পরিবারের সাহচর্য্যে তিনি প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে সপ্তম স্থান অধিকার, ১৯৪০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অর্জন, ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং ১৯৪৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে ফুলরাইট বৃত্তিধারী হিসেবে আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা এবং ১৯৬৩-৬৫ সালে সার্দান ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসন সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা সম্পন্ন, দীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। পারিবারিক জীবনে তিনি ১৯৪৫ সালের জুন মাসে মেহের কবীরকে বিয়ে করেন। মেহের কবীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও বাংলা অনুবাদ : রূপকথার কাহিনী (১৯৫৯), ব্ল্যাক টিউলিপ (১৯৮৯), কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো (১৯৮৯), গবেষণা-প্রবন্ধ : ইউরোপের দশ নাট্যকার (১৯৮৫), শেক্সপীয়র ও তাঁর মানুষেরা (১৯৮৫), শেক্সপীয়র ও গ্লোব থিয়েটার (১৯৮৭), অভিব্যক্তিবাদী নাটক (১৯৮৭), এ্যাবসার্ড নাটক (১৯৮৫), ফরাসী নাটকের কথা (১৯৯০), ছয় সঙ্গী (১৯৬৪), আধুনিক মার্কিন সাহিত্য (১৯৮০), প্রাচীন ইংরেজি কাব্য সাহিত্য (১৯৮০), শেক্সপীয়র থেকে ডিলান টমাস (১৯৮১), আমেরিকার সমাজ ও সাহিত্য (১৯৬৮), সপ্তরথী (১৯৭০), মার্কিন উপন্যাস ও তার ঐতিহ্য (১৯৭০), অবিস্মরণীয় বই (১৯৬০), মানুষের শিল্পকর্ম (২০০৬)। অনুবাদ : শেখবের গল্প (১৯৬৯), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৭০), গ্রেট গ্যাটসবি (১৯৭১), রূপান্তর (১৯৯০), বেউলফ (১৯৮৫), অল দি কিংস ম্যান (১৯৯২), দি গার্ল উইথ এ পার্ল ইয়ার রিং (২০০৭), গল্প উপন্যাসে প্রতিকৃতি চিত্র (২০০৭)। নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর : আহবান (১৯৫৬), শত্রু (১৯৬২), পাঁচটি একাঙ্কিকা (১৯৬৩), অচেনা (১৯৬৯), শহীদের প্রতীক্ষায় (১৯৫৯), হেক্টর (১৯৬৯), ছায়া বাসনা (১৯৬৬), সেই নিরালা প্রান্তর (১৯৬৬), সম্রাট জোনস (১৯৬৪), অমা রজনীর পথে (১৯৬৬), প্রাণের চেয়ে প্রিয় (১৯৭০), লিসিসস্ট্রাটা (১৯৮৪)। কাব্যানুবাদ : ভাৎসারোভের কবিতা (১৯৮০), আধুনিক বুলগেরীয়া কবিতা (১৯৮০), রিস্তো বোতেভর কবিতা (১৯৮৮), রিস্তো সির্নেনস্কির কবিতা (১৯৮৯), কাহলিল জিবরানের কবিতা (১৯৯২), সচিত্র প্রেমের কবিতা (২০০০)। পুরস্কার : ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর স্বর্ণপদক, হাবিব ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান লেখক সংঘ পুরস্কার, ১৯৭০ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ

www.pathagar.com

চৌধুরী সম্মাননা পদক, ১৯৮২ সালে কাজী মাহবুবউল্লাহ ও বেগম জেবুন্নেসা স্বর্ণপদক, ১৯৮৫ সালে অলংকৃত স্বর্ণপদক ও সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, ১৯৮৯ সালে শেরে বাংলা পুরস্কার, ১৯৯০ সালে আমরা সূর্যমুখী পুরস্কার, ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৯১ সালে একুশে পদক, ১৯৯৩ সালে লোকনাট্যদল স্বর্ণপদক, ১৯৯৪ সালে উইলিয়াম কেরী স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৯৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে খালেদ দাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৮ সালে সূফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে শামসুল হক মালিহা খাতুন পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাতীয় পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে কবি জসীমউদ্দীন পুরস্কার, ২০০০ সালে কবি জসীমউদ্দীন পুরস্কার, ২০০০ সালে রবীন্দ্র শিল্পী সংস্থার সম্মাননা, ২০০১ সালে থিয়েটার এর সম্মাননা পদক, ২০০১ সালে বিশ্ব বাঙালি সম্মেলন পুরস্কার, ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের সম্মানন্, ২০০১ সালে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, ২০০৩ সালে মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরস্কার, ২০০৪ সালে ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড, ২০০৫ সালে নাগরিক নাট্যাঙ্গন সম্মাননা, ২০০৬ সালে বিশ্ব নাটক দিবস সম্মাননা, বৈশাখী নাট্যগোষ্ঠীর গুণীজন সম্মাননা, ভারতের ট্যাগোর পীস অ্যাওয়ার্ড, সর্বশেষ ২০১০ সালে গীতাঞ্জলি সম্মাননা পদক লাভ। মৃত্যু : ২০১১ সালের ১৩ ডিসেম্বর নয়াপল্টন ঢাকায় নিজ বাসভবনে ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি পদে বহাল ছিলেন।

অধ্যক্ষ সিরাজুল হক : অধ্যক্ষ সিরাজুল হকের জন্ম ১৮৯৮ সালে রামগঞ্জ উপজেলার টিয়রী গ্রামে। তিনি ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে বিএ (অনার্স) এবং ১৯২৮ সালে এমএ পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে প্রথম হন। বৃত্তির প্রাপ্ত অর্থেই তাঁর পুরো শিক্ষা জীবনের লেখাপড়া চলত। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর লক্ষ্মীপুর হাই মাদ্রাসা (বর্তমানে সামাদ একাডেমী)-এর সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। লক্ষ্মীপুরে প্রথম সহ-শিক্ষা চালুসহ শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল। তিনি নোয়াখালী জেলা জজ কোর্টের জুরি এবং ঋণ সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি লক্ষ্মীপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি লক্ষ্মীপুর মহকুমা বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন এই শিক্ষাবিদের মৃত্যু হয়।

এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রয়েছেন ড. এ এন এন মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী, ড. ওয়াহিদুল হক, প্রধান বিচারপতি রুহুল আমিন, প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন, সার্কের প্রথম মহাসচিব আবুল আহছান, ড. মোহাম্মদ হাবিব উল্যাহ, ড. সিরাজুল হক, ড. হাবিবুর রহমান, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল টি হোসেন, সেলিনা হোসেন, অধ্যক্ষ সাফায়েত আহমেদ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী, হোসনে আরা শাহেদ, আবদুজ জাব্বার, অধ্যক্ষ আবদুল গনি হেড মাস্টার, মুহাম্মদ শাহ আলম হেড মাস্টার।

www.pathagar.com

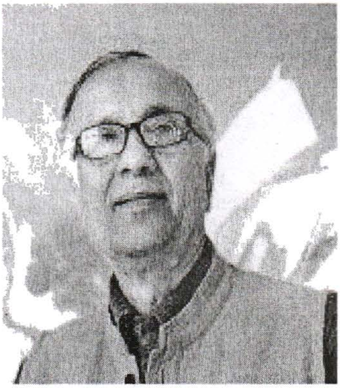

রামেন্দু মজুমদার

রামেন্দু মজুমদার : রামেন্দু মজুমদার ১৯৪১ সালে ৯ আগস্ট লক্ষ্মীপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন গঠন, আইটিআইতে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ এবং বাংলাদেশ কেন্দ্র স্থাপন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গঠনের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশের পথ খুলে দিয়েছেন এবং নাট্যকলাকে সুসংহত করেছেন। বাংলাদেশকে বিশ্ব নাটকে সম্পৃক্ত করে বিশ্বজনীন করেছেন। রামেন্দু মজুমদার ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে রেডিও এবং ১৯৬৫ সাল থেকে টেলিভিশনে অভিনয় এবং সংবাদ পাঠ করেন। ১৯৭২ সালে দেশের অন্যতম শীর্ষ নাটক দল 'থিয়েটার' গঠন ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দেশের প্রথম নাটকের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'থিয়েটার' সম্পাদনা এবং থিয়েটার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৮০ সালে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান, ১৯৮২ সালে আইটিআই বাংলাদেশ কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি। তিনি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ২০০৮ ও ২০১১ সালে আইটিআইর বিশ্ব সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে একুশে পদক লাভ করেন। ২০০৯ সালের ৪ জুলাই তাঁকে লক্ষ্মীপুরে এক অনন্য নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়।

ফেরদৌসী মজুমদার : ফেরদৌসী মজুমদার ১৯৪৩ সালের ১৮ জুন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স ও ১৯৬৫ সালে এমএ পাশ করেন। এরপর তিনি আরবি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে ফরাসি ভাষায় অলিয়েস ফ্রান্সে কোর্স সম্পূর্ণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে এবং ১৯৬২ সাল থেকে বাংলাদেশ বেতারে প্রায় ১৫শ নাটকে অভিনয় করেন। অভিনয় শৈলীর জন্য তিনি ১৯৭৫ সালে প্রথম জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার ও সিকোয়েন্স অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট, ১৯৭৮ সালে শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮১ সালে কাজী মাহবুব উল্লাহ স্বর্ণপদক, ১৯৯০ সালে বঙ্গবন্ধু পুরস্কারসহ নানা পদকে ভূষিত হন। তিনি 'থিয়েটার'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

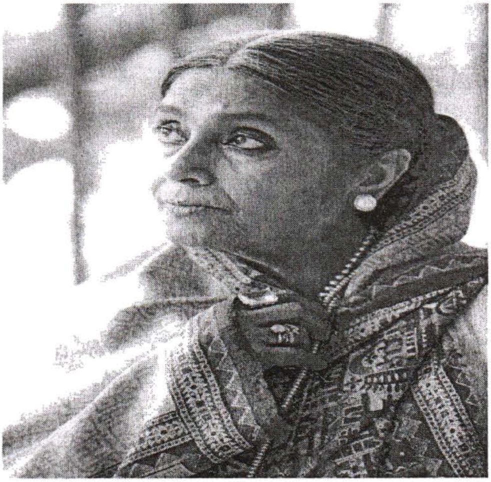

ফেরদৌসী মজুমদার

ফেরদৌসী মজুমদার বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে নাটকে অভিনয় করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন শিক্ষিকা। প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার তাঁর স্বামী।

দিলারা জামান

দিলারা জামান : ১৯৪২ সালে রামগঞ্জ থানার আলীপুর গ্রামে দিলারা জামান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬০ সালে ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে আইএ ১৯৬২ সালে বিএ ১৯৬৭

www.pathagar.com

সালে বিএড ও ১৯৭০ সালে এমএড পাশ করেন। দিলারা জামান এ পর্যন্ত শতাধিক টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তিনি মূলত একজন গল্পকার। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ অস্থরাগ, আরশিতে আমি ও মৃগয়ায় শরবিদ্ধ এবং উপন্যাস আকাশ অনেক নীল উল্লেখযোগ্য। তিনি অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য ১৯৯৩ সালে একুশে পদক ও টিভি নাট্যশিল্পী পুরস্কার লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন শিক্ষিকা। তাঁর স্বামী ফখরুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশ টেলিভিশনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন।

ঞ. মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক দেশটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঙালি এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে। বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে আজকের বাংলাদেশের যে গৌরব তা একদিনে অর্জিত হয়নি। আর এ জন্য পথের দিশারি হয়ে বাঙালি জাতিকে জাগরিত করে যিনি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বাঙালি জাতি গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টির জন্যে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে লক্ষ্মীপুর জেলা বর্বর পাকিস্তানি হানাদার ও এদেশীয় রাজাকার বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের ঘটনায় নির্মম, নৃশংস ও ক্ষত-বিক্ষত ছিল। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অপ্রতিরোধ্য গেরিলা যুদ্ধ তাদের জন্য আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ৪ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে লক্ষ্মীপুর হানাদার ও রাজাকার মুক্ত হয়। লক্ষ্মীপুর শহরের মাদাম ব্রিজ, লক্ষ্মীপুর বাগবাড়ি গণকবর, দালাল বাজার গালর্স হাই স্কুল, মডেল হাই স্কুল, মদিন উল্ল্যা চৌধুরী (বটু চৌধুরী) বাড়ি, পিয়ারাপুর বাজার, রায়পুর, মান্দারী মসজিদ ও প্রতাপগঞ্জ হাই স্কুল, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, এল. এম. হাই স্কুল ও ডাকাতিয়া নদীর ঘাট, রামগতির চর, কলাকোপা মাদ্রাসা, রামগতির ওয়াপদা বিল্ডিং, আলেকজান্ডার সিড গোডাউন, করইতোলা, হাজির হাট মসজিদ, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ও গোডাউন, রামগঞ্জের গোডাউন এলাকা, রামগঞ্জের সরকারি হাই স্কুল, জিন্নাহ হল (জিয়া মার্কেট) ও ডাক বাংলো হানাদার ও রাজাকার ক্যাম্প এবং গণহত্যার সাক্ষী হয়ে আছে। লক্ষ্মীপুর জেলা এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় ২৯টি ছোট-বড় যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সবচেয়ে ভয়ংকর ও আতঙ্কের যুদ্ধ সংঘঠিত হয় লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সৈন্যবহর যত বারই রামগঞ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হতো তত বারই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হতো। রামগঞ্জ ছিল সবুজ গাছ-গাছালি পরিবেষ্টিত প্রকৃতির এক সুন্দর লীলাভূমি। এই গাছ-গাছালির আড়ালে থেকে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের প্রতিহত করত। ২৬ অক্টোবর দেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, এমনি এক সময় ট্রাকভর্তি এক প্লাটুন হানাদার বাহিনী রামগঞ্জ

www.pathagar.com

আক্রমণের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। পথিমধ্যে কাজির দিঘির পাড় এলাকায় ব্রিজের গোড়ায় মুক্তিবাহিনী ডিনামাইট পেতে রাখে, যখনই হানাদার বাহিনী বহনকারী ট্রাকটি ব্রিজের উপর উঠল অমনি বিকট শব্দে ব্রিজটি প্রকম্পিত হয়ে উড়ে গেল। পুরো এক প্লাটুন হানাদার বাহিনী নিহত হল। বহুবার মুক্তিবাহিনী আরো বিভিন্ন কায়দায় হানাদার বাহিনীদেরকে বিধ্বস্ত করতে লাগল।

লক্ষ্মীপুর, বেগমগঞ্জ সড়কের প্রতাপগঞ্জ হাই স্কুল, মান্দারী মসজিদ, মাদাম ঘাট ও বাগবাড়ি, লক্ষ্মীপুর-রামগঞ্জ সড়কে কালি বাজার, দালাল বাজার, কাজীর দিঘির পাড়, কাফুলাতলী, পানপাড়া, মিরগঞ্জ, পদ্মা বাজার, মঠের পুল এবং রামগঞ্জের হাই স্কুল সড়ক ও আঙ্গারপাড়া, লক্ষ্মীপুর-রামগতি সড়কের চর কলকোপার দক্ষিণে জমিদার হাট সংলগ্ন সড়কে, করুণানগর, হাজির হাট, আলেকজান্ডার এবং রামগতি থানা ও ওয়াপদা বিল্ডিং এলাকা, রায়পুর আলিয়া মাদ্রসা ও এল.এম. হাই স্কুল এলাকায় অধিকাংশ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় শত শত সাধারণ মানুষ এবং ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। মুক্তিবাহিনীর হাতেও সহস্রাধিক হানাদার ও রাজাকার নিহত হয়।

চ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়াল

হায়দার আলী বয়াতি : ১৯৫০ দশকের শুরু থেকে জেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গান গাইতেন হায়দার আলী বয়াতি। ১০ বছর বয়সে স্কুল জীবনে গান গাওয়া শুরু করেন। ওস্তাদ ছিলেন রায়পুরের দেনাপুকুরের আমিন উল্লাহ বয়াতি। সাধারণত তিনি ফরমায়েশি গান পরিবেশন করতেন। এছাড়া হাট-বাজারে ঔষধ বিক্রেতার জমায়েতে সহযোগিতামূলক গান গেয়েছেন। রায়পুর উপজেলার গাইয়ার চর গ্রামে হায়দার আলী বয়াতির জন্ম। ছোট বেলা থেকে লোকসংগীত তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনি জারিগান ও পালাগান (কবির লড়াই) লক্ষ্মীপুর জেলায় কিংবদন্তিতুল্য। তাৎক্ষণিক গানের কথা তৈরি করা, গানের কথায় বাজনায় ও দেহ ভঙিমায় গায়ক-দর্শক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার অপূর্ব ক্ষমতা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছায়। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য ও ধর্মজ্ঞান দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি অতি স্বল্প শিক্ষিত। তাঁর পালাগানে প্রতিপক্ষকে কাবু করার জন্য তাঁর কৌশলী প্রশ্ন ছুড় দেয়ার শৈল্পিক উপস্থাপনা মনে রাখার মতো। হায়দার আলী বয়াতি তাঁর সাগরেদ শহীদ উল্লাহ বয়াতিকে প্রস্তুত করেছেন একসাথে পালাগানের জন্য। সম্প্রতি বয়োবৃদ্ধ হায়দার আলী বয়াতি সংগীতের জগতে না জ্বললেও তাঁর সাগরেদ খানিকটা ওস্তাদের সুনাম রক্ষা করে চলছেন। কাঠের চাকা চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে জিপসীর মতো করে 'খুন্‌জুরা' নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন হায়দার আলী বয়াতি। এটি সব সময় তাঁর হাতের শোভা ছিল। তাঁর ভাবশিষ্য ও দোহার হিসেবে রায়পুর উপজেলার শায়েস্তা নগরের মৃত আবদুল কাদের, চরপাতার আবদুল মিয়া, এনায়েতপুরের মৃত ভোলা বয়াতি, রাখালিয়ার মৃত আবদুল লতিফ সরকার, কমলনগর উপজেলার হাজিরহাটের কামাল উদ্দিন ও মঈন উদ্দিন এবং পশ্চিম লক্ষ্মীপুরের হোসেন বয়াতি কাজ করেছেন। হায়দার আলী বয়াতি প্রায় ৫০ বছর লোকসংগীত সাধনায় একনিষ্ঠ ছিলেন।

www.pathagar.com

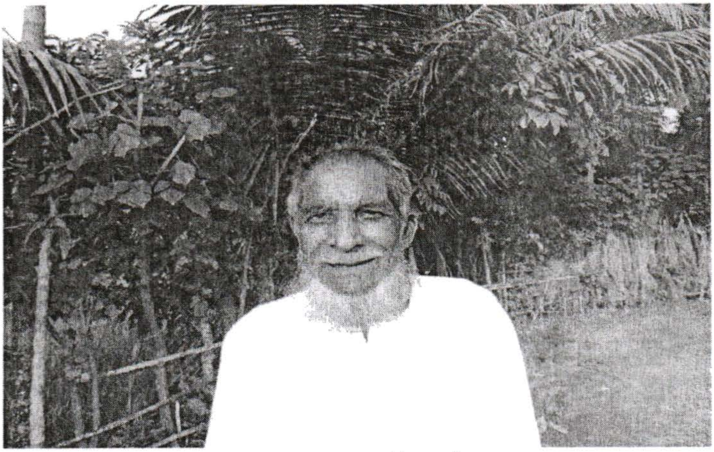

হায়দার আলী বয়াতি

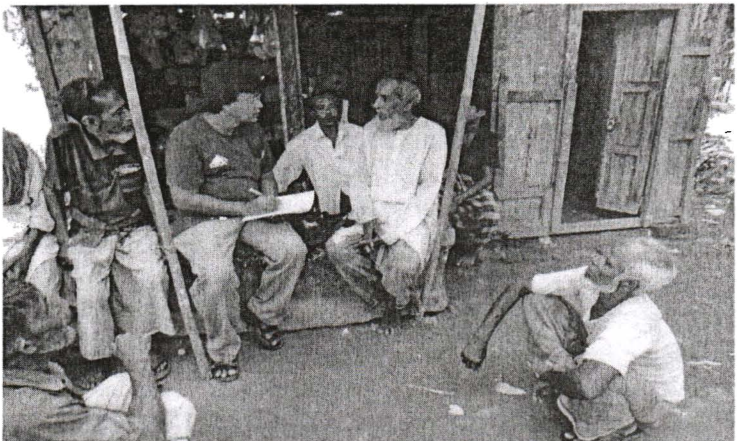

হায়দার আলী বয়াতির সাক্ষাৎ গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়কারী

২০১১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর হায়দার আলী বয়াতির এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেন—বিষাদ সিন্দু, মোকসেদুল মোমিন, ক্যাচাচুল আম্বিয়া পড়িয়া কাহিনি নিয়ে নিজে নিজে সুর করি। তারপর আমিন উল্যাহ বয়াতির দলে যোগ দেই। ৭-৮ বছর তার দোকানে ছিলাম। চা দোকান ছিল থানার ও আব্বাছ আলী ব্যাপারীর দোকানের পশ্চিমে গাঙপাড়ে। সাইচা, দালাল বাজার, মাছ বাজার (লক্ষ্মীপুর), তোরাবগঞ্জ, আলেকজান্ডার, চর জব্বার, মুন্সির হাট, রায়পুরের পূর্বে কাজির দিঘির পাড়, পান পাড়া, মাছিমপুর, চাঁদপুরের গৃঙ্গকালিন্দি, রূপসা, ফরিদগঞ্জ, চানন্দ্রা গান করি।

www.pathagar.com

আমার নিজের দল তৈরি হয়। শিষ্য শহীদ উল্যাহ বয়াতি (সান্তোষপুর) কামাল উদ্দিন বয়াতি, কলাতোপা রামগতি। মান্নান বয়াতি (রাজীবপুর), হোসেন বয়াতি দালাল বাজার, আর কাদির (শায়েস্তানগর) দুলা মিয়া (কাজির চর রায়পুর) আবদুল হাসিম (আলোনিয়া)। দল তৈরির পর লক্ষ্মীপুরে ২ পালা, বিবির হাট ৩ রাত, ভোলার (আবদুর রশীদ বয়াতি) শিন্নির হাট ৩ রাত (পেয়ার বেগম-পটুয়া খালীর সাথে) সিলেট জগন্নাথপুর (শরফত উল্যাহ বয়াতির সাথে) ব্রিকফিল্ডের (দুলাল সরকার-ঢাকার সাথে) কাদির বক্স পাটারী বাড়ি, খিদিরপুর মুন্সির হাট (জালাল বয়াতি-ঢাকার সাথে), রায়পুর, কাপড় হাটা ২ রাত, পূর্ব গলি ২ রাত, লক্ষ্মীপুর চকবাজার, মাছবাজার, গরহাটা, তেয়ারীগঞ্জ, মজুচৌধুরীর হাট, চর ফ্যাশন, ভোলা (বেলায়েত বয়াতি) ভোটের কাজ, সরকারি অনুষ্ঠানে, রাজনৈতিক সমাবেশ রায়পুর নতুন স্কুল, চাঁদপুর (কোর্ট-এর সামনে-কমলদার খাঁর সাথে) ঔষধ বেচার গান হাট-বাজারে, রায়পুর মোল্লার হাট, খালের হাট, চর ভৈরবী, হাইমচর, ভবানীগঞ্জ আরো কত জায়গায় গান করি। গানের নেশা- দেশের মধ্যে বাড়ি বাড়ি বিয়ের গান হতো।

আমরা ৫ ভাই ছিলাম। আমি দুই জনের বড়। আমাকে কেউ কিছু বলত না। কাম-কাজ করতাম না। আমার লেখা কোনো গান নাই। গাইতে গাইতে তৈরি করি। আমার গান—পালা ও জারিগান। পালাগান—প্রশ্ন-উত্তর : কারবালা ঘটনা কাহিনী নিয়ে, নবী ও পয়গম্বরদের জীবনী, হিন্দু দেবতা, বাব-বেটার লড়াই (আলী-হানিফা, সোহরাব-রুস্তম) ইসমাইল-কোরবানি জারি। এর মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর হতো। বাবার বাধা—দাদার উৎসাহের মধ্যে বয়াতির গান শুনতে যাই এভাবে হয়।

স্ত্রী—আলিমের নেছা, মেয়ে ১ জন, নাতি ৩ জন, নাতনী ৪ জন। কোনো রকমে নাতিরা পরিবার চালায়—আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও মানুষ ইজ্জত করে।

শীতকালে ভাটি অঞ্চলে রেডিও ছিল না সে সময়—এটা চর্চা ছিল বেশি। । এদেশে তেমন কোনো দল ছিল না। ধর্মীয় সমস্যা হয় নাই। গান শুনে বিয়ের প্রস্তাব পাই। কোথাও কোথাও উপহার পাই। শিষ্যরা মাঝে মাঝে সাথে থাকে।

শীতকালে ৬ মাস গান হয়, বাকি ৬ মাস বাড়ি থাকতাম, খরচ করি, খরচের পর তেমন কিছু থাকত না।

শিষ্যরা : শহীদ উল্যাহ বয়াতি, কামাল, হোসেনসহ সবাই শক্ত, এরা মাঠে আছে।

আর্থিক : আমিন উল্যা বয়াতির সাথে ৫০-৫১ টাকা পাইতেন, দল হওয়ার পরে এক রাতে ৩,০০০ টাকা, পরে ৪০০০-৫০০০ টাকা করে পেতাম।

যন্ত্রপাতি : হারমনি- হাবিব উল্যাহ, আবুল্যা, চরপাতা ও সন্তোষপুর। ঢোল : হেম চন্দ্র দুলি -আলোনিয়া। শীষ বাঁশি : সাধন বাবু, চণ্ডিপুর। জুঁড়ি : মমিন, হায়দার।

সেরা গান : বিবির হাট, শিন্নির হাট, মতির হাট, চক বাজার, ছমির হাট (চর বাডা) টিকেটে গান হয়।

ফকির আশরাফুর রহমান : পিতা মরহুম হাজী আবদুর রহমান পেশকার, মাতা : আনোয়ারা বেগম। পিতা : চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার শরীফের খলিফা ছিলেন। লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে দরবার শরীফের মাহফিল ও জলসা করতেন। ছোটবেলা থেকে ফকির

www.pathagar.com

আশফাকুর রহমান পিতার অনুসারী হয়ে মাহফিলে ও বিভিন্ন মাজারে আসা যাওয়া করতেন। তিনি মাইজভাণ্ডারের মুরিদ ও পরে খলিফা হন। তিনি কাওয়ালি, মারফতি, দেহতত্ত্ব ও নারীতত্ত্ব , মুরশির্দী, পল্লীগীতি, আঞ্চলিক গানে পারঙ্গমতা অর্জন করেন। লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর, রামগতি, রামগঞ্জ, ও সদর উপজেলার বিভিন্ন গঞ্জ ও শহরের সংগীত আসর ছাড়াও ঢাকা চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন ও মাইজভাণ্ডার শরীফের কাজে জড়িয়ে থাকেন। নিজের লেখা ও সুরে তিনি গান গাইতে ভালোবাসেন। প্রায় ৪শ গান, সাড়ে ৩শ কবিতা ও 'বিষাদ তরঙ্গ' নামের একটি কাব্যগ্রন্থ ফকির আশরাফ রচনা করেছেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা ছাড়াও তিনি বেঞ্জু নামক একটি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। সরাসরি কোনো ওস্তাদের কাছে গান শেখেননি। তবে চট্টগ্রামের আবু কাওয়াল থেকে সংগীতের পূর্ণতা লাভে তিনি কিছুটা সুযোগ নিয়েছেন। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জের দুলাল কাওয়াল ও রামগতির ফকির দুলালসহ তাঁর ৭-৮ জন শিষ্য রয়েছেন। তিনি প্রায় ৬০ বছর লোক সংগীতের সাধনা করেছেন।

ফকির আশরাফুর রহমান

১.আঞ্চলিক

ফকির আশরাফুর রহমানের কয়েকটি গানের পঙ্ক্তি নিচে উদ্বৃত করা হলো :

ও চাচাতো ভাই, কাইললারে আঁরে ওগ্‌গা জলপই দেসনারে
গাছে বইবই বেগগোন খাইলি/দানা হালাস আঁর লাইরে,
ও চাচাতো ভাই
নুন মইচের গুঁড়া আইনচি / বাই-বোইন খাইবার লাই,
গাছে বই বই মজা মারছ/ হাকনা জলপি হাইরে,
ও চাচাতো ভাই

২. পল্লীগীতি

চুরি করি নিলি আমার মন, প্রাণ বন্ধুরে, চুরি করি নিলি
চোরা যে কী দুষ্ট কথা তার কী মিষ্ট, পষ্ট করি বলিত যখন,
তার মিষ্টি কথায় ভুলিয়া, পাগলিনী সাজিয়া

www.pathagar.com

জাতি কুল মান হারাইলাম সকল
চুরি করি নিলি আমার মন।

৩. মারফতি

আহারে মন নিশার স্বপন ভাঙ্গার দুচার দিন পর
আহারে মন
যতই কর বাবু আনা, চশমা ঘড়ি ফুল বিছানা
হাতের ছড়ি চাবিখানা, পাউডার মাখ মুখের পর
ও তোর বুড়াকালে কিরূপ হইল আয়না ধরে বিচার কর
আহারে মন।

আমি তো একজন, তুমি তো আরেক জন,
আরেক জন হইলে তোমার রূপ নাই কেন?...
লীলার গোলা আল্লাহতায়ালা, প্রেমময় লীলার খেলে ছলাকলা
কুন মোহাম্মদ শব্দকে বলিল,
লুকাইল কুন মোহাম্মদ বলি কোথায় খোদা লুকাইল?

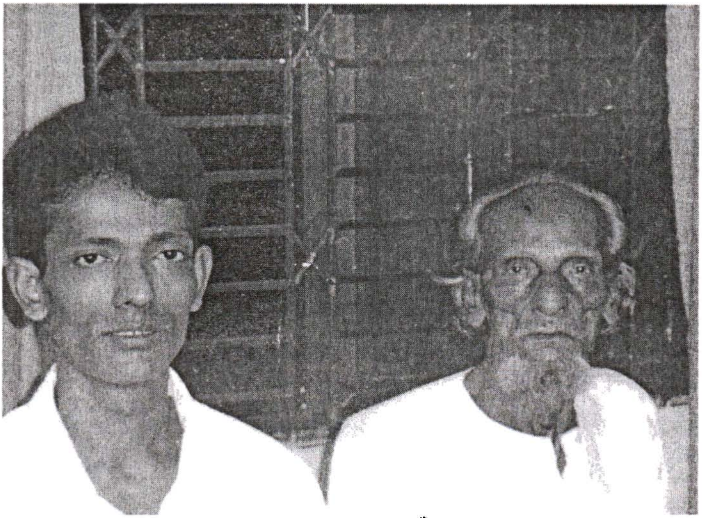

মরহুম মান্নান সরকার ও তাঁর ছেলে

আবদুল মান্নান সরকার : সদর উপজেলার রাজিবপুর গ্রামে আবদুল মান্নান সরকার জন্মগ্রহণ করেন। হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে রাস্তার উপর পল্লী কবিতার বই বিক্রি করে বেড়াতেন। দর্শক ও ক্রেতা আকর্ষণের জন্য কবিতা সুর করে গাইতেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ, সুর ও দেহ ভঙ্গিমা তাঁকে পরিচিতি এনে দেয় এবং পেশার প্রসার ঘটে। মান্নান সরকারের কবিতা ও গানে সনাতন বাংলার ছবি ফুটে উঠে। তিনি পল্লীগান ও বারোমাসি গানে প্রেম, বিচ্ছেদ এবং জারিগানে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখতেন ও সুর দিতেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন, নিজ গ্রামের আরশাদ উল্লাহ (ঢোল), বশির উল্লাহ (জুড়ি) ও দীন মোহাম্মদ (দোতারা)। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হলো :

www.pathagar.com

বন্ধুরে বাঁশির সুরে মন উদাসী ঘরে রইতে পারি না/ বাজাইয়া তার বাঁশের বাঁশি আমার মন কইরাছে দেওয়ানা। এসো এসো প্রাণের বারোমাসি বন্ধু এসো তাড়াতাড়ি।

ইতিমধ্যে না আসিলে গলায় দিব ছুরিরে
ফালগুনে নয়গুন জ্বালা যৈবন দিছে মোড়া
যেই নারীর ঘরে সোয়ামি নাই সদাই তার কপাল পোড়ারে
চৈত্র মাসে পুষ্পের গতি কুকিলে কুহুরে
সদাই মনে হু হু করে মন টিকে না ঘরে রে
বৈশাখে কৃষকের ক্ষেতি মাঠে বুনে ধান
রাখালিয়ার গান শুনিয়া বিদরে পরান রে
জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় পিপাসা গাছে পাকে আম
কারে লইয়া খাইতাম আমি ঘরে নাই মোর শ্যাম রে
এই পর্যন্ত বারোমাসি ক্ষান্ত দিয়া যাই
মান্নান বলে পাইবা পতি ধৈর্য ধরো ভাই রে
বৈশাখ মাসে বারোমাসি ফুল ফুটে নানা রসে,
ভোমরা মধু খায় ফুলের মাঝে বসে
জ্যৈষ্ঠ মাসে আম ফল সর্বলোকে খায়,
নারী যে চিপিয়া দেয় পতির খানায়

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জারিগান হলো :

(ক) হাসান-হোসেনের জারি
(খ) শরীয়ত ও মারফতের জারি
(গ) হিন্দুয়ানি ও মুসলমানি জারি
(ঘ) দুনিয়া সৃষ্টি ও কেয়ামতের জারি
(ঙ) আদম-হাওয়ার জারি
(চ) বিদ্যা-বুদ্ধির জারি
(ছ) স্বর্ণ-লোহার জারি

ননীমোহন দাস : রামগতি উপজেলার চর ডাক্তার গ্রামে ননীমোহন দাস জন্মগ্রহণ করেন। একজন সাধারণ কৃষক ননীমোহন একাধারে লোকসংগীতের একজন গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। পল্লীগীতি, বাউলগান, সারিগান লিখে সুর করে ও গেয়ে তিনি নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে তাঁর গানে প্রেম-বিরহ ও শ্রেণি-শোষণের চিত্রকল্প উঠে আসে। তিনি একতারা, দোতারা, খুঞ্জরা, করতাল ও খর্মক বাজিয়ে গান গাইতেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সাল-তারিখ জানা যায়নি।

তাঁর গাওয়া কয়েকটি গানের পঙ্‌ক্তি :

১. পাইতানা পাইতানা ও বন্ধু যত কর আশা
ঘরের পিচে বইসা বন্ধুরে যত মার মোশারে—

www.pathagar.com

২. বাউল : তারা তিন পাগলে যুক্তি করি। খেললো রসের খেলারে
কার লাইগা হইলাম পাগলা রে—

৩. সারি : (ধোঁয়া) প্রথমে প্রভুর নাম, ওরে ভাইরে নাসে কর সার
বিপদে পড়িলে গুরু করিও উদ্ধার। জোয়ানেরাও
জালে জালে যুক্তি করি, জল আনিতে যায়
কারখান চোড কারখান বড়, ডান্ডা মাপি চায়
মায় বলে ফুলবান ফুলবান, বাপে বলে ঝি
এক্কই রাইতে সাতখান কাপড় কেমনে ভিজাইলি।

কৃষ্ণকুমার মজুমদার : লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চররুহিতা গ্রামে একজন কৃষিজীবী কৃষ্ণকুমার মজুমদার। বয়স প্রায় ১০৫ বছর। স্থানীয় বিয়ে-উৎসব অনুষ্ঠানে এককভাবে কিংবা দলবল নিয়ে গান গাইতেন। নিজেই গান লিখতেন, সুর করতেন। তাঁর গানে সাধারণ ঘরের প্রেম, বুড়োবুড়ির প্রেম, বখে যাওয়া সন্তানের বাবা-মার সাথে সম্পর্কের ব্যঙ্গ চিত্র, বন্যা ঝড়ের কিংবা পল্লির দৈনন্দিক রঙ্গরসের ব্যঞ্জনা হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। শতাধিক বছরের বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণকুমার মজুমদার এখনও যৌবনের স্বপ্নঝরা দিনগুলো স্মরণ করে কিছু কিছু স্মৃতি ধরতে পারেন। তাঁর গানের কিছু নমুনা নিম্নরূপ :

১. জাল্লার মাথায় জালের বোঝা, মরা মাছের খারি
কিবা প্রেম শিখাইলি জাইল্লাইরে

২. বুড়ি কেমনে আইলি ধাইয়া, শ্বশুর বাড়ি যাত্রা কইরলাম আমি
হারিকেন ভেজাইয়া, চৈত্র মাস হরবের কালে
বুড়ি ভোঁতা কাঁড়ল খাইয়া

৩. ঘোর কলিতে থাকবে আর মানির মান
পুতে পরে উলের ধুতি বাপে পরে নেংটিখান
কলির বর্তমান, বৌকে পরায় পাটের শাড়ি, মাকে পরায় ছিঁড়াখান

৪. ও আমি ভাবতে ভাবতে যাই, ভাবিয়া না পাই
ঘর বাড়ি ভাসাইলো, খেরের হারা ভাসাই নিল, নারার হারা নাই
মহিষ গরু ছাগল ভেড়া ভাসাই নিল দুধের গরু নাই
আমি ভাবতে ভাবতে যাই,

৫. রবিবারে লক্ষ্মীপূজার গান গাইতে যাই
আমার ভাগিনা হেমন্ত বাবু গানের ছিল রাজা
রাত যখন দশটা হইল করিয়া দিল মানা
নিবারণে নাইকল কোরায় কামিনি ধরে আঁচ্চা
রঙ্গ মাঝি উঠিয়া বলে এই কথাটি হাঁচা
গঙ্গা খিলে চাঙ্গারে ভাই, কামিনি ধরে বাঁশ
নিবারণে মাইধ্যে হড়ি কইরলো সর্বনাশ।

৬. সোনার তরীর রঙ্গিলা বাদাম কোন ঘাটে যাও বাইয়া
তরী আগায় পাছায় লখের বাতি জ্বলে রইয়া রইয়া
তরীর মাঝখানেতে ছইয়া, সে খানেতে বসত করে মাঝি মাল্লা লইয়া।

www.pathagar.com

গোলাম মহিউদ্দিন দুলাল : কমলনগর উপজেলার অন্তর্গত চর পাগলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুর পাগল শিল্পী গোলাম মহিউদ্দিন দুলাল কৈশোরে সুর সংগীত জগতে অদেখার সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। পথের নুড়ি কুড়িয়ে সিদ্ধি অর্জন করেছেন। ঘরদোর বলতে ভাঙা ডেরা। অমানবিক জীবনযাপন করছেন এ মহৎ শিল্পী। এদের দেখার বা খোঁজ নেয়ার কেউ বুঝি নেই। বারো বছর বয়সে শিল্পীর দাদা, বাবা, দাদি মারা যাওয়ার পর অসহায় হয়ে পড়েন। সংগীত ও সুরের নেশায় ঘর ছাড়া হন। প্রথমে ওঠেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী নূরু কাওয়ালের আস্তানায় (কল্যাণনগর, দত্তপাড়া, লক্ষ্মীপুর)। দুই বৎসরাধিককাল ধরে গুরুগৃহে তালিম, শিক্ষণ ও গায়ন। প্রথমে ওস্তাদের কাছে শেখেন হারমোনিয়াম বাজানো। তাঁর চাচা বহু খোঁজাখুঁজি করে শিল্পীর সন্ধান পেয়ে রফিকউল্যা মিয়া তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু রক্তে যার সুরের বান ডাকে তাকে বেঁধে রাখে কে? কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর আবার সুরের মায়াজালে গৃহ ত্যাগ করেন। বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে তৎকালীন প্রখ্যাত বয়াতি হাফিজ উল্লাহ (লালামচর, লক্ষ্মীপুর) সাহেবের কাছে গিয়ে উঠলেন। বছর খানেক গুরুগৃহে থেকে দোতারা বাজানো শেখেন। ওস্তাদ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রিয় শিষ্যকে নিয়ে গান করেন। ওখান থেকে সুর সংগীতে আরও দক্ষতা অর্জনের জন্য চলে যান মফিজ ভাণ্ডারির আস্তানায় (চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী)। সেখানে অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর জন্য ডেল্টা জুট মিলে চাকরি নেন। একই সাথে চলে জীবিকার্জনের তাগিদ ও সুরের ঘোর নেশা। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে গানের আসরে ঘুরে বেড়ান। দুই বছরের অধিক চৌমুহনীতে কাটিয়ে বাড়ি এসে ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) মুর্শিদে কেবলা মাইজ ভাণ্ডারীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এখানে পির সাহেব ছৈয়দ মাইন উদ্দিন আহমদের নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। পির সাহেব শিল্পীর পরিচয় জেনে, সংগীত সুধা পান করে প্রাণভরে আল্লাপাকের দরবারে শিল্পীর জন্য দোয়া করেন ও পথের নির্দেশনা দেন। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে বিয়ে-সাদী করে গৃহ ও মায়ার সংসারে আবদ্ধ হয়ে যান। বাড়িতে জোত-জমিন তেমন ছিল না। গ্রামের ডাক্তার শুভার্থী গিয়াস উদ্দিন সাহেবের বদান্যতায় তাঁর ফার্মেসিতে পাঁচ বছরের অধিক চাকরি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর মাঝেও বাড়িতে জমাতেন বাউল গানের আসর। গায়ক ও বাদক হিসেবে চারদিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন জায়গায় সংগীত পরিবেশের জন্য ডাক আসত। দলবল নিয়ে সে সব আসরে গিয়ে রাতভর গান করতেন। দুই হাজার সালে অকুস্থলে একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সুফিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ফজিল মিয়ার হাট, চরপাগলা, তৎকালীন রামগতি) কমলনগর প্রতিষ্ঠিত হয় এলাকাবাসীর দয়া দাক্ষিণ্যে। এলাকার লোকজন উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিল্পীকে এম.এল.এস.এস পদে চাকরির ব্যবস্থা করেন।

কৃষ্ণগোপাল বাউল : রামগঞ্জ উপজেলার চাঙ্গির গাঁও গ্রামে লোক সংগীতের অনন্য ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণ গোপাল বাউল জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় একজন শিক্ষক। দোতারাকে সাথী করে এ অঞ্চলের সংগীত ভুবনকে তিনি জয় করেছেন। প্রায় ৮০ (আশি) বছরের জীবন এখনও স্বাচ্ছন্দ্যে বয়ে বেড়াচ্ছেন। একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক

www.pathagar.com

হিসেবে কৃষ্ণ গোপাল বাউল বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তিনি লালন ফকিরের জীবন কাহিনী, কিংবদন্তি এবং সাধারণ মানুষের মানমমূর্তিকে রূপায়িত করেছেন।

বাউল গান পরিবেশনরত হানিফ বয়াতি

পণ্ডিত প্রভাতচন্দ্র দাস : লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি উপজেলার চর ডাক্তার গ্রামের গ্রাম্য কবিরাজ ও শিক্ষক প্রভাতচন্দ্র দাস লোক সংগীতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রচুর গান লিখেছেন। নিজের লেখা গান তিনি সুর করে গাইতেন। রাগ-রাগিনীর উপর তাঁর অনেক দখল ছিল। সাধারণ বৈষ্ণব গান, মানুষের গান, দেশের গান, কীর্তন, পূজার গান গেয়ে নিজ এলাকায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছেন। স্থানীয় আসরে মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে দলবল নিয়ে গাইতেন। তাঁর গাওয়া গানগুলো এলাকার জনমনে আজো গেঁথে আছে। পণ্ডিত প্রভাতচন্দ্র দাস ছিলেন একজন সুরপাগল। তাঁর বেশিরভাগ গানগুলো ছিল গরিব ও দুঃখীদের নিয়ে। তিনি বিভিন্ন ধরনের গান লিখতেন। যেমন : দারিদ্র, দুঃখ, দেশ বন্দনা, বাউল ও ধর্মীয় গান। তাঁর কয়েকটি গান নিম্নে প্রদান করা হলো :

১. মাগো গরিবের সুখ নাই কপালে
বদলা দিয়ে মা বাজারে গেলে
বাবুর কাছে দামটি চাইলে,
বাবু টাকা নেই বলে পকেট আছাড়ে
মাগো ধনী লোকের নাই মা ঠেকা
এক মন বেচিলে হয় ষোলো টাকা
বারো টাকায় কিনতে পারে শাড়ি

www.pathagar.com

চার টাকার মাছ তরকারি
তৈল তামাক পান-বিড়ি

২. মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারত ভূমে
কালক্রমে কত লীলা হয়

৩. বসে বকুল ডালে, রাধাকৃষ্ণ বলে ডাকে কোকিল পাখি
নিত্য চিত্ত পুলকে ডাকে যে স্বরে, অতি কুইরে কয় বিধুমুখী।

৪. বর্শিকন কহিতেছি আমি, মন বলে তোমার সঙ্গে দেখা করি
প্রতিদিন, উপলক্ষ কিছু বিনে কেমনে আসিব বল শুনি।

৫. একদিন নাগর কানাই গো চারণে গিয়াছে রাখাল সনে
কাননে যমুনা কূলে, তখন রাধার কথা মনেতে পড়ে
অতি কাতরে সুবল বলে, আমার প্রাণেরশ্বরী রাই কিশোরী ।

হানিফ বয়াতি : হানিফ বয়াতির একান্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাঁর জীবন, কর্ম ও সংগীতজীবনের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমার পিতা ছিলেন আইয়ুব আলী। মা কামিন জান বিবি, বয়স ৭৫ বছরের উর্ধ্বে। মা ছিলেন মনোরদ্দি সর্দারের মেয়ে। আমার বাবা পাতার হাট গেছিল এক বন্ধুর লগে। সেখানে যাইয়া বরিশাল জেলার অন্তর্গত পাতার হাট-মেহেন্দিগঞ্জ থানায় বিবাহ করিয়া মাকে নিয়ে আসে। আমার বাবা মাকে নিয়ে নৌকা বাইত। সে ঘরে আমরা ভাই-বোন ছিলাম ৬ জন। ৭০-এর বন্যায় ভাই-বোন, ভাগিনা, ভাগ্নি সবাই মারা যায়। আমি, মা, ভাই ও বোন ৪ জন বাঁচিয়া থাকি। গাছে ছিলাম, ১৯ হাত উপরে (কামারখালী-ভোলা)। পরে মাকে নিয়ে ভাই-বোন নিয়ে আইছি ভোলা। সরকার (বয়াতি) দেখাইয়া মান্নান ডাক্তার নৌকা জাল দিছে। রিলিফ দিছে। তারপর বাইদাদের ভেতর সর্দার হই। বাইদারা অন্যায় কাজে হুদাহুদি কাইজ্জা লাগে, কজন জরিমানা কারে খাইতো, আমি বাঁধা দিয়। এরা ভেতর ভেতর একত্র হইয়া আমার মা-ভাইদের কাইটা নদীতে ফালাইয়া দেয়।... লাশ পাইয়া বরিশাল নরা উঠি। ডাকাতগণ ধরা পড়ে।... পাগল হয়ে আমি দেশে দেশে ঘুরি, হাজিরা না দেওয়ায় মামলা শেষ। আমি ভোলা থানায় ১৮ মাস ছিলাম। পরে ঠিক হওয়ায় পর দেশে আসি, দেশ টুমচর, লক্ষ্মীপুর বাপের বাড়ি, ফুফুদের কাছে। আগের স্ত্রী ও ৩ মেয়ে হেরা গেছে চর রুহিতা।... এরপর জেঠায় বিয়ে করায়। শাকচর এ বৌ নিয়া আছি। ১ মেয়ে ৩ ছেলে। মেয়ে বিয়ে দিছি-আমিনুলা, ব্রিকফিল্ডে কাজ করে। ছেলে টেম্পু ও নৌকা চালায়। বর্তমানে ৩ ছেলে যা রোজগার করে তা দিয়ে কোনো মতে ডাল-ভাত খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি। আমার এখন অনেক বয়স হয়ে গেছে, আমি তেমন কাজকর্ম করতে পারি না। শরীরে শক্তি পাই না। আমরা যারা জীবনের বেশিটা সময় গান গেয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়েছি, মাতিয়ে তুলেছি, মানুষের মন রাঙিয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে আনন্দ দেওয়ার মতো আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রথম ওস্তাদ বাপ। স্কুলে দিলে থাকি নাই। বাবায় পুথি পড়ত, গানের ছন্দ টন্দ বলত, হেডা আমারতোন খুব মজা লাগত। হেরপর অন্যখানে অন্যান্য বয়াতিরা গান গাইলে

www.pathagar.com

ওখানে আমি শুনতে যাইতাম। আস্তে আস্তে আমি দোতারা সংগীত করতাম। এরপর ঢোল সংগীত করতাম। হেরপর বাঁশি সংগীত করতাম। হেরপর বেহালা সংগীত করতাম। পরে টুকটাক ওস্তাতগোতন– কিতাব আলী বয়াতি- হাজীগঞ্জ কাছ থেকে কিছু সুর সংগীত শিখলাম। মারফত আলী বয়াতি– হাজীগঞ্জ, তার চাচাতো ও জেঠাতো ভাই ছিল। কালোন বয়াতি কামারখালী, ভোলা। এরপর বায়না গাইতাম শরিয়ত মারফত পালা । সস্তার আমলে ৬-৮ হাজার টাকা বায়না গাইতাম। এটা কইরা জীবন যাপন করতাম।

দলে ৪-৫ জন থাকত। ভোলার ইলিশার এদোন আলী– ঢুলি ও মৃত রহমান আলী– পাতিল, মৃত নাছির আলী– ঝুড়ি, আলমেশ সর্দার– ঝুড়ি। এরা খুব ছিল। প্রয়োজনে মাছ ধরা বন্ধ করে যাইতো। শিষ্য– ১. ইউনুছ বয়াতি ভাই ২. দুদুমিয়া বয়াতি ৩. হাসান আলী বয়াতি ৪. হাতেম আলী ৫. হোসেন বয়াতি ৬. খালেক বয়াতি। আমার দোহারী রেহানা আক্তার (চাঁদপুর), এখানে আসে তারা সর্দার (জেলে) গ্রুপ, গান গাইতো এবং মাছ ধরতো। আমার কাছে বিয়ে বসে। রেহানা আক্তারের গলায় একটি টিউমার হলে সে এখন মৃত্যু পথযাত্রী। আমার কোথায় বাস জানি না। আমার মতো দুঃখী কেউ নাই।

আমার বাপ দোতারা, ঢোল, বেহালা বানাইতে পারতেন। মিস্ত্রীর হাতল-বাডাইল নিয়া। ঢোল নিম, কাঁঠাল, আম কাঠ দিয়া হয়। বেড় দেয় বাঁশের চালি, লোহা বা বেত দিয়া। এখন টেম্পু ঘুরাই। এখন আমার কাছে ঢোল, বাঁশি দোতারা আছে।

একান্ত সাক্ষাৎকারে হানিফ বয়াতি। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন প্রধান সমন্বয়ক

বায়না করে গান গাই ভোলার চন্নাবাচ, ব্যংকের হাট, লালমোহন, চরফ্যাশন, ভবানীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, হাতিয়া, সন্ধীপ, রায়পুর, কেরোয়াসহ বহুস্থানে।

কেরোয়ায় মধুবয়াতি, গৃদকালিন্দিতে আনোয়ার, বর্ডার ভূঁইয়ার হাটে দেওয়ান মালেক সরকার, রামগতির আলেকজান্ডারে শহীদুল্লা বয়াতি, আজাদনগরে ইদ্রিস বয়াতি, পোড়াখালী ও বিবির হাটে হায়দর আলী বয়াতির সাথে বড় পাল্লা গান করি। হারান শীলের সাথে আমার ওস্তাদ মারফত আলী বয়াতির বড় পাল্লা গান হয়। আমি ওস্তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। শেষ দিকে মনপুরা, গেয়ালিয়া, ভোলা, গাজীপুর, পাতার হাট,

www.pathagar.com

মেহেন্দীগঞ্জ অনুষ্ঠান করি। শীতকালে অন্য সময় মাছ ধরতাম, সর্দার গো দলে গান গাইতাম। চিটু সর্দার ফুর্তিবাজ ছিল। তার ছেলে আবদুল জয়নাল, সে ঢোল তবলা বাজায়। বিয়ে-সাদীতে মজা হতো, সেখানে গাইলে ২-৩ হাজার টাকা দিত।

ভোলার কামারখালী, চর ফ্যাশন, দর্শক আনন্দ পাইতেন। পোড়াখালী, বিবির হাট ১১ জন বয়াতি একসাথ হয়ে আমার সাথে পালা লাগে। আমি ও আমার ভাই ইউনুছ বয়াতি। তারা যুক্তি করে গান গাইতে দিমু না, প্রশ্নের জবাব নিতে দিমু না। তখন তারা মারফত নিল আমারে শরিয়ত দিল। আমারে শরিয়তে মোল্লা বানাইয়া মনে করছে আমি হারি যামু। হেরা আনিছ বয়াতি, দাইমুদ্দিন, ইদ্রিস, সালেম, আবদুলসহ মোট ১১ জন।

হায়দার আলী ঠগি (হেরে) যাওয়ার পর হেরা একসাথ হয়ে আমারে ঠকাতে চায়। হেসুম আমি হক সাহেবের (তার পির) মাঝারের তোন গেছি। কইছি, আমার যদি অচল হই, আমরা যদি ডুবে যায়, কখনও তোমার দরবারে কখনও যামু না। চোখের পানি পালাইয়া যখন স্টেজে দাঁড়াই, দেখি হক সাহেব আমার সামনে, অথচ ৩ মাস আগে মারা যায়। তখন আরো কান্না পায়। আমার দলের সবাই ভিতু হইল। আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। আমার বাইদার দলও যায়। তারাও চিন্তিত, মনে মনে চিন্তা করি। ১ম প্রশ্ন কোরআনে কয়টা মনজিল, কয়টা সেজদা, ৩০ পারার উপর কিছু আছেনি, নবিজি বিবির কুলছুমা, মা ফাতেমার ছেলে সন্তান আছেনি? জাহেরি বা বাতেনি? প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গান গাইতে পারবে না।

বায়না আমাগো ১ হাজার, তারা জাইলা, তাদের ১ হাজার, এটা ঠিক অইলো না, আমি মুর্খ লোক, তারা বিদ্ধান তারা এটাও বলিয়া গেছে। উত্তর দিলে তারা গান গাইতে থাকে আমি প্রতিবাদ করলে পাবলিক ক্ষেপে গেলে তারা পালিয়া যায়।

হানিফ বয়াতির বর্তমান বয়স ৭৫ বছর। বয়সের ভারে তিনি এখন আর আগের মতো গান করতে পারেন না। তাই তার আয়-রোজগারও কমে গেছে।

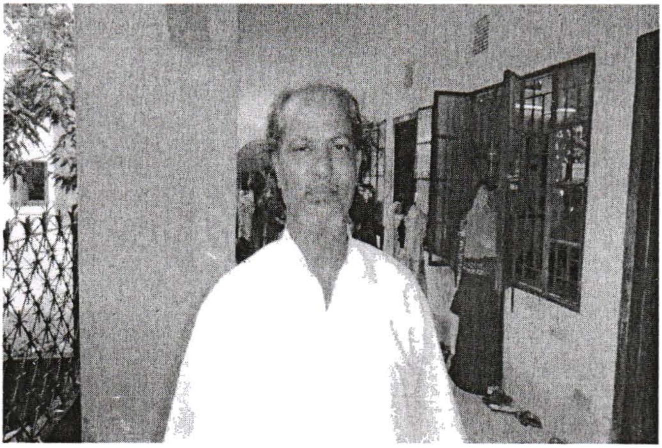

হোসেন বয়াতি

www.pathagar.com

হোসেন বয়াতি : লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামে হোসেন বয়াতি জন্মগ্রহণ করেন। ১০-১২ বছর বয়স থেকে একই গ্রামের বাড়ির পার্শ্ববর্তী ওস্তাদ মো. জালাল মিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি লোক সংগীতের পথে পা রাখেন। তিনি ওস্তাদের সাথে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান এবং হাট বাজারের কবিরাজি ঔষধ বিক্রিকালে জারিগান, পল্লিগান মারফতি, মুরশিদি, কবিতার বই (স্থানীয় কোনো ঘটনার ছন্দবদ্ধ রসাত্মক ও সুরে প্রকাশ) পড়া ও অঞ্চলিক গান গেয়ে বেড়ান। গত ২৫ বছর তিনি লক্ষ্মীপুর ছাড়াও ভোলা, বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন ছোট বড় শহর, হাট-বাজার, গ্রামে ও নদীর ঘাটে তাঁর ভাবশিষ্যদের নিয়ে গান গেয়েছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর দলে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা হলেন– হুমায়ুন, আমিন (গায়ক) জহর আলী (বাদক কাসার জুড়ি), সুব্রত পোদ্দার (বাদক ঢোল)।

সম্প্রতি লক্ষ্মীপুর জেলার লোক সংগীতে যারা নিজেদের জড়িয়েছেন তাদের মধ্যে হোসেন বয়াতি খ্যাতিমান। কণ্ঠ ও সুরের যাদু দিয়ে লোক সমাগম করা কিংবা সমাবেশ ধরে রাখার মন্ত্র তিনি জানেন। একটি দোতারা হোসেন বয়াতির হাতের সম্বল। অতি যত্নে দোতারাটি পুষে রাখেন। সংগীতকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। লক্ষ্মীপুর শহরের থানা রোডের দৈহিক প্রতিবন্ধী অহিদ উদ্দিন রতন হোসেন বয়াতিকে গানের ক্যাসেট ও সিডি বের করার সুযোগ করে দেন। অহিদ উদ্দিন রতন রচিত ও সুরারোপিত আঞ্চলিক গান নিয়ে 'কলিকালের গান' নামে হোসেন বয়াতির ক্যাসেট ও সিডি বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এ ছাড়া 'মজিদ মালতির কবিতা' নামে একটি ক্যাসেট এ অঞ্চলে আলোচিত হয়েছে।

১

ও পুত কি কাম করলি রীতিমত স্কুলে ন যাই
ও তুই লেহা-পরা না শিখি তুই নিজের দিওছ কোয়াল খাই
হারুন্যার মার হোলা যেগ্যা এম এ হাস কইছ্যে
হেইগ্যা তো তোর হোয়ারে এক শ্রেণির হইয্যে
তোর কোয়ালে জাটার বাড়ি স্কুলের তন গিয়োস দাই
লেহা পরা না শিখি তুই নিজের দেওছ কোয়াল খাই

২

ইলিশ মাছ রাইনছে মায় আমরা যে খামু
হাঁকে দি মেজবান আইছে নানা আর মামু

৩

বাইসাব আঁই ঢাকা যাইয়াম/চাকরিত কইরয়াম যুইন
ঢাকার তোন আই বিয়া কইরয়াম/আঁর খালাতো বইন

৪

পঞ্চ রসে রাখাল বেশে ফুটলো ফুল

আবদুল্লার ঘরে
তারে চিনতে কজন পারে, তারে ধরতে কজন পারে

www.pathagar.com

ছিল ফুল আরশেতে কেউ নারে চিনতে পারে
আচম্বিতে ফুটলেরে ফুল মা আমিনার ঘরে।

করিয়াল নাসির সরকার : কবিয়াল নাসির সরকারের জন্ম লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার কুশাখালী গ্রামে। নেসার সরকার নামেই সমধিক পরিচিত। পিতা প্রয়াত নেয়াব আলী, মাতা নূরননেছা। নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। বর্তমান পেশা খোনকারী, লোকচিকিৎসা, কবিরাজি। তিনি একাধারে কবিয়াল, গজলকার এবং যাত্রাভিনেতা। উৎসাহ পেয়েছেন তার ওস্তাদ পালাকার বেলায়েত হোসেন ও তৎকালীন সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে। লক্ষ্মীপুর সদরের জামির তলির বেলায়েত হোসেন তাঁর ওস্তাদ-গুরু। তার বর্তমান বয়স ৭০ বছরের কাছাকাছি।

মুক্তিযুদ্ধ কালীন তিনি রামগঞ্জ হতে দিঘলী, ছয়ানী বিস্তৃত অঞ্চলের গোপন সংবাদদাতা ও বাহক ছিলেন। সদর লক্ষ্মীপুরের অন্তর্গত ছাদু মাঝির (রহিমপুর- চরশাই বাড়ির মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প কর্তৃক এসপি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু চন্দ্রগঞ্জের রজাকারের কমাণ্ডার চিঠি লিখে সারেন্ডার করতে পাঠালে তিনি পাল্টা চিঠি লিখে তার কাছে পাঠান। যার ফলশ্রুতিতে রাজাকাররা তাঁর (তৎকালীন রহিমপুরবাসী) বাড়ি ঘর পুড়ে দেয়। কিন্তু তিনি কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, সনদ, অনুদান পাননি। কিছু পাওয়ার জন্য তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি বলে জানান।

যে সংগীত শিল্পী হাজার হাজার মানুষকে গান গেয়ে নাচিয়েছেন, নিজে নেচেছেন আজ তাঁর কি দীনতা না দেখলে অনুধাবন করার যো নেই। ভাঙা ঘর, ভাঙা বেড়া। সামান্য তাবিজ, কবজ, লোকজ চিকিৎসা করে হতদরিদ্র জীবনযাপন করেন। তাকে দেখার বা খোঁজ নেয়ার কেউ নেই।

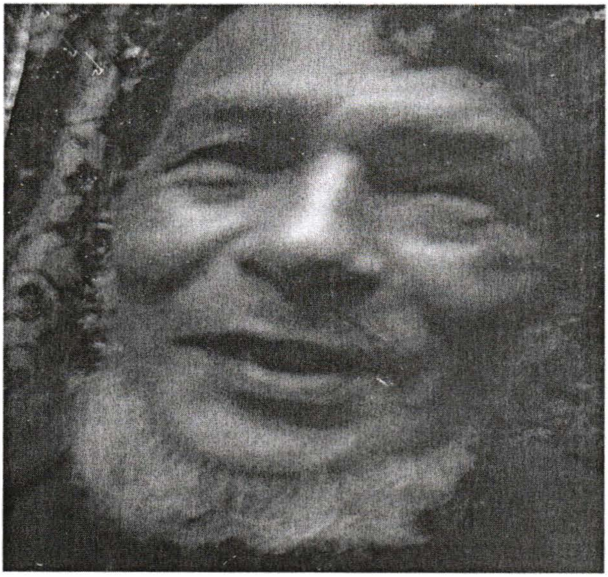

কবিয়াল বদু মিয়া

www.pathagar.com

পল্লীকবি বদু মিয়া : পল্লীকবি বদু মিয়ার জন্ম হয় লক্ষ্মীপুর সদরের দিঘলী বাজার ইউনিয়নের পূর্ব দিঘলী গ্রামে। তার বাবার নাম রেনু মিয়া, মাতার নাম : মমতাজ বেগম, বর্তমানে তার বয়স ৬৫ বছরের কাছাকাছি। তিনি ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। লোকসংগীত শিল্পী হলেও কৃষি পেশার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

নিতান্ত বাল্যবেলায় সংসারের দায়ে তাঁর সাংস্কৃতির এ শাখায় আবির্ভাব ঘটে। ওস্তাদ ছৈয়দ আহাম্মদ মিয়া (মৃত) আত্মীয় হতেন। কবির কণ্ঠ ও গায়ন ভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে কবিকে নিয়ে বাজারে বাজারে কবিতা গেয়ে কবিতা বিক্রি করতেন। প্রতিটি কবিতা বিক্রি করা হতো ২৫ (পঁচিশ) পয়সা। খরচ হতো ৫ পয়সা। কবিতা বিক্রির প্রতি কপির ২০ পয়সা লাভের অর্ধেক (১০ পয়সা) ওস্তাদ, সাগরেদকে দিতেন। কবিতা বিক্রির ফাঁকে ফাঁকে ঔষধ বিক্রি করতেন।

তাঁর মনে রাখার মতো দাঁড়াগুলো হলো, আদম-হাওয়া, সোনা (স্বর্ণ) লোহা, কাগজ-কলম, শরিয়ত-মারেফত, নারী-পুরুষ ইত্যকার বিষয়ক পালাগান-কবিগান। ইরামনের সরকারের সাথে পালা হয়েছে দিঘলী বাজার, বেড়ি, তেওয়ারীগঞ্জ, দাশের হাট। তাঁর সহযোগী পয়ারীদের মধ্যে কবি সাখাওয়াতও ছিলেন। ওস্তাদের অনুরোধে, অবসরে নিজেরাও সরকারের ভূমিকায় আসর চালিয়ে যেতেন। তাঁর দেয়া তথ্য মতে লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী অঞ্চলে অধিকাংশ কবিগানের আসর হতো। হারান শীল ও অদুদ সরকারের সাথে। হায়দার আলীও নামকরা কবিয়াল ছিলেন (রায়পুরের)। মুজর মিস্ত্রিরী, মতো সরকার, মুনা সরকার, রজব আলী, লাল সরকার এরাও বড় মাপের কবিয়াল ছিলেন। তার দেয়া ভাষ্য মতে, হারানশীল মাঝে মাঝে আসরের প্রয়োজনে কোথাও বায়না আসলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অদুদ সরকারকে নিতে বলতেন। অদুদ সরকার জেলার বাইরে গিয়েও কবিগান করতেন। রংপর, যশোর, কুমিল্লা, ফরিদপুর এসব জেলায়ও অদুদ সরকার দল-বল নিয়ে পালা করতেন। অদুদ সরকারের সাথে বদু সরকার পালাগান গেয়ে বেড়িয়েছেন তিন বছর।

লোককবি সরকার সাখাওয়াত উল্লাহ (ছাকু সরকার) : তাঁর পিতার নাম আবদুল হাশীম, মাতার নাম কদভানু, বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। তিনি ৮ সন্তানের জনক। তিনি ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুর সদরের পূর্ব দিঘলীর পলবান বাড়ি। তিনি কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তবে খোনকারী, টোটকা চিকিৎসাও করেন তিনি। ক্লায়কেশে জীবন ধারণ করেন। মাসে হাজার খানেকের মতো আয় করেন।

তিনি লোককবি, কবিয়াল, গজলকার, গীতিকার। বারো-তেরো বছর বয়সে সংগীতজীবনে যোগ দেন। তৎকালীন গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাবে সংগীত জীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর গুরু বা ওস্তাদ কেউ ছিল না।

www.pathagar.com

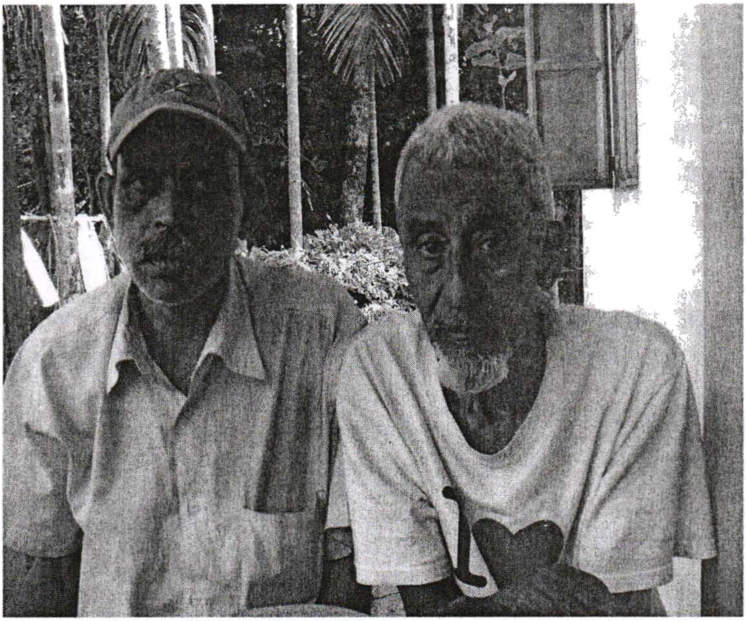

লোককবি সরকার সাখাওয়াত উল্লাহ

তাঁর সহযোগীরা হলেন : আবদুল মান্নান, ফজল করিম, আবুল বাসার, হোসেন আহম্মদ, দুলাল মেম্বার, আবুল কালাম আরো অনেকে যাদের নাম এ মুহূর্তে মনে করতে পারছেন না। (গফুর সরকার, তোফায়েল আহম্মদ, মজুব আলী, নোয়াব আলী) তাঁর দোহার বা পয়ারী। ১২/১৪ বছর শিষ্যদের নিয়ে সংগীত জগত মাতিয়ে রেখেছিলেন।

কবিগান, বিয়ের গজল, পথ কবিতার, লোক সংগীত পরিবেশনে তাঁর দলে কোনো যন্ত্রী ছিল না। বিয়ের গজল গান ও পালাগানে শিষ্যদের কেউ কেউ ঘুঙ্গুর পায়ে অনেক সময় নাচতেন।

কবিগান, বিয়ের গান (গজল) লোক কবিতা (পথ কবিতা) লোক সংগীত। শিল্পী বিভিন্ন আসরে এ ধরনের সংগীত গাইতেন। যাত্রায় অভিনয় করতেন।

কবিগানে তাঁর পালা হয়েছে যে কবিয়ালদের সাথে তাঁরা হলেন, হারানশীল, হায়দর আলী, মুনা সরকার, অদুদ সরকার, মন্নান সরকার, লাকসামের আলাউদ্দিন, জামতলা কুমিল্লার বাদশা, লাকসামের আরব আলী সরকার, ঢাকার বেইজ্জার হোলা আলমাস সরকার ও আরো অনেকের স্যাথে।

বিয়ের আসরে গজল গান করেছেন বৃহত্তর নোয়াখালীর বিভিন্ন জনপদে, এলাকায়। যেমন, খাগুড়িয়া, ছয়ানী, রামগঞ্জ, হাজির পাড়া, চাটখিল, চৌপল্লী, দত্তপাড়া, তোরাবগঞ্জ ইত্যকার স্থানে।

www.pathagar.com

অভিনয় করেছেন যৌবনে যাত্রা পালায়। তাঁর অভিনীত যাত্রাপালার নাম, সিরাজুদ্দৌলা, অরুন শান্তি, আপন দুলাল, ছয়ফল মূলুক বদিউজ্জামান, রূপবান, জামাল জরিনার পালা, সাগর ভাসা, আলোমতি প্রেম কুমার, গুনাই বিবি প্রভৃতি।

এ গীতিকার, সুরকার, লোককবি, কবিয়াল মূলত লোক কবিতা বাজারে বাজারে গেয়ে বেড়াতেন, বিক্রি করতেন ও বিভিন্ন জনসভায় স্ব-রচিত সংগীত পরিবেশন করতেন যা তাঁর প্রধান পরিচয়। এ কবি একজন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক ও বটে। স্বাধীনতা পূর্বকালে জনসভায় গণসংগীত, লোকসংগীত পরিবেশন করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন দেশপ্রেমে। একজন মুক্তিযোদ্ধা কবি। কিন্তু কোনো সনদ তিনি পাননি আক্ষেপ করলেন।

কবি মূলত আসরভিত্তিক গান রচনা করতেন। তাৎক্ষণিক গান বানিয়ে গেয়ে বেড়াতেন এ পল্লী ও ভাবুক কবি। পালাগানতো আসরেই প্রয়োজন মতো তৈরি করে প্রতিপক্ষের উত্তর দিতে হতো। বিয়ের গজল গানেও অনেকটা তাই। পথ কবিতা বাজারে গেয়ে গেয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সে জন্য তাঁর গান অপরাপর কবিয়ালদের মতো মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এগুলো কেউ উদ্ধার বা সংগ্রহের তাগিদ অনুভব করেনি। তাই সেসব পাওয়াও দুষ্কর।

পথ কবিতার (লোককবিতা) সংখ্যা তিনটি

১. বঙ্গবন্ধুর কবিতা (যার পাণ্ডুলিপি কবির কাছে সংরক্ষিত) গেয়ে শোনালেন।

২. হাবু হাড়ারীর কবিতা (পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি)

৩. রোশন আর ইসমাইলের কবিতা (পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি)

যাত্রাপালা

১. শেফালীর কাঁদা (পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাননি)

একটা শ্লেষাত্মক কবিতামালাও রয়েছে আমার সংগ্রহে।

কবি অসংখ্য গানের স্রষ্টা। আসরে, জনসভায় তা গীত হতো। শত শত গান কবি রচনা ও পরিবেশন করেছেন। আসরে আসরে কয়েকশ হবে। তবে, তা সংগৃহীত হয়নি। কবি বর্তমানে অসুস্থ।

গজলকার আবদুল হাসেম হাঁড়িয়া : প্রখ্যাত সরকার আবদুল হাসেম হাঁড়িয়া, পিতার নাম : জানা যায়নি; মাতার নাম : জানা যায়নি; স্ত্রীর নাম : জানা যায়নি; ঠিকানা : তার জন্মস্থান : হাঁড়িয়াগো বাড়ি, সাং হাজিল মিয়ার হাট, চর পাগলা, কমলনগর থানা জেলা : লক্ষ্মীপুর; সন্তান : ৬ ছেলে, ১ মেয়ে। ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে জীবিত; বর্তমান বয়স : আনুমানিক ৮৫-৯০; শিক্ষা : অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। মূলত গানের শিল্পী পালাগান (কবিগান), বিয়ের গজল ও লোকগানের শিল্পী।

লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালীর বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে সরকার গান করে বেড়াতেন। তাঁর পৈতৃক নামানুসারে তাঁর দলের নাম হয় 'হাঁড়িয়ার দল।' সমকালীন দলগুলোর মধ্যে নামকরা দলটি। তিনি ছিলেন দল প্রধান ও সরকার। তাঁর স্ত্রী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার

www.pathagar.com

(নেছার সরকার, ছাকু সরকার) থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তিনি জেলার মান্দারী, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, ভবানীগঞ্জ, চাঁটখীল ও প্রত্যন্ত অঞ্চল দল নিয়ে কবিগান ও বিয়ের গজল গেয়ে বেড়াতেন।

আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। মোটামুটি গান গেয়ে যা পেত তাই দিয়ে কোনোমতে সংসার ব্যয় নির্বাহ করতেন। বর্ষাকাল ব্যতীত সারা বছরই বিয়ের গজল প্রচলিত ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. নোয়াখালী জেলা গেজেটিয়ার ১৯৭৪।
২. লক্ষ্মীপুর জেলা আইনজীবী সমিতি : স্মরণিকা ১৯৯৯।
৩. লক্ষ্মীপুর জেলা যুব কল্যাণ সমিতি, ঢাকা'র, প্রকাশনা : নব দিগন্ত ১৯৮৭।
৪. রফিকুল হায়দার চৌধুরী, লক্ষ্মীপুরের মুক্তিযুদ্ধ, লাল পলাশের মিছিলে ১৯৮৫।
৫. লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতি, ঢাকার স্মরণীকা : তিন-এর লক্ষ্মী ১৯৯৯।
৬. বৃহত্তর নোয়াখালীতে ইসলাম প্রচার (প্রবন্ধ) : মুহাম্মদ আবু তালিব।
৭. ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জেলা লক্ষ্মীপুর : সানাউল্লাহ্ নূরী।
৮. বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিবৃত্ত : ড. এম আবদুল কাদের।
৯. গোলাম রহমান, সম্পাদক, সাপ্তাহিক দামামা, লক্ষ্মীপুর।
১০. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ বার্ষিক : নোঙ্গর ২০০৩।
১১. জেলা তথ্য : লক্ষ্মীপুর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জুলাই, ২০০৫।
১২. ডা. ফ্রান্সিস বুখানন : দক্ষিণ পূর্ব বাংলা সফর, ১৭৯৮।
১৩. বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস : মো. ফখরুল ইসলাম, ১৭৯৮।
১৪. ঐতিহাসিক লক্ষ্মীপুর : নাজিম উদ্দিন মাহমুদ, ১৯৯৬।
১৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, লক্ষ্মীপুর অংশ ২০১১।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা

কিচ্ছা

একদেশে এক রাজা আছিল। রাজার আছিল ওগগা ঘোড়া আর ওগগা গরু। রাজা কোন্ আনঅ যাইতে ঘোড়ার হিডঅ কোরি যাইতো। আর গরুগা দি আল চৈতো। রাজার দিন যায় ভালা, খায় ভালা, আল চয় বিয়ালী আলা। একদিন অইলো কি হঠাৎ তুপানে রাজার গরু ঘর উড়াই লোই চলি গেছে। গরুর চিল্লানির লাই আর ঘুম যান জায় না। কৈল্লো কি রাখাইলা এই রাইত গোরুনি ঘোড়ার ঘরঅ বাঁধি চলি আই নাকঅ তেলদি ঘুমায়। রাইত মোশা-মাছির হোঁদ মারউন্নি না ঘোড়ারও ঘুম নাই, গোরুরঅ ঘুম নাই। গোরুরে ঘোঙ্গরায় তন্দ্রা আইলে, ঘোঁড়া খত খত করে। তখন হঠাৎ ঘোড়ায় গোরুরে কইলো, ইরে ভাই, আঁরঅ ঘুম আইয়ে না তোরও ঘুম আইয়ে না, তুই ওগগা কিচ্ছা ক? গোরুরে কইলো, তুই আগে ক আঁই হরে কৈয়ুম।

তখন ঘোড়ায় শুরু কৈল্লো কিচ্ছার। কয় হুন। আঁই অইছি রাজার ঘোড়া। ঘোড়ার একটা জাত আছে, মর্যাদা আছে, গরু বা বলদের কোনো সমাজে দামও নাই, মর্যাদাও নাই। কইতে কয় বলদ, বলদ কোই একজনে আরেক জনরে গাইল দেয়। গোরু কোই, বলদ কোই হেরাস করে। রাজায়ও তোরে হেরুম দাম দেয় না। হারাদিন রৈদে-বানে তোরে দি আল চয়, আর খের খাবায়। তোর ঘরকান চাছনা ভাঙ্গাচুরা, তুপানে উড়াই লোই গেছে। আর ঘর চা কেরুম মজবুত। আর আর খানাও ভালা। হত্তিদিন আর লাই হিপা ভোরি চনাবুট। আই খাই আরও থাই যায়। আর তোরে দুরপে খের কগাছ হোলি দি থোয় আর খবরও রায় না। আমারে কৈতেও কয় রাজার ঘোড়া। সকাল-বিকাল আমার কাছে দি রাজা ঘুরাপিরা করে। গোরুরে উডি কৈলো হুন, আরে দি হারাদিন মাত্র এক বেলা দুপরে কতকোন আল চয়। আর হিডঅ কেঅ চড়ে না। রাজা তোর হিডঅ কোরি দেশে-দেশে ঘুরে। বান নাই, দিন দুপর নাই, হাঁঝ নাই। রাইত বিরাইত রাজার দরকার অইলেই তোর হিডঅ টক্কাদি উডি যিন্নি ইচ্ছা তেম্নি চলি যায়। ঘোড়া চিন্তা কোরি চাইলো আসলে ঘটনা'ত হাঁচা। তখন গোরুরে কয় তা অইলে অন কি করা। গোরু কইলো, এক কাম কর, কাইল অইতে দুনুগা হুতি হুতি শুধু খাইয়াম। হোতাতোন উটতাম'ন। রাজা দুই চাইর দিন হরে তেক্ত অই নোয়া করি গরু আর ঘোড়া লইবো। আমরা হুতি হুতি খাইয়ুম।

হরের দিন সকালে রাজা কোনাই যাইবো, ঘোড়াতো হোতা–তোন উডে না। রাখাইল্লা আইছে, ওরে গোরুও উডে না। এই রকম কদিন গেলে রাজা মহা ফ্যাসাদে হোড়লো। চিঅন শতাইনা'র ডাকি আনি কৈলো রাজায়, কিরে আর বুদ্ধি সরে না। ঘোড়া আর গোরু যা জারুয়ামি শুরু কৈচ্ছে। উপায় কি? ক্ষেত রৈলো আচৈয়া, আমার যাতায়াতও বন্ধ।

www.pathagar.com

চিঅন শতাইন যার শতানইয়া বুদ্ধি। হিগায় কৈলো রাজা সাব, এক কাজ করেন। ঘোড়া এত চালাক আছিল না। ইগারে চালাক বানাইছে বলদে। কসাইরে খবর দেন। বলদ এমনেও বুড়া অইছে। আলের লাই আরও জোয়ান বলদের দরকার। ঘোড়া ঠিক অই যাইবো বলদের ব্যবস্থা অইলে।

হরের দিন রাজা যাই বুড়া কসাইরে লোই আইলো। কসাইর আতও ধামা দেই বলদ উডি টক্কাদি খাড়াই গেলো। ঘোড়াও মোড়ামুড়ি দি খাড়াই গেলো। ঘোড়া ছুটলো রাজারে হিডঅ লোই আর গরু ছুটল চাষা আর লাঙ্গল জুমাইল লোই।[১]

উপদেশ : একজনেরে কুযুক্তি দিলে, সেই কুযুক্তির ফল নিজেরেও ভোগ কৈত্তে অয়। আর তা ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। গ্রাম্য শালিসদারগণ এ জাতীয় পরামর্শ দিতেন ও শালিসের আগে উপদেশমূলক এ জাতীয় কাহিনী বলে উভয় পক্ষকে স্বাভাবিক ও শান্ত করতেন।[২]

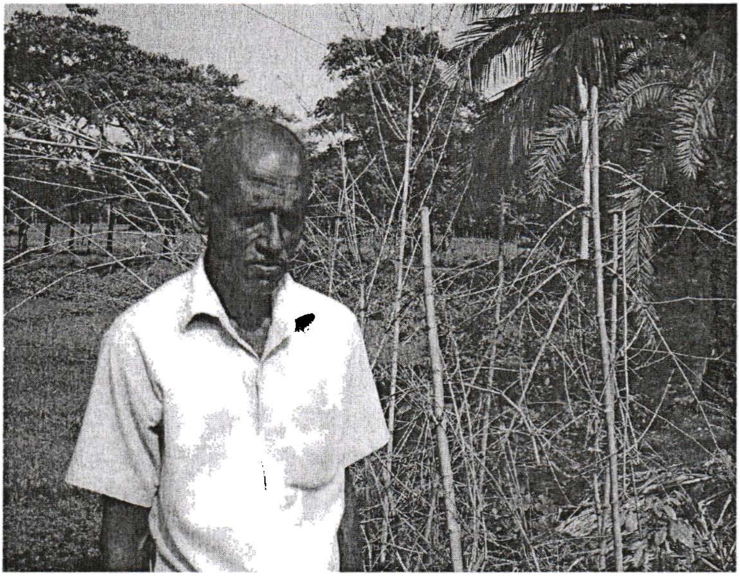

গল্পের কথক মো. সিরাজ মিয়া

লোককাহিনী

কাঙ্গসাই-এর কিচ্ছা : ময়না

বহুকাল পূর্বে বঙ্গোপসাগর উপকূলে সুবর্ণ নগরে এক সওদাগর বাস করতেন। নাম ভোলানাথ। তখনকার মস্ত ঐ নগরে অনেক নামিদামি সওদাগর বাস করত। পালের জাহাজে করে উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, দেশে তারা বাণিজ্য বেসাতি করতেন। ভোলা সওদাগর মারা যাওয়ার সময় বিশাল বিত্ত বৈভবের সাথে তিন ছেলে অরি, কানাই, কাঙ্গসাইকে রেখে যান। তারা মারা যাওয়ার অনেক বছর পর অরি

www.pathagar.com

ও কানাই বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়েন। কাঙ্গসাই একে তো কনিষ্ঠ, তার উপর ভীষণ ভীত প্রকৃতির। যখনি দুভাই সাগর পাড়ি দেন, তখনই ছোট ভাইটিকে জিজ্ঞেস করেন, তার জন্য কি জিনিস আনতে হবে, দেশে ফিরে আসার সময় তাই নিয়ে আসবেন।

এক সময় অরি ও কানাই বিয়ে করে আনেন দুই অপরূপা সুন্দরী। একদিকে মহলে অপরূপ সুন্দরী বউ ও স্বদেশ, অপর দিকে পিতৃপুরুষের বহমান রক্তে উত্তাল সমুদ্র ভেসে বেড়ানোর নেশা আর পেশা, দ্বৈরথ সমরে নেশা আর পেশা জয়ী হয়। দুই ভাই বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়লে দুই বধূ কাঙ্গসাইকে ঘরে রেখে রথের ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ান। অরি ও কানাই আজ অবধি তা ঘুণাক্ষরেও জানে না। জানে না কাঙ্গসাই তাকে একা বাড়িতে রেখে ওরা কোথায় যায় আবার ফিরে আসে।

এক সময় কাঙ্গসা ভাবে তার একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য একটা পাখি পুষবে সে। কিন্তু সে কি জানত সে নিজেই পাখি হয়ে তার দোসর হবে? জানত না বলেই ভাইদের কাছে এমন নির্দয় আবদার করে সে।

একবার অরি ও কানাই সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করে, এ যাত্রায় তোমার জন্য কী আনা চাই?

একটা পোষা ময়না।

জগতে এত মূল্যবান জিনিস, সখের জিনিস থাকতে একটা ময়না কেন, জানতে চায়নি ওরা। ছোট ভাইয়ের আবদার অনেক বড় ও মূল্যবান, আর তা যত তুচ্ছই হোক।

এক চাঁদনি রাতে দুই ভাই বাণিজ্যে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে উত্তাল সমুদ্র বক্ষে। তীরে দাঁড়িয়ে দুই চন্দ্রাবতী ও ছোট ভাই কাঙ্গসা। দুই চন্দ্রাবতীর মনে জানা না গেলেও, কাঙ্গসার চোখে এক পোষা ময়নার ডানা ঝাপটানোর দিবাস্বপ্ন।

রাতে দুজন এক কামরায় শুয়ে শুয়ে রাজ্যির গল্প করে, কাঙ্গসার চোখে ভাসে অরি, কানাইয়ের জাহাজ সাগরের ঢেউ ভেঙে ভেঙে অগ্রসর হয়ে বন্দরে, পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর করে।

অরি, কানাই ঘুরে বেড়ায় সাগর থেকে সাগরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় দেশে ফেরার নাম করে না। এক সময় তাঁদের মনে পড়ে দেশের কথা, ঘরে সুন্দরী বউয়ের কথা, ছোট ভাই কাঙ্গসার কথা। দু ভাই সিদ্ধান্ত নেয় এবার দেশে ফেরার কথা। কাঙ্গসাইর বায়নার কথা বেমালুম ভুলে থাকে দুভাই। নির্ধারিত দিনে জাহাজ ছেড়ে দেয় দেশের উদ্দেশে। কিন্তু একি! জাহাজ চলে না। বহু চেষ্টা তদবির করেও তারা জাহাজ চালাতে পারে না, তা অনড় হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সাধু, সন্ত ও গুণীদের স্মরণাপন্ন হয় তারা। কেউ বলে, জাহাদের মেয়াদ শেষ। কেউ বলে, এ তাদের পাপের ফল। কেউ বলে, জাহাজ পরিতে পেয়েছে। কেউ বলে দেশে তাদের ফিরে যাবার অবকাশ নেই। কেউ বলে দেশে তাদের কেউই জীবিত নেই। নানা মুণির নানা মত। অরণ্যচারী এক গুণিন সন্ন্যাসীর কাছে গেলে তিনি বলেন, আপনারা একটা কিছু মানত করেন আর দেশ থেকে আসার সময় কোনো কিছু মানত করে এসে থাকলে তার বিহিত ব্যবস্থা করেন, তাইলেই বিপদ কেটে যাবে।

www.pathagar.com

অরণ্যচারী সন্ন্যাসীর কথায় তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। কিন্তু কোনো কিছুই মনে আনতে পারছেন না। সন্ধ্যার আগে সন্ন্যাসীর কাছে বিদায় নিয়ে মন খারাপ করে জাহাজে ফিরে আসলেন তারা। রাত্রে দুভাই ছটফট করছেন কিন্তু চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। শেষ রাতে চোখ লেগে এলে দুই ভাই একই স্বপ্ন দেখেন, একটা অপূর্ব সুন্দর ময়না পাখি তাদের মাথার উপর দিয়ে কি সুন্দর ভুনতি করে আর্তস্বরে গান গেয়ে চক্কর দিচ্ছে। সকালে উভয়ে উভয়ের স্বপ্নের কথা বললে তাদের ছোট ভাই কাঙ্গসার কথা মনে পড়ে যায়।

দুই ভাই এবার ময়না পাখির সন্ধ্যানে বের হন। নগরে নগরে ঢেণ্ডারা পিটিয়ে দেন, কারো কাছে পোষা ময়না পাখি থাকলে তা যত দামই হোক তারা কিনবেন।

এদিকে কাঙ্গসাইর মন উচাটন। ভাইয়েরাও অনেক বছর হলো দেশে ফেরার নামগন্ধ নেই। দুই জা ইচ্ছে মতো রথের ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ান। তার দিকে নজর দেয়ার কেউ নেই। একলা বাড়ি পাহারা দেয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। অবশেষে মনে মনে ঠিক করে, একদিন ভাবীদের অনুসরণ করবে সে। কিন্তু কিভাবে? তার তো আর আলাদা রথের ঘোড়া নেই। মনে মনে বুদ্ধি আঁটে কি করে মল্লিকা রাজ্যের রাজকুমারীর স্বয়ম্ভর সভায় তারা যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে তারা সাজগোজ করে রথে ওঠার আগেই কাঙ্গসা চুপিসারে রথের একটা ঘোড়ার পেটের নিচে রাখা থলিয়ায় ঢুকে পড়লেন। দুই জা হাওয়াই ঘোড়া চেপে রওয়ানা হলেন মল্লিকা রাজকন্যার স্বয়ম্ভর সভার উদ্দেশে। আবেগের আতিশয্যে বাড়ির দিকে খেয়াল নেই, না কাঙ্গসাইর দিকে।

ছুটে চলে ঘোড়া সওয়ারিব নির্দেশক্রমে। অকুস্থলে গিয়ে ঘোড়া দুটো আস্তাবলে রেখে তারা স্বয়ম্ভর সভায় অতিথিদের সারিতে ভিড়ে যান। কাঙ্গসাই চুপিসারে ধীরে বের হলে আস্তাবলের পার্শ্ববর্তী বিশাল প্রমোদ উদ্যানের কিছুটা দূরে একটা নারকেল গাছের নিচে গিয়ে বসে তামাশা দেখে। রাজকুমারী স্বর্ণলতা নিদিষ্ট সময়ে মালতী ফুলের মালা নিয়ে তার পাণিপ্রার্থী রাজকুমারের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যান। কিন্তু কোনো পাত্রই তার মনঃপুত হয় না। এদিকে ষোড়শী রাজকুমারী স্বর্ণলতা আজ যদি পাত্র নির্বাচন না করে তাহলে আগামী এক বছর আবার তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও ঘোর কাটে না। আনমনা হয়ে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই নারকেল তলায় একাকী উদাসী এক যুবক তার চোখে পড়ে। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়েই যুবকের গলায় রাজকুমারী মালা পরিয়ে দেন। সিংহাসনে দুন্দুভি বেজে ওঠে, উলুধ্বনিতে সরগরম হয় সমস্ত মহল। পাত্র মিত্রেরা এসে দেখে, রাজকুমারী এক ফকিরা ছেলের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে নতজানু হয়ে আছে। রাজার নির্দেশে পাত্র মিত্ররা এসে পাত্রকে স্নান সেরে আতর গোলাপ সুগন্ধি মেখে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। কাড়া, নাকড়া, নহবত বাজতে থাকে রাজপুরীতে। মৃদু গুঞ্জন ওঠে— রাজকন্যা এক ফকিরা ছেলেকে বিয়ে করছে।

বাসরঘরে কাঙ্গসা স্বর্ণলতাকে বলে, সে এক বণিকের ছেলে। গ্রাম সুবর্ণনগর। নাম কাঙ্গসাই। আর দু ভাই সওদাগর অরি ও কানাই বাণিজ্যের উদ্দেশে সাগর পাড়ি দিয়েছে। সে স্বয়ম্ভরসভার খবর পেয়ে গোপনে এসে পড়েছে। স্ত্রীর কাছে ঠিকানা নিয়ে

www.pathagar.com

সে কিছু সময় প্রার্থনা করে বাসর থেকে চলে আসে ও চুপিচুপি রথের ঘোড়ার পেটের নিচে রাখা সেই থলিয়ায় ঢুকে আত্মগোপন করে থাকে।

দুই জা এসে ঘোড়ায় চেপে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। বাড়িতে এসে উঠানে পোশাক-আশাক পাল্টায়। কিন্তু একি। অপূর্ব সুগন্ধি গা থেকে যায় না কেন? দুজনই একে একে সাত বার স্নান করে যাতে কাঙ্গসা কোনো কিছু আঁচ করতে না পারে।

হায়রে মূর্খ কাঙাল। বিধি বাম হলে কোনো কৌশলই আর কাজ করে না। ঘরে ঢুকে দেখে তীব্র, উৎকট গন্ধে ঘর গন্ধময়—আর এ গন্ধ খাট থেকে বেরিয়ে পড়ে। বুঝতে বাকি রইল না যে, কাঙ্গসা যে কোনো কৌশলে অকুস্থলে গিয়েছে এবং যে ফকিরা ছেলের গলায় রাজকুমারী মালা দিয়েছে। ও যাকে বিয়ে করেছে সে কাঙ্গসা। সমস্ত সভায় অত লোককে ঠেলে তারা পাত্রকে ভালো করে দেখতে পারেনি। দূর থেকে যা দেখেছে তাতে হুবহু মিলে যায়।

আজ আর কথা না বাড়িয়ে দুই জা শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে থাকে পরবর্তী করণীয়। পরদিন তারা বাড়ির কাছে কাল্লার মার কাছে ধর্না দেয় এর একটা বিহিত করতে। যত টাকা লাগে তাকে তারা দেবে। এমনকি কাঙ্গসাকে বিষপানে হত্যা করতে হলে তারা পিছপা হবে না। অরি ও কানাই বাড়ি ফিরে আসলে কি থেকে কি হয়ে যায়। কাল্লার মা ইঁদুরের ঔষধ মিশিয়ে কিছু চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠা বানিয়ে কাঙ্গসাইকে খাওয়াতে বললেন। কিন্তু তাতে কাজ হলো না। কাঙ্গসাই না মরে পাগলাটে হয়ে পড়ল। বিড় বিড় করে চেয়ে থাকে, আর বক বক করে। এতে বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল দু'জনার।

আবার কাল্লার মার সাথে পরামর্শ করে দুই জা গেল পাশের ধোপার বাড়িতে। ধোপাটিও খুব বড় গুণিন। তাকে পঞ্চকড়ি দিয়ে বশীভূত করে নিয়ে আসে বাড়িতে। ধোপার ঝি, কাঙ্গসাই-এর ঘুমন্ত অবস্থায় শিথানে বসে তার মাথার উকুন বাছে। এরই এক ফাঁকে ছোট বউকে বলে একটা কাঁথার সুতা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে দিতে। মনে মনে মন্ত্র পড়ে যায় ও অনুষ্ঠানাদি করে যায়। ছোট বউ তাড়াতাড়ি কাঙ্গসাইর ব্যবহৃত কাঁথার সুতা ছিঁড়ে এনে ধোপার ঝির হাতে দেয়। ধোপার ঝি মন্ত্রপুত সুতায় কাঙ্গসার মাথার চুলে বেঁধে সাত ফুঁ দিতেই কাঙ্গসা ময়না পাখিতে রূপান্তরিত হয়। ধোপার ঝি ঝটপট উঠানে গিয়ে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আশ্বস্ত হয়। বুকে থুথু দিয়ে দুই জা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ধোপার ঝিকে পর্যাপ্ত উপহার দিয়ে তুষ্ট করে বিদায় দেয়।

দুই জা এখন বাড়িতে রসের কুমারদের এনে মৌজে বিভোর থাকে। ধোপার ঝি ও কাল্লার মার পরামর্শক্রমে বিড়াল একটা মেরে রাতের আঁধারে কবর খুঁড়ে কবরের আকৃতি দেয় ও কাঙ্গসার মৃত্যুর খবর প্রচার করে। ময়না পাখিটা মনের দুঃখে উড়তে উড়তে বনবাদাড় মাঠঘাট ছাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের একেবারে উপকূলে গিয়ে একটা কলাবাগানে বসে। একটা পাকা কলার ছড়ার উপর বসে দু-তিনটা পাকা কলা খেয়ে খিদে মিটায়। বাগানের পার্শ্ববর্তী নতুন বাড়ির গৃহস্থ কলার মালিক এসে দেখে, একটা অপূর্ব ময়না পাখি তার কলাবাগানের একটা কলা গাছের ডগায় বসে ভুনতি গাচ্ছে।

www.pathagar.com

অরি, কানাই, কাঙ্গসাই
এক বাপের তিন ব্যাটা,
দুই ভাই গেল বাণিজ্য করিত হে।
বাড়ির কাছের কাল্লার মা
বিষ খাবাইল মরলাম না
পাশের বাড়ির ধোপার ঝি
খ্যাতার হুতা মাতায় বাঁধি
বানাইলো বনের ময়না পাখিরে।

গান শুনে গৃহস্থের ময়না পাখির প্রতি লোভ হয়। সে পাখিটাকে যেই মাত্র ধরার চেষ্টা করে ওটা আকাশে উড়াল দেয়। পিছু নেয় গৃহস্থ লোকটা। পাখিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিয়ে যায় বিরান প্রান্তরে। এক পর্যায়ে পাখির ডানা অবশ হয়ে পড়লে ওটা পড়ে যায়। পরম আদরে পাখিটাকে পুষতে থাকে গৃহস্থ। লোকটা বিরক্ত। ওর গানের মর্ম কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। একদিন ভিনদেশি এক বণিকের কানে কথাটা গেলে সে গৃহস্থ বাড়িতে যায়। পাখির গানে মুগ্ধ হয়ে বণিক অনেক দাম দিয়ে পাখিটা কিনে নেয়। লোহার খাঁচায় বন্দি ময়না অনেক দুঃখে গান গেয়ে যায় যতক্ষণ চোখ বুঁঝে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত। বণিক নিজ দেশে যাওয়ার সময় জাহাজে করে পাখিটা নিয়ে যেতে ভোলে না। সওদাগর স্ত্রী একদিন কৌতূহলবশত পাখিটা খাঁচা থেকে বের করে এনে পরখ করে ওটা উড়তে পারে কিনা। সুযোগ পেয়েই ময়না পাখি পাখা মেলে আকাশ নীলে পাড়ি জমায়। বহু দূরে উড়ে গিয়ে বসে এক গাছের ডালে। সেখান থেকে আহারের সন্ধানে বের হয়। কোথাও কিছু না পেয়ে একটা বাড়ির জামরুল গাছে গিয়ে বসে। গাছ ভর্তি পাকা জামরুল রসে টইটম্বর। ঠুকরে দু তিনটি জামরুল খাওয়ার পর যখনি উড়াল দেয় একটা লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করে, অমনি অনুভব করে তার পা দুটো একটা কিছুতে আটকা পড়েছে। ওদিকে লোকটা পাখির কাছাকাছি এসে পড়েছে গাছ বেয়ে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ময়না পা ছোটাতে পারে না। লোকটা এসে ময়নাকে ধরে ফেলে পা জাল থেকে ছুটিয়ে নিল। ময়না শুরু করল ভুনতি। লোকটা পাখির গান শুনে হতবাক। পাখিকে ঘরে নিয়ে দুপাখা বেঁধে তার মুদি দোকানে গিয়ে ফের একটা লোহার খাঁচা নিয়ে এল। এবার পাখির পাখা মুক্ত হল বটে, পুরো পাখিটা লোহার কারাগারে বন্দি হয়ে গেল। আশপাশের লোকজন কৌতূহলী হয়ে এসে পাখিটাকে দেখে ও তার গান শোনে।

মুদির দোকানি তার দোকানের এক কোনে খাঁচায় বন্দি পাখিটা ঝুলিয়ে রাখে। পাখিটার জন্য তার গর্বের শেষ নেই। ওটা মানুষের মতো গান গায়, ভনিতা গায়। তার গান বোঝা যায় বটে, গানের অর্থ হয় না কারো।

অরি আর কানাই সেই অজানা দেশেই তখন অবস্থান করছিল। লোক মুখে সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে পা গলের মতো। যত মূল্যই হোক না কেন, পাখিটা কাঙ্গসাইর জন্য পেতেই হবে তাদের।

www.pathagar.com

এক পড়ন্ত বিকেলে দুই ভাই মনোহর নগরে এসে সেই মুদির দোকানে উপস্থিত। অরি ও কানাইকে দেখেই ময়না গেয়ে উঠে—

অরি, কানাই কাঙ্গসাই
এক বাপের তিন ব্যাটা
দুই ভাই গেল বাণিজ্য করিতে হে ।
বাড়ির কাছের কাল্লার মা
বিষ খাবাইল মরলাম না,
পাশের বাড়ির ধোপার ঝি
খ্যাতার সুতো মাথায় বাঁধি
বানাইলো জঙ্গলার ময়না পাখিরে।

পাখির গান শোনা মাত্র দুই ভাইয়ের চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। ঢুকরে কেঁদে ওঠে তারা। উপস্থিত লোকজনও তাদের দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। একটু স্থির হয়ে বড় ভাই অরি উপস্থিত লোকজনকে বলে, ভাইজান অরি, কানাই ও কাঙ্গসাই আমরা তিন ভাই। ছোট ভাই কাঙ্গসাকে রেখে আমরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে জাহাজ নিয়ে দেশে দেশে ঘুরি ও সওদা করি। বাড়ি থেকে আসার সময় ছোট ভাই কাঙ্গসা আবদার করে বসে তার জন্য একটা ময়না পাখি নিয়ে যেতে। এই ময়না পাখিটা আপনি আমাদের নিকট বিক্রি করেন। আপনি যত দাম চান আমরা তা দেব। মুদি দোকানি কিছুতেই রাজি হয় না। উপস্থিত লোকজনের অনুরোধে অবশেষে হাজার টাকায় বিক্রি করতে রাজি হয় পাখিটা। কাঙ্গসাইয়ের জন্য ময়না নিয়ে তারা দেশের উদ্দেশ্যে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেয়। এক জোছনা রাতে জাহাজে এসে সুবর্ণ নগরের পোতাশ্রয়ে ভিড়ে। কাঙ্গসাইয়ের ময়না নিয়ে রাত নিশীতে দুই ভাই বাড়ি পৌঁছায়। লোহার খাঁচায় বন্দি পাখিটা ঘুমিয়ে গেছে ততক্ষণে। অরি ও কানাই খাঁচাটাকে ঘরের বাইরে চালের সাথে টাঙ্গিয়ে রেখে যার যার ঘরে ঢুকে যায়। সুন্দরী স্ত্রীদের সাথে দীর্ঘদিন পর রঙ্গরস করতে লাগল। ছোট ভাই কাঙ্গাসার কথা মনে পড়ার কথা নয়।

যে কাঙ্গসা ময়না পোষার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, আজ সে নিজেই পোষা ময়না। বিধির কি বিধান!

রাত পোহালে দুই জা নিজ নিজ স্বামীর সাথে নাস্তা পানির পর সতর্কে কথা পাড়ে। কয়েক মাস পর কাঙ্গসাই বিচ্ছুর কামড়ে মারা যায়। কেঁদে কেঁদে দুই জা কাঙ্গাসাই রূপ বিড়ালের কবরস্থানে দুই ভাইকে নিয়ে গিয়ে কবর দেখায়। শোকে অরি ও কানাই পাথর হয়ে যায়। ঢুকরে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে তারা। কাঙ্গসাইয়ের ময়না দিয়ে কি হবে এখন? অদৃষ্টের উপরে তো কারুর হাত নেই। দুই ভাই এখন কাঙ্গসাইয়ের কথা মনে হলে ময়নার গান শোনে ও নিরবে কাঁদে।

ওদিকে রাজকন্যা রাজপুরীতে থেকেও সে প্রতিনিয়ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। আত্মীয়স্বজন সবার মুখেই তিরস্কার ও কটূক্তি তার জীবন বিষিয়ে তোলে। একে কাটা ঘা, তার উপর নুনের ছিটা। বেচারি বাসর ঘরেই স্বামী পরিত্যক্তা। স্বজনরা বলে, অমন সুপুরুষ রাজপুত্রদের কাউকে পছন্দ না করে, কোত্থেকে ভেসে আসা একটা নামপরিচয়হীন ফকিরা ছেলেকে বিয়ে করার খেসারত তাকে সারা জীবন দিতে হবে।

www.pathagar.com

সাহসের উপর ভর করে একদিন মাতা হিরন্ময়ী দেবীকে মনের কথা খুলে বলে। পিতৃদেব রাজা প্রিয়াংসুদেবকে মা যেন বুঝিয়ে বলেন যে, স্বর্ণলতা তার স্বামীর ঠিকানা জানেন। সে স্বামীর দেশে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করবে।

রাজা কি আর করবেন, পাত্রমিত্রদের সাথে পরামর্শ করে স্বর্ণলতাকে তার স্বামীর দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

পাত্রমিত্রদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা রাজজ্যোতিষী ডেকে শুভ দিনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী মাঘী পূর্ণিমার শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ভাসান দেয়ার ব্যবস্থা করেন। নিদিষ্ট দিনে বাবা ও মাকে প্রণাম করে নিরুদ্দেশ স্বামীর উদ্দেশ্যে স্বর্ণলতা রওয়ানা হলেন। অনুকূল বাতাসে পালের জাহাজ তর তর করে এগিয়ে চলে, তারও আগে চলে স্বর্ণলতার মন।

মাসাধিক কাল সাগরের বুকে ভেসে ভেসে অবশেষে জাহাজ এসে পৌঁছায় বঙ্গদেশের সুবর্ণনগরে। লোকজনদের কাছে জিজ্ঞেস করে স্বর্ণলতা অরি, কানাই কাঙ্গসাইয়ের বাড়িতে লশকরসহকারে উপস্থিত হয়। মনজিলে মকসুদে পৌঁছেই তার মাথায় বজ্রপাত পড়ে। যার উদ্দেশ্যে অজানায়, অচেনায়, অনিশ্চিত পাড়ি দিয়েছেন, তার ঠাঁই ঠিকই পাওয়া গেল, কিন্তু যার জন্য আসা, সে নিরাশার ছবি এঁকে গায়েব হয়ে আছে। স্বর্ণলতার চোখের জল বুঝি মুছে দেবারও কোনো রুমাল নেই।[৩]

লোককথা

১.

নতুন বউ ও শাশুড়ির মধ্যে কথা হচ্ছে।

বউ : আম্মা, আমনেগো দেশে ক'মাসে অয়?

শাশুড়ি : কেন? ১০ মাসে।

বউ : আমার বাপের দেশে রেওয়াজ ছ'মাসে। তাঅইলে ইগা (গর্ভের সন্তান) আর বাপের দেশের রেওয়াজে ছ'মাসে ওক। হরের গুণ আমনেগো দেশের রেওয়াজে অইবো।

এই নতুন বউ তার আগের প্রেমিকের দ্বারা গর্ভবতী হয়, গর্ভের বয়স ছয় মাস।

২.

এক মহিলা তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে গর্ভবতী হলে, গ্রামের মাতবররা শালিস বসায়। তারা জিজ্ঞাসা করে এ সন্তান কার? জবাবে মহিলা চালাকির আশ্রয় নেয়। বলে, হুজুর, অনেক হৈত গোসল কোচ্ছি (করছি), কোন হৈরের হানিতে সর্দি লইছে, আঁই কৈতাম হাইত্তাম ন।

শব্দার্থ : হৈর-পুকুর।

শ্লোকনির্ভর কিচ্ছা কাহিনী

হেনা ঘাঁড়া বাড়ি আমার গোবিন্দ্র তার নাম

সুকে থাকতে ভুতে হোঁদায় কৈয়া গেছে রাম।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : গোপ্পিরা গফ বা খাটানো গল্প তৈরি করে সাধারণ মানুষদের রসের খোরাক জোটাত। এই গপ্পিদের কদর ছিল সব ধরনের মানুষের কাছে। এখনো দু-একজন হাতেগোনা গোপ্পি পাওয়া। এক সময়ে অবসরে, কাজের ফাঁকে, এ গফ করা হতো। এ গপ্পীদের কম-বেশ সব গ্রাম বা জনপদে পাওয়া যেত। এখন আর এ সংস্কৃতি নেই। এদের কাছে তাবৎ জগৎ, জীবনের ধর্ম, দর্শন, সমাজ, নমাজ, বিভিন্ন শ্রমজীবী, পেশাজীবী, প্রেম-বিরহ, পরকীয়া, স্বর্গ-নরকের, সৃষ্টি ও স্রষ্টার জগৎ রহস্য, তিরস্কার, স্তব-স্তুতি সব কিছুর লোকতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, জিজ্ঞাসা, সাহিত্য রহস্যময়তা এদের কথায়, গল্পে, উপস্থাপনে বিধৃত হতো।

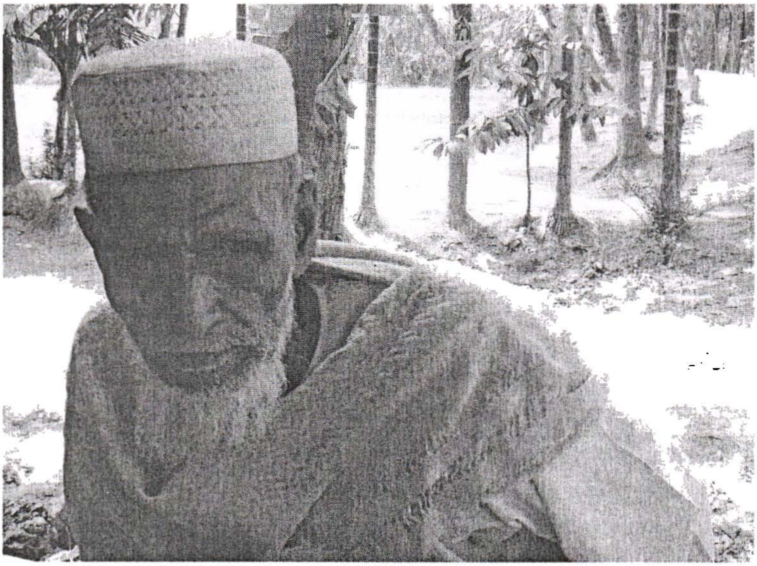

গপ্পি মনু মাঝির ভাই জকু পাটওয়ারী

এরকম একজন গোপ্পি মনু মাঝির ভাই। বয়স আশির কাছাকাছি। তার কাছ থেকে পাওয়া গল্পটি এখানে তুলে দেওয়া হলো।

গল্প : এক ঠাউরিয়ার হোলা। বাড়ি নোয়াখালী/বেগমগঞ্জ হেনাঘাডা। যৈবন বয়সে কুষ্টিয়া চলি গেছে বাড়িত তোন বার অই। হিয়ানো যাই এক হিন্দু বাড়ি উঠছে। হিন্দুরা তারে সোন্দর মোন্দর দেই তার কাছে মাইয়া বিয়ে দিছে। এখন হোলা ত কাম কাইজ কিছু জানে না। হেই দেশঅ সবাই কর্মীক মানুষ, জামাই লোই তারা বিপদে আছে। মাইয়া বিয়া দিঅ ঠেকছে। হিন্দুগ দুই বিয়া অয় না। এই দিগে হোলারে আরাই ঠাউরিয়া আর হোলার মা হাগল অই গেছে। মা-গার কড়কাইঞ্জে ঠাউরিয়া হৈতা গলাত দি বার অই গেছে। বাইর কাছে মাডিয়াল এগোতোন খবর হাইছে হোলা কুষ্টিয়া। মাডিয়াল গো তোন ঠিকানা লই ঠাউরিয়া চলি গেছে কুষ্টিয়া। হৈতা গলাতদি ঠাউরিয়া গণকা হাইজ্জে। খোঁজ খবর লোই হোলার হোর বাড়িতে যাই ধরা দিছে গণকা

www.pathagar.com

হিসেবে। হোর বাড়িয়ারা গণকার কাছে জাইনতো চাইছে হোলার রাশি ও অবস্থা। ঐ সময় ঠাউরিয়ার হোলা দূরে কোনআনে গেছিল। তঅন ঠাউরিয়ার বচন ধরে ও গণে।

হেনা ...রাম।

হিন্দুদের বলে যায় হেতাগো জামাই আইলে যেন এ শ্লোক হুনায়।

কিছুদিন হর হোলা আইলে গণকার বচন হুনি চিন্তা কোরি দেয় তার বচনায়। হোলা- গোবিন্দ্র, বাড়ি হেনাঘাডা, পিতার নাম রাম। ইয়ার হরে হোলা গণকা কোন দিগে গেছে খোঁজ-খবর লোই যাই বাপের লগে দেয়া করে। হোলায় বাপেরে ধোরি কাঁদে, বাপে হোলারে ধোরি কাঁদে। হোলায় বাপেরে বুঝাই হুনাই হোর বাড়িত লোই যায় ও নিজের পরিচয় দেয়। হোর বাড়িয়ারাত মহাখুশি। তারা অইলো শূদ্র আর কোনাই ঠাউর। ঠাউরিয়ার আদর-যত্নের শেষ নাই। বাপে-হুতে বো লোই চলি আইছে বাড়িত। হোলার বউ যেন আতঅ আকাশ হাইছে।

শব্দার্থ : হোলা : পুত্র, হোর-শ্বশুর, আইলে-আসলে।

খ. কিংবদন্তি

কথিত জিনের মসজিদ

মসজিদটি মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব ১৮৮৮ সালে দিল্লি জামে মসজিদের অনুকরণে স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি পুরো কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিন ছেলে মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা সালামত উল্যা সাহেব বাকি কাজ শেষ করেছেন। তবু আর্থিক অনটনের কারণে পুরোটা শেষ করতে পারেননি।

www.pathagar.com

তবে একটা গুজব রটেছে, এটা জিনের মসজিদ। গুজব রটার কারণ এলাকার লোক দিনে নিজের কাজ শেষ করে রাতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করত। অন্য লোকেরা দেখত আজ এক রকম কাল অন্য রকম পরিবর্তন। তাই গুজব ছড়িয়েছে জিনেরা করে গেছে। ইদানীং রং করা হয়েছে। কিছু লোক মন্তব্য করে জিনেরা কাত করে ধরেছে মসজিদটি তারপর রং করেছে।[৪]

কেরামতি পুকুর

আমাদের জানামতে পির সাহেব হুজুররা এখানে যখন আসছেন, পিরবাড়ির পাশেও তাঁর কিছু কেরামতি আছে। একটা দিঘি আছে। দিঘিটার পুব পাশে এসে আস্তানা গেড়েছে। এখানে পুকুর ছিল না ওজু করার জন্য। তাঁরা এসে হাত দিতে পুকুর হয়ে গেছে। দিঘিটাও তেমনি হয়েছে। আরেকটা আছে এখান থেকে ২ কি.মি. উত্তরে। হাজির পাড়া থেকে পশ্চিমে একটা বিল আছে। আগে এখানে এসে উনারা আস্তানা গাড়ত। বাগেরকান্দি সোনাপুরের দিঘি আছে, এটার নাম কোদাল ধোয়া দিঘি। কোদাল ধুতে ধুতে দিঘি হয়েছে।[৫]

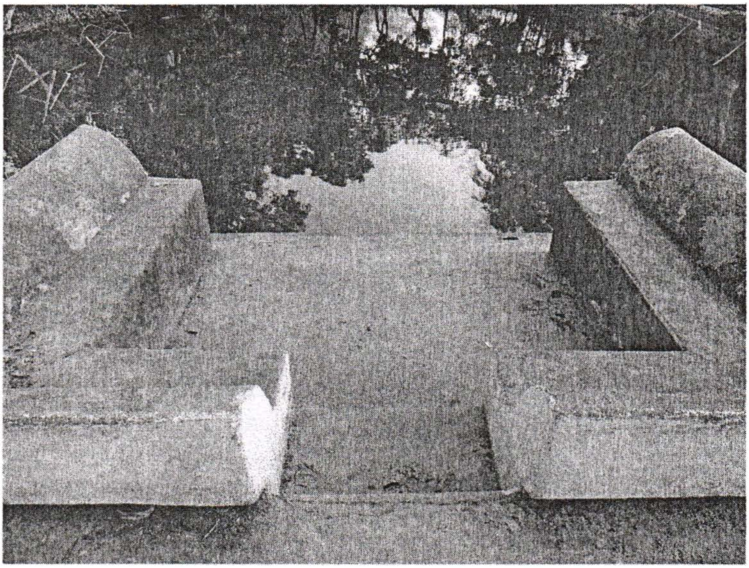

কেরামতি পুকুরে শান বাঁধানো ঘাট

খোয়াসাগর দিঘি : লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দালাল বাজার এলাকায় লক্ষ্মীপুর-রায়পুর সড়কের পূর্ব পাশে প্রায় ২৫ একর জমি জুড়ে বিশাল আয়তনের যে দিঘিটি অবস্থিত তার নাম 'খোয়া সাগর' দিঘি। খোয়া মানে কুয়াশা। দিঘিটি আয়তনে এতই দীর্ঘ যে, এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাকালে কুয়াশাময় মনে হয় বলে এর নামকরণ করা হয় 'খোয়া সাগর' । আনুমানিক ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আশপাশের এলাকা মাটি ভরাট এবং মানুষের ব্যবহারিক পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনে দালাল বাজারের জমিদার ব্রজবল্লভ রায়

www.pathagar.com

দিঘিটি খনন করান। দিঘিটি নিয়ে অসংখ্য কল্পকথার গল্প জড়িয়ে আছে। তার মধ্যে আদিকালে কোনো এক নববধূ পাল্কি ও গরুগাড়ির বহর নিয়ে দিঘির পাড় দিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় বরযাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে দিঘির পানি পান করে যাত্রাবিরতি করে। নববধূটিও দিঘির সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে হাঁটুজল পানিতে নেমে পানি পান করার জন্য অঞ্জলি ভরে পানি নেয়। অমনি বিশাল দিঘিটিও যেন চোখ জলসানো রূপসী নববধূটির রূপ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই তলিয়ে যাওয়া বধূটির আজও কোন সন্ধান মেলেনি। সেই থেকে ঐ স্থানটিতে গভীর গর্ত হয়ে আছে। প্রচণ্ড খরায় সারা দিঘি শুকিয়ে গেলেও ঐ স্থানটি কখনও শুকায় না। বর্তমানে এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। দিঘির পশ্চিম পাড়ে সারিবদ্ধ বেলগাছ। কথিত আছে, ঐ বেল গাছ তলায় কেউ মনোবাসনা নিয়ে গেলে তা পূর্ণ হতো। বর্তমানে সারিবদ্ধ সব বেলগাছ না থাকলেও বেশ কিছু গাছের নিদর্শন এখনও রয়েছে। দিঘির পশ্চিম-দক্ষিণ পাড়ে জমিদার ব্রজবল্লভ রায়কে সমাহিত করা হয়। তার স্মৃতিস্মরণে বিশাল আকৃতির মঠ নির্মিত হয়, যার স্মৃতিচিহ্ন এখনও রয়েছে।

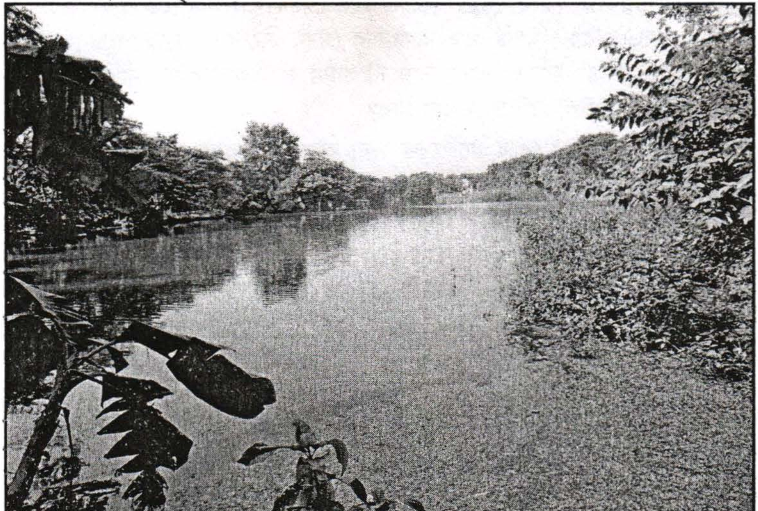

দুই সতিনের (হতিনের) দিঘির একাংশ

দুই হতিনের (সতিনের) দিঘি

কথিত আছে যে, দুই হতিনে মিলি এই দিঘি কাইটছে। এই দিঘিতে স্বর্ণের চেইন, স্বর্ণের নৌকা উঠত, স্বর্ণের থালা-বাসন উঠত বিয়ে-সাদির সময়। এক বাঁদী গোপনে একটি বাটি রেখে দিলে বাকিগুলো নামে না। ঐ বাটি এনে দিলে থালাবাটি ওঠা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এক হতিন একরাতে কাটাইছে আর অন্য হতিন হরের একটা রাইত কাটছে। উদুমের উপর কি গরু ছাড়ি দি ঘাস খাওয়াই মানুষ হাটি যাইত। উদুমের উপর চাপিলা মাছ টক্কি উঠত। হোইল, গজার উদুমের উপর টক্কি উঠত।[৬]

www.pathagar.com

কিংবদন্তি : স্বর্ণের নৌকার খোঁজে এক মহিলা মানুষ ডুব দিয়ে আর উঠতে পারেনি। কোমরের রশি টেনে গ্রামবাসী তাকে তুলতে গেলে কোমর ছিঁড়ে আসে।

সাধু মাঝির দিঘি

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ৩ নম্বর দালাল বাজার ইউনিয়নের অন্তর্গত খিদিরপুর ও মহাদেবপুর গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় ও রায়পুর-লক্ষ্মীপুর মহাসড়কের সড়কের পশ্চিম পাশে প্রায় ২২ একর জমি জুড়ে বিশাল আয়তনের যে দিঘিটি অবস্থিত। তার নাম 'সাধু মাঝির দিঘি'। যারা সৎ ও পুণ্যবান তাকেই সাধু বলা হয়ে থাকে। জনশ্রুতি আছে যে, একদা এই মাঝি নতুন নাইয়র নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছিল। তখনকার বর্ষার দিনে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল নৌকা। চারদিকে পানি থৈ থৈ করে। রাস্তাঘাট সবই ডুবে যায়। মাঝি যখন তার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় তখন নববধূর সাথে তার বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া মহামূল্যবান জিনিসপত্র মনের ভুলে রেখে যায়। মাঝি নৌকা পরিষ্কার করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখে লাল কাপড়ে বাঁধা অনেকগুলো স্বর্ণালংকার পড়ে আছে। মাঝি এত অলংকার দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে নৌকা বেঁধে বসে বসে চিন্তা করতে থাকে, নাম না জানা ও ঠিকানাবিহীন মালিককে কীভাবে এই অলংকারের পোটলা পৌঁছে দেওয়া যায়?

অবশেষে সে নৌকা বেঁধে মালিকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। হঠাৎ সে দূরে দেখতে পায় ৩ থেকে ৪ জন লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। ঐ তিনজন লোকের মধ্যে ছিল নৌকায় আসা নাইওয়রির বাপ। তিনি এসেই মাঝিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে বাছা তুমি এই মুহূর্তে আমার কাছে যাহা চাইবে তাহাই পাইবে। মাঝি বিষয়টি বুঝতে পেরে বলল, দেখুন এই জিনিস আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে আল্লাহ মেহেরবান আমি প্রকৃত মালিকের হাতে এই জিনিস পৌঁছে দিতে পেরে আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শোকরিয়া আদায় করছি। কিন্তু এতে নাইওয়রির বাপ কিছুতেই মাঝিকে ছাড়বে না। বলে, তোমাকে কোনো একটা কিছু নিতে হবেই। মাঝির সততার মর্যাদা দিতে গিয়ে অবশেষে তাকে ২২ একরের একটি দিঘি কেটে দেওয়া হলো। সেই থেকেই সাধু মাঝির নামানুসারে দিঘিটির নামকরণ হয় 'সাধু মাঝির দিঘি'। আজও কালের স্বাক্ষী হয়ে উক্ত দিঘিটি বিদ্যমান রয়েছে।

ঐদ্বারা দিঘি

বহু শতাব্দির প্রাচীন দিঘি। দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত অবস্থার কারণে দিঘির বুকে উদুম জন্মেছিল। লোকজন সে উদুমের উপর দিয়ে হেঁটে (নিচে পানি) এপার এপার যেত। ৫৫ থেকে ৬০ বছর পূর্বে দিঘিটি ইজারা নেয় শ্রীবদু মন্দার, তৎপর রাখাল দত্ত। পরবর্তীতে হস্তান্তর হয়। বদু বাবু সংস্কার করার পর জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, দিঘির দক্ষিণ পাড়ে মাটির নিচে ইটের সিঁড়ি আছে। ঐ ইট নিয়ে একটি দ্বিনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার জন্য। উৎসুক জনতা মাটি খুঁড়ে ইটের স্তূপ দেখতে পায়। তারা স্থানটি খনন করে

www.pathagar.com

ইট সংগ্রহ করে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। তথ্যদাতা নিজেও ঐ ইট মাদ্রাসার জন্য সংগ্রহ ও বহন করেছেন বলে জানান। তিনি তখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। আজ ঐ মাদ্রাসা সুপ্রতিষ্ঠিত। হাজারের উপর ছাত্র-ছাত্রী আছে মাদ্রাসার নাম ফতেহপুর জামেউল উলুম ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা । কথিত আছে যে, এ দিঘিতে নাকি গভীর রাতে বাতি জ্বলত। সাদা কাপড় পরে কে বা কারা হাঁটত।[৭]

হরিশ্চর দরগাহ

স্থান : হরিশ্চর। গ্রাম ও ডাকঘর : দরগাহ শরীফ, মাজার : পির হাছান শরীফ (রা.) দরগাহ। জায়গার প্রাচীন নাম : হরিতলী। বর্তমান নাম : রাধা খাল। এ অঞ্চল ছিল নদীমাতৃক। কথিত আছে, হযরত শাহজালাল (রা.) তাঁর বহর নিয়ে এ অঞ্চল দিয়ে নদী পথে এসেছিলেন। তাঁরই শিষ্য ছিলেন পির হাছান শরীফ। এ অঞ্চলের তৎকালীন জমিদার ছিলেন–প্রসন্নকুমার গুহ।

চর জাগার কাহিনী : নদীতে পির হাছান শরীফ তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করলে নদী আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। আর বুকে চর জাগতে থাকে। হরি নামে জনৈক মাঝি পির কেবলাকে সম্মান ও স্থান দেয়ার কারণে পির কেবলা চরের নাম দেন হরির চর। জনশ্রুতি রয়েছে, এ অঞ্চল ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। মুসলমান তেমন ছিল না। যে স্থানে এখন মাজার অবস্থিত সেখানে হুজুর এসে নামাজ ও কোরান তেলাওয়াত করতেন।

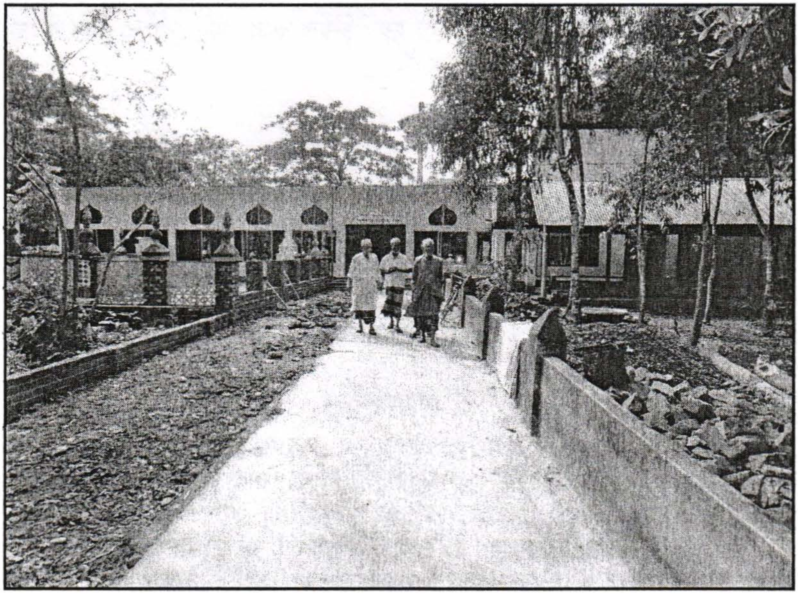

হরিশ্চর দরগাহ

www.pathagar.com

এসময় কিছু সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে নামাজ পড়তে ও কোরান তেলাওয়াতে বাধা প্রদান করে। জনশ্রুতি রয়েছে ঐ রাতে হিন্দুদের গরু ছাগল মারা যায়। এর দু-তিন দিন পর হঠাৎ হুজুরের গায়েবি কবর উত্থিত হয়। উক্ত কবরের পাশে আরো জোড় দুটো কবর (২+৪) গায়েবিভাবে উত্থিত হয়। উক্ত কবর উনার মা, বাবা, স্ত্রী সন্তান বা শিষ্যদের বলে অনুমান করা হয়। গায়েবি কবরের উত্থানের পর এ অঞ্চলের হিন্দুরা অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। লোকশ্রুতি রয়েছে, উনার মুখ নিংসৃত পানের পিক থেকে এ অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে সুপারী গাছের। পায়ের খড়ম থেকে সৃষ্টি হয়েছে কাঁঠাল গাছের। হাতের আশা থেকে সৃষ্টি হয়েছে লাঠি গাছের।

মাছধরা : মাজারে গিয়ে হুজুরের অনুমতি নিয়ে জেলেরা মাছ ধরতে যায়। বিপত্তি ঘটে, একবার মাছ ধরে, দ্বিতীয়বার হুজুরের অনুমতি না নিয়ে জাল ফেলে মাছ ধরতে গিয়ে দেখা যায় সব কচ্ছপ। শেষে তারা মাজারে গিয়ে মাফ চেয়ে নিস্তার পায়।

দক্ষিণে দেয়াল : মাজারের দক্ষিণ দিয়ে চলাচলের রাস্তা। এ রাস্তা দিয়ে বে-পর্দায় গেলে মহিলাদের ক্ষতি হতো। তাই মাঝার কমিটি মাঝারের দক্ষিণ পাশে দেয়াল তুলে দিয়েছে।

দিঘি : এখানে একটা দিঘি রয়েছে ছোট আকারের। ছোট একটি কুয়ায় হুজুর ওজু করতেন। কালক্রমে তা বিস্তৃত হয়ে দিঘির রূপ নিয়েছে। এ মাজারে 'মানত' হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমান সমাদৃত। মানত দেয়া হয়। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য অর্থ, শিরনি মানত দেয়া হয়। হিন্দুরাও মানত দেয়। দিঘির পানিতে পুণ্য লাভের আশায় গোছল করা হয়। নিয়ত করে পানি নেয় ও পান করায়। মাহফিল হয় বছরে ১দিন । ওরস হয় না।[৮]

উপকথা

'কেচ্ছার খাদ্য মাটি। আল্লাপাক ২৪ হাজার মাখলুকাত বানাই সবাইর খাদ্য দিছে। কেঁছো বাকি রোই গেছে। কেচ্ছায় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ কৈল্লো আল্লা পাক, সবাইর খাদ্য বন্টন কৈচ্ছেন আমি কি খাই বাঁচি থাইক্কাম। শেষে আল্লা পাক চিন্তা কোরি কৈলো, তুই আর কি খাবি- মাডি খাইস। সে থেকে তার খাদ্য মাটি।

গ. লোকপুরাণ

চণ্ডিপুর মনসা বাড়ি : ১ বৈশাখ প্রতি বছর মেলা বসে পূজা উপলক্ষে। এক গৃহবধূর নাম ভাগ্যরানি। ঐ বধূ ঐ মন্দিরে এক মনসার মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছে। পূজার পর মনসা দেবীকে তৈল সিন্দুর পরাবার পর তার মাথার বেনি খুলে গিয়েছিল, তখনই মা মনসা তাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে বধূ অপূর্ব সুন্দরী দেবীতুল্য। পূজা দিয়ে বাড়ি আসার পর মা মনসা ঐ বধূয়াকে স্বপ্নে দর্শন দিল। এ সময়ে তার স্বামী ছিল অন্ধ। মনসা দেবী তাকে আদেশ দিল, তোর ছেলেকে আমাদেরকে দে। তোর অন্ধ স্বামীকে

www.pathagar.com

আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেব। বধূ রাজি হলো না। তখন মা মনসা নিম্নরূপ ধারণ করে–অর্ধাঙ্গ মানুষ, অর্ধাঙ্গ সাপ ও পরের অংশ বধূকে ভয় দেখাল। এবং সদর হাতে তাবিজ দিতে চাইল, বধূ গ্রহণ করল না। নির্দেশ গ্রহণ না করায় মা ছেলের বুকের উপর স্বরূপে দাঁড়িয়ে রইল। তখন বধূ ভয়ে ভয়ে চিৎকার দিতে লাগল। মা মনসা তিরোহিত হলেন। পরবর্তীকালে তার ওপর ভর করল ও বাড়িতে মায়ের ঘট প্রতিষ্ঠা করে পূজা দিতে আদেশ দিল। বধূ পুরোহিতের সাথে পরামর্শ করে বাড়িতে ঘট স্থাপন করে পূজা দেয়। সেখানে রোজ রোজ নানা ধরনের মানুষ আসে। বধূ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হলেন মা মনসার কৃপায়।

ঘ. লোকছড়া

এখানকার প্রচলিত ছড়ার কিছু অংশ ছেলেমেয়েরা খেলাধুলায় ব্যবহার করে। কিছু ছড়া আবার বধূবরণের সময় অনেকটা ঠাট্টা আকারে কিংবা একে অন্যকে খোঁচা মারতে ব্যবহার করে। সেগুলোর গুটিকতক এখানে তুলে ধরছি :

১

মা গো মা কিয়া
ফড়িং দাদার বিয়া
টুকটুকিয়ে নাচন করে
ডোকসা মাথায় দিয়া
ব্যাঙ্গে বাজাইল ঢোল
ভাইজা গেল বিয়ার গণ্ডগোল।[৯]

২

ঐদ্য দিড়ি বৈদও ধায়
দামড়া ছিঁড়ি দড়া ধায়
হৈত্য রানা হৈত্য করে
হাপলা মুড়ায় আগুন জ্বলে
একদেশ হিল একদেশ বীল
এক দেশেতো মানুষ নাই
যে দেশেতে মানুষ নাই
হে দেশে ছিল তিন কুমার
এক কুমারে গড়ত জানে না
যে কুমারে গড়ত জানে না
সে কুমারে গড়ছে তিন আড়া
এক আড়া টুডা এক আড়া বুডা
এক আড়ার তলা নাই
যে আড়ার তলা নাই
সে আড়াত করি রাইনছে

www.pathagar.com

তিন বামুনের ভাত এক বামুনে খায়ন ভাত
যে বামুনে খায়ন ভাত
হে বামুনের আছি এক গাই
বিয়াইছে বিয়াইছে তিন ডিয়া
এক ডিয়া আনা এক ডিয়া কানা
এক ডিয়ার তো ঠ্যাং এ নাই
যে ডিয়ার ঠ্যাং নাই
হে ডিয়া বেইচ্ছে তিন টিয়া
একটিয়া সোনা, একটিয়া রুপা, একটিয়া শিসা
যে টিয়া শিসা
হে টিঁয়াদি কিনছে তিন রুইত
এক রুইত এরকুট
এক রুইত হেরকুট
এক রুইতের তো কল্লাই নাই
যে রুইতের কল্লা নাই
হে রুইত কাটতো আইছে তিন কুড়াইল
এক কুড়াইলের আই নাই
এক কুড়াইলের হাই নাই
এক কুড়াইলে ভোগ এ নাই
যে কুড়াইলে ভোগ নাই
হে কুড়াইলদি কাটত আইছে
এক কাচকির মাতা
শুনরে ভাই কুড়াইলের কথা ।[১০]

৩

আন্ডারকুম আন্ডারকুম
লাথি দিয়ে যায় ঘুম।
গেলাসেতে আয়না
মুখ দেখা যায় না।
আংগো স্কুল ছুটি
গরম গরম রুটি
ইস্কিমিস্কি কাপড় কাচি
সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আছি।
মালাপতি মালাপতি
মালা আইনা দে
যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে
তাকে বসাই দে।
ছইয়াল বাইত মেজ্জানি
গোশত রুটি বেলোনি।
বেল মাথা চাইরআনা

www.pathagar.com

চাবি দিলে ঘুরে না
চাবি অইছে নষ্ট
বেল মাথার কষ্ট।

৪
আকাশেতে তিন তারা
আমার নাম জাহানারা
আমি কি জানি
ঠাণ্ডা লেবু পানি।
ক-বলে খরা
তোর হোড়ি চালম চোরা।

৫
জোয়ানকালে দিলা না শাড়ি
লাড়ি চাড়ি হিনতাম
বুড়াকালে দিলা শাড়ি
বেড়াই গোড়াই হড়তাম।

৬
টুনিগো টুনি গরু চরাতি যাবিনি
যাইয়ম যাইয়ম বিয়ালে
কোচ্চা হাতি টিয়ালে।
কোচ্চার ভিতরে দোড়া হাপ
লাফদি উঠে মইরার বাপ।
আইজগা টুনি লুতা বুতা
কাইলগা টুনির বিয়া
টুনিরে নিতো আইছে
দইনের রাস্তা দিয়া।
ভাবি গোমটা খোলেন
গোমটা খোলেন
সোনা মুখখান চাই।
যে জনের তন বিয়া বইচেন
সেজন আমার ভাই।

৭
হাল মাজি হাল মাজি চিতল কর
থাল মাজি থাল মাজি কুক্কু ধর
ইগ্গার ভিতর কি-ঝুনঝুনি
ধর শালার কান টানি।

www.pathagar.com

৮
আষ্ট আষ্ট হোল
আইয়ো বাবার কোল।

৯
আপ্পল থাপ্পল গোল হাতা
সিঁথির সিদ্ধি বিন্দুর রাজা।

১০
এগ্গো ওবুয়া হুনেন চাই
কুত্তা খেউয়ায় কা
আতঅ লাগে চোর বেডা
হুক্কাই হুক্কাই চা।

১১
একিস মেকিস চামচি
চামের আগা বাঙচি
হাত ভাইর বোগো
বিছ্না টিছ্না তোলগো
বিছানার তলে দোড়া হাপ
লাফদি উঠে বাপরে বাপ।

১২
শঙ্খলতা বাঁশের হাতা
ঝাড় জুমজুম করে
শঙ্খলতার বিয়া অউবো
জমিদারের ঘরে।
শঙ্খলতার মাইয়া
জমিদারের হোলা
মুরকা চুরি করে
অর্ধক হতে গেলে
মুরকা ক্যাত ক্যাত করে।

১৩
ঘুম যা ঘুম যা লীলমণি
ঘুম না গেলে কিল কনি।

www.pathagar.com

১৪

হানির তলে হাড়া
তোর দাবি কাড়া।

১৫

ক বলে মোটকার ভিতরে আবিজাবি।
বাপ বোলাইলে হইসা হাবি।

১৬

ক-বলে নাইলে টরি
আই তোর বাপ মেলেট্টরি।
ক-বলে কাচি
চিন্তা করিচ না
তোর বাপ মরি গেলে
আই আচি না?
ক-বলে কাঁঠল হাতা
তোর বিয়ার দিন কত কতা।
ক-বলে বইয়ম
হইতকালে দেন
বাপ কইছত
তোর মারতন যাই কইয়ম।
বিলাই ম্যাও
খইলতা চিলাই দেও
একলা ঘরে কেমন থাইক্কাম
বিয়া করাই দেও।
ক-বলে আলু
হইরা বেডা তোর খালু।
কালী কালী বোম্বা কালী
কালীর নাকে নাক্কুল বালি।
কোন হোয়াদের চেয়ারা
আবার করে কুয়ারা
কুত্তা দেয় না পাহারা

১৭

শ্বশুর বাড়িতে নতুন বউয়ের দুর্ভোগ

লতি কুঠতে সতীর আত
মরিচ বাটতে জ্বলে আত

www.pathagar.com

কেমনে খাইবো নাইকের ভাত।
নাইকে যদি মারে
মার কইলজা জ্বলে
মা কান্দে হার দুয়ারে
হার আগুন নিভে
বাপ কান্দে নদীর হাড়ে
নদীর হানি ইচ্ছে
ভাই কান্দে ইসকুলে
আতের কলম ঝরে
বৈইনে কান্দে ডেঙ্গায় (২)
গাছের হাতা হড়ে।

১৮

স্বামী-স্ত্রী মান ভাঙন

সবে যায়রে মাছ ধত্তো
আংগো যায় না কা?
সবে যায় খাই দাই
আরে দেয় না কা।
রাইন্দা রাকছি বাড়ইয়া রাকছি,
লই খায় না কা?
কেউ বাড়ি কেও লম্বা
হাড়ি দেনা কা?
হিড়ার উপর হিড়া দিই
হাড়ি খাওন যায়!
কতায় কতায় মিল অইছে
ঘরে আইয়েন না।

১৯

শিশুদের ঘুম পাড়ানির গান

বারোই বারোই দা দে
দা কিত্তো বাঁশ কাটতো
বাঁশ কিত্তো ঘর তোলাইতো।
ঘর কিত্তো, বুড়ি থাকত
বুড়ি কিত্তো, সুতা কাটতো
সুতা কিত্তো, খইলতা চিলাইতো
খইলতা কিত্তো, টাকা থুইতো
টাকা কিত্তো, ঘোড়া কিনতো

www.pathagar.com

ঘোড়া কিত্তো?
হোর বাইত যাইতো।
কোনানদি কোনানদি
হোরেগো দুরেদি
নাইচ্যা বিলের হাড়েদি
টুক্‌কো রুত টুক।

শিশুরা যখন অতিরিক্ত কান্নাকাটি শুরু করে তখন তার কান্না থামানোর জন্য সাধারণত ফুফু, দাদি, নানা-নানি, খালা, বড় ভাই, বড় বোন সম্পর্কীয়রা চিৎ হয়ে শুয়ে দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতা একসাথ করে শিশুটিকে পায়ের গোড়ালির ওপর বসিয়ে উপর্যুক্ত গানটি গেয়ে গেয়ে দুই পা উপর নিচ করলেই শিশুটি খুব জোরে হেসে উঠে। এতে শিশুটি কান্নাকাটি বন্ধ করে দিয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। তাই এই গানটি গেয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো যায় বলে গ্রামাঞ্চলে এর যথেষ্ট কদর রয়েছে। উপর্যুক্ত গানটিকে শিশুদের ঘুম পাড়ানির গান হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২০

বর্ণচোরা, বক ধার্মিকদের স্বরূপ বর্ণনা

মাচ্ছা রাঙা হারামজাদা
ডুবদি আদার খায়
জেটটসেরে বিয়া করি
মক্কা শরীফ যায়।

২১

ছোটদের খেলাধুলার হেয়ালি ছড়া

বাঘারে বাঘা
কিরে বাঘা
গাছে উস্যত কিল্লাই
বাঘির ডরে
বাঘিয়ে কিয়ারে
মারে ধরে
তোর মার নাম কী?
হুল কুমারী
তোর ভাই বোন কউগা
ছ কুড়ি ছোগা
আরে অউগ্যা দেছ না
ছুইতে হাইল্ল্যে নেছ না।
ঝিও ঝিও
হেয়ালা খাইতাম গেলাম
কাড়া হুড়ি মইল্লাম
কাডায় দিল শুলানি

www.pathagar.com

বুড়িইয়া দিল দৌড়ানি
ওরে বুড়িইয়া দৌঁড়াছ কা?
হাজি বাইত বাজি করে
দুগা দামড়া জব্ব করে।

২২

আস আস কোনাই যাস
চরি খাইতাম
ধরি নিয়াম
ঠোর দিয়াম, কোনগা নিবি?
হিছের গা
হলাই যা।
শরি গো শরি তোরে বোলায়
কে বোলায়?
ঐ বাড়ির কানায়
চকলেট বানায়
তোরে কইছে যাইতি
চকলেট খাইতি আর...?

২৩

খোড়া বন্ধুকে রাগাবার জন্য বন্ধুরা ছড়া কাটতো

ল্যাংড়া ল্যাং টুক টুক করে
মইরবো শুক্কুরবারে
ঠেঙ্গে লর লর করে
ল্যাংড়ার নাকি হোলা অইছে
আযান দিব কেরে?

২৪

পানসেবী মহিলাকে রসিকতা

হান খাতুরি চুন খাতুরি
কইরাজ্জার বউ
কইরাজ্জা মরি গেলে
কেমনে খাইব লো।

২৫

রৌদ ও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

হুডা হুইসার অলদি
বিষইট আয় জলদি
অলদি দিমু বাইট্যা
রইদ ওঠ ফাইট্যা

www.pathagar.com

কুড়িগো বুড়ি বকুল তলায় যাবি
হাতকান কাড় হাবি
হাতগা বউ হাজাবি
নিজে হিনবি ত্যানার খোট
ঝক মইক্যা রইদ ওঠ।

২৬

জাম খাওয়ারত কালো পাখিকে আবেদন

কালা-রে-কালা, কি-রে কালা
তুইও বালা, আইও বালা
আল্লাই দুগা কাজজাম হালা।

২৭

বড়শিতে টোপ গেলার জন্য আকুলতা

মাচ্ছার মাগো রানি
আর বরিগা টানি
জিগায় কয় মাচ্ছা
তার বোরিগা চুইচ্ছা।
আর ররিগা কালা-চালা
টবক্ষর করি গিলি হালা।

২৮

বাতি নিভে যাবার সময়ে রসিকতা

মহারাজ তো যায়
দিলেই ত অয়
থাকলেই ত দেয়
আনলেই ত অয়
হইসা থাকলেই ত আনে
এই কতা ত বেবেকেই জানে।

২৯

অসময়ে পেঁচার ডাকে অমঙ্গলের আশঙ্কা

হেচা এইজ্জার কোপ কোপানি
আর কইলজ্জার ধড়পড়ানি।
হেচাগারে দৌড়াই দে
মিলাদ কান হড়াই দে।

www.pathagar.com

শ্লোক

১

তালি গেছে তাল টোগাইতো, ঝিয়ারি গেছে চাইতো
ধোড়া হাপে মোড়া দিছে ঝিয়ারির কইলজা খাইতো।

২

তালগাছ তলে যাইওনা
তালের হিডা খাইও না।

৩

তালের ডোগাত ভেঙ্গুলের বাসা
আর করিওনা বন্ধুর আশা।

৪

ভাদ্র মাসে তালের পিঠা কেবা খায়,
আমার স্বামী বিদেশেতে হোন মারায়
আহা স্বামী চোখের মনি গলার হার,
দুঃখিনীর উপরে কেন মন বেজার।

৫

বিয়ে ও বরণ অনুষ্ঠানের শ্লোক

কনেপক্ষ

বড় বাড়ির হোলা তুমি
সবাই তারিফ করে।
উল্টা হাড়িত হাড়া দিয়া
জাতি নষ্ট করে।
ঘরে গরম, বাইরে ঠাণ্ডা
দুলা ভাই খাড়াই থাক ২-৪ ঘন্টা

বরপক্ষ

অক্ষির পাতা শুকাইল
ভাবি আমার লুকাইল
যদি ভাবি আর অন
দুয়ার খুলি ঘরে লন।
এয়োরা : ছেলে ভার না বউ ভার?
মা : বউ লক্ষ্মী ছেলে ভার
ছেলে লক্ষ্মী বউ ভার।

www.pathagar.com

৬
কিপটে গৃহস্থ সম্পর্কে কামলা

ইছা মাছ সসিন্দা
হাক্কুর হুক্কুর বদিল্লা
নাতিন জামাই খাতিল্লা
দাদি হড়ি বিলাইসনা।

৭
কনে পক্ষ

এনি মেনি কাডা
এইনি রাজার ঘাডা
চেচ্ছায় দিল ডাক
দুলা এক্কুই খাড়াত থাক।

বরপক্ষ

বোলাইলাম হালা
আইলো হালি
দিলাম থাপড়
লইযান আমনেগো দরহদ্দার কাপড়।

কনে পক্ষ

ঘরে গরম
বাহিরে ঠাণ্ডা
দুলা খাড়া থাক দুই চাইর ঘন্টা।

বরপক্ষ

ওকগা লম্বা দুগা গোল
তাড়াতাড়ি দুয়ার খোল।
(একটা লম্বা দুটা গোল–এর এক অর্থ দুয়ারের খিড়কি।)

প্রবচন

১
দেমাকি নারী সম্পর্কে

কালা দেই এ্যামন বেশ,
সোন্দর অইলে না রাইকত দ্যাশ।

২
পারিবারিক আচরণ

জিংলায় আনে হার মুখ
হোড়ি আনে বউর মুখ।

www.pathagar.com

৩

প্রকৃতি বিষয়ক

কালা মেঘে নালা হানি
ধলা মেঘে গলা হানি।

৪

মানুষের ঘৃণিত অভ্যাস

চুন্নি আইয়্যে, চুন্নি আইয়্যে
হাজু হামাল।
দুইজ্যা আইয়ে, দুইজা আইয়্যে,
কতা হামাল।

৫

ফুল বাবু সম্পর্কে

হ্যাকে দেয় না আত
লোদে দেয় না ভাত
হে খায় নানান হাইলোর ভাত।

৬

সম্পর্কের টান

আইছে জামাই নিব ঝি,
মার হরানে কইরব কী!

৭

নাটের গুরু চেনা

কার ভাগ্যে শিন্নি খাইলি
মোল্লা চিনলি না।

৮

কনের রূপ কম হলে

আদা ভালো দিক কম
মাইয়া বালা ডক কম ।

৯

নারির আর্তি

জোয়ান কালে আইলা না
খোঁপার ঠাটও চাইলা না
যা আইলা বুড়াতিকালে
ঘিরি রইছে হাকনা বালে।

১০

জবাবে পুরুষ

কিত্তাম তোর নাক্কুল বালি
এমনেই তোরে দেকতা হারি।

www.pathagar.com

১১

স্বভাব সম্পর্কিত

খায় নারীর লোভ বেশি
হিন্দে নারীর শোক বেশি

১২

যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে

কতকির নাইকে উপাস খায়
ঝগুড়ির নাইকে ভাত খায়।

১৩

অস্বচ্ছল পরিবেশে জামাই

শ্বশুর বাড়ি যায়রে জামাই
মুরগা খাইবার আশে
কচুর লতি দেইখ্যা জামাই
হুড়ুর হুড়ুর আসে।

১৪

অবস্থার শিকার

ভাদো মাসে কে না খায় লতি
বুড়াকালে কে না কয়লা নিজেরে সতি
দারুণ হান-এ নাই, যদি সুয়ারী থাইকতো
জেঠাগো ঘত্তন চুন আনি, এমন খাবান খাবাইতাম
তোর মনে থাইকতো।

ঙ. ভাট কবিতা

লোক কবি সাখাওয়াত
(ছাকু সরকার)

১. বাহাদুরা জাহাজের কবিতা

স্মরি মাবুদ বারি আশা করি ছাইড়ে দিলাম মন
সারি পদে সখা থাক প্রভু নিরান্‌জন।

আমি নতুন কবি (২) মনে ভাবি দয়াল তোমার নাম=আমারে নামাই সাগরে দিওনা শরম = তালযন্ত্র তোমার হাতে (২) বাজে তাতে যত মনে লয়= সময় বুঝি মনমজাইও আমার যেন সয়=আমি লোকের=যন্ত্রণাতে (২) লাজ-নম্রতে কণ্ঠে নিলাম সুর=যাত্রা গাঙে পাড়ি দিলাম পন্থ বহুদূর = মাবুদ আল্লা তোর ভরসা (২) দোদিলাসা ভাষা কোথায় পাব = হাপে নেই এই কণ্ঠে কবিতা রচিল = আমি তোমার নবীর উম্মত (২) বেহাত করোনা আমারে = দোহাই তোমার আরশো মালার নবীর কছম লাগে

ছাড়লাম এইবার হাওয়ার গাড়ি (২) গর গর করি ইঞ্জিন তোমার কানে = তরাও কিনা তরাও প্রভু বুঝিব কেমনে = তুমি দোলিলাসা (২) কোন দশা দেও জানি ঘটাই= এজিদেরো মান বাড়াইলা হোসেনকে ঠকাই=সকল কথা মনে আছে (২) কুপার বিছে কোন কর্ম করিলা = মোসলেমেরে দাগা দিয়া কান্দাইলা দুই পোলা= সীমার ছিল মোসলমান (২) ছিল পাষাণ সকল খানে = তোমার মনে হয় না ব্যথা (২) মরম ব্যথা সকল কথা জাগে = কেহ থাকে দেলান কোঠায় কেহ ভিক্ষা মাগে = এইটা তোমার কোন বাইছালি (২) আল্লার অলি বানাইলা শয়তান = আদমের গন্ধম খাওয়াই করলা লানতস্তান =জানে সর্বজনে (২) আয়ুর সনে কি খেলা খেলিলা = বিরক্ত করিয়া দিলা পোকারে খাওয়াইয়া=প্রেমিক তোমার যত ছিল (২) হাইর মানিল খলীলের ও কাছে আপন পুত্র কোরবানী দি দুম্বা মেওলা পাইছে= তোমার দলীল মতে (২) পাপ পুণ্যতে মরল পরিণাম = জিন্দা মানুষ স্বর্গে নিয়া পাইয়াছো খোশ নাম = তবু তোমার স্বাদ মিটে নাই জাহাজ ডুবাই মার = কলম কাঁপে ডরে (২) এই খবর কেমনে ধরি রাখি = আতঙ্কে শিহরি উঠে পাতালো বাসুকি = কবি কেন্দে বলে (২) কলমেরে কেন গেলা থামি= তোমার কর্ম তুমি কর মাবুদ অন্তজামি= এইসব লীলা করে (২) বুঝতে পারে সাধ্য আছে কার= কোন পাপেতে ডুবাই দিল রংগের ইস্টিমার= হায়রে বাহাদুরা (২) নামে খাড়া ইস্পাহানি কোম্পানি=স্টিমাইরের কথা শুনি মুখে নাই তার পানি = হায়রে আমি কি করিব (২) কি বলিব গবরমেন্টের কাছে = সোনামিয়া চেরাঙ্গ আমার বক্ষে আগুন দিছে = আমি বান্দা আছি (২) লেখিতেছি হাতে আর কলমে = আমার জাহাজ ডুব দিবে না চলন্তমহিমে = ডবল ইঞ্জিন ফিটিং করা (২) আগাগোড়া তুপান মেইলে চলে = ছয় মাসের পন্থ জাহাজ ৬ ঘণ্টা বদলে= লক্ষ টাকা খরচ করি (২) তৈয়ার করি জাহাজের সম্বল= সোনার ইঞ্জিন (আটক) বাঁধা আছে জাহাজের মাস্তুল= কত কারিগরি (২) করছি আমি জাহাজের উপরে = সোনার ডিঙ্গি ভাসাই দিলাম নীল মনির সাগরে= জাহাজ বুঝি হইল বিরানা (২) আমিরান বালা খানা ঠাঁট = লঙ্গর তাহার করিয়াছি চিটাগাঙ্গের ঘাট =চিটাগাঙ্গ টু বরিশালে (২) কালে-কালে আসে আরও যায়= আচম্বিতে খোদার গজব পড়িল মাথায় = শুনেন কি প্রকারে (২) শুক্কুরবারে সারা বৃষ্টি হইল= সেই দিনে সে মাস্টার জাহাজ চালাইল।

শনিবারে ১৯ আগস্ট গগন কালা-কালা= অহরহ বৃষ্টি ঝরে ডালা ডালা= নয়টা বাজলে ইস্টিমার গেল ইস্টিশনে= ইস্টিমারের টিকেট করি উঠে জনে জনে= ভোর বেলায় খবর আসে ওয়ারলেসে সাবধান- সাবধান= নৌকা জাহাজ বন্ধ রাখ ২৩ ঘণ্টা তুপান= লাল বাত্তা তুলে ধর (২) খবর কর শহরে বন্দরে= যে যেইখানে আছে যেন থাকে হুশিয়ারে= দেখ তুপান গড়ি (২) ফিন ফিন করি উঠিল মাতিয়া= বিপদ গনিয়া চেরাঙ্গ গেল আতংকিত হইয়া= কাপ্তান আসি ডাক দি কয় (২) ভালো নয় জাহাজ বন্ধ রাখ= একটা কিছু হবে নিশ্চয় (২) আলামতে কয়। কোম্পানি বলে... সোনা মিঞা কেন গেলা থামি= তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড় টাইম গেছে কমি।

সারেং বুঝি কয় না কথা (৯) বাজে নয়টা জাহাজ ছাড়বা কবে= একদিনের টাইম মিস হইলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এত বকা শুনে চেরাঙ্গ কেঁদে বলে (২) আর কিছু নয় স্বপ্নে দেখি রাত্রি নিশিকালে। নানা ঝিলি মিলি (২) তালিমালি দেখি বারে বারে চমকি

www.pathagar.com

চমকি ওঠে মনে বলতে চাই না ডরে= সাগরে আগুন জ্বলে, পাষাণ গলে সেই কালের ডরে= মনে হয় মাথার উপর আকাশ ভেফু পড়ে= সবাই উঠল হেসে (২) বায়ুর দোষে হইছোনি পাগল = হাতে পায়ে বান্দি তাহার মাথায় ঢাল জল= চেরাঙ্গ এইবার লজ্জা পাইলো জাহাজ দিল ছিপটি মারি খুলী= কবি বলে কোম্পানি তুই যমের হাতে দিলি= জাহাজ লয়না পাড়ি (২) পাঙ্কামারি ঘুরে আঁকে- বাঁকে = দাঁড় কাক মাস্তলে বসি কাক বলি ডাকে= দূর হাওয়ার বনে (২) অমঙ্গের চিহ্ন দেখা দিছে= নিম পেঁচা নিম নিম করি মিহরেতে ডাকে=ঘুরাই মাইরলো হটপাথরি (২) যাই সুকনির আটকপালে পড়ে = চামড়া কেটে রক্ত ছুটে বদন গেছে ভরে= আসলো ব্যাটা করল গুলি (২) ছুচুমগুলি উঠিল ভাসিয়া= একবার ভাসে, একবার ডুবে নজর গেল দেখাইয়া= এইবার সবাই বেজার হইছে (২) মেঘ ধৈরাছে ইশান গগন তলে= ফিরাও-ফিরাও-ফিরাও জাহাজ সবাই ডেকে বলে= চেরাং ফোন ধরিলো (২) কথা কইলো কম্পানির সাথে= কি করলা কম্পানি তুমি ফেলিলা সংকটে = এখন কি উপায় (২) হায় হায় বলে যে চুকানী= শক্ত করি ধর চুকান থির গুলীয়া করি=আমরা জাহাজ ছাড়ছি জোরে জোরে (২) শন শন কইরে চল্ল পাঙ্কামারি= কহিতে কহিতে ভাইরে তুপান দিল ছাড়ি= দেয়া খাড়াই গেল (২) মনে হইল হিমাইলো পাহাড়= আল্লার আলম কম্প করি উথালে সাগর= এত জোরে তুইলে ধরে জাহাজেরে আছমান বরাবর= হুংকারি ছাড়িয়া দেয় পাতালো নগর= জাহাজ যেমন কেমন করে (২) বলবো কিরে ভাষায় না কুল পায়=একদিকে দিয়া উঠে দেও আরেক দিক দিযায়= হায়ার লোকের কি দুর্গতি (২) আয়ু ক্ষেতি কত কি যে হইলো= হাশরের ময়দানের বিলাপ শুরু করি দিল= বিলাপ চলতে আছে (২) খোদার কাছে চলুক-কতকক্ষণ = ইস্টিমারের কথা কিছু শুনেন দিয়া মন।

ঘন ঘন খবর বাজে (২) তারের মাঝে সাবধান ও সাবধান = জাহাজ যদি মারা পড়ে তোমাদের নিদান = তোমরা হুশিয়ার (২) খবরদার সুকান ধরো জোরে=পার যদি বুদ্ধি করি জলদি আস ফিরে= চেরাং এবার গোস্বা করে (২) চিৎকার মারে কম্পানি কোথায়=কি করলা কম্পানি তুমি প্রাণে বাঁচা দায় =। আমরা ডুইবে মরি (২) হায় হায় করি বঙ্গপোসাগরে=ভালো চাওতো এই বিপদে ত্বরাই লও আমারে= তাদের উত্তর দিল নরমে গরমে- তোমার সারা তুমি সার আমরা মগ্ন কামে= এখন কি উপায় হায় হায় আর কার আশা করি= ছলেমা ইস্টিমার কোথায় তারে লওনা ডাকি =ছলেমা স্টিমার গেছে (২) জানা আছে পাতার হাটের কূলে=বরিশালের অন্তর্গত ইলিশার অঞ্চলে = তারা জাহাজ রাখে (২) তুপান দেখে ঘাটে বন্ধ করি= তারে লক্ষ্য করি চেরাং ডাকে উচ্চস্বরে= ছলেমা তুই কোথায়রে (২) এ সংকটে উদ্ধারো আমারে= বাহাদুররা মারা যায় বঙ্গোপসাগরে।

কোনো খবর নাই (২) হায় হায় আছে কিনা আছে= কম্পানি তোমার বাহাদুরা সাগরে ডুবি মরে = কম্পানি কয় কি কহিলা (২) কি শুনাইলা আমরো যে কানে=মারিলা মুলুকের তীর মোর বক্ষপানে = কে বা খবর কও (২) আবার কও কি জানি কি হইলো = স্বাদের বাহাদুরা আমার কেমনে যায়রে মারা=বাহাদুরা তুই কোথায় রে (২) খবর দে আমার কানে কানে=উড়োজাহাজ ছাড়ব আমি তোমার সন্ধানে=কোনো খবর নাই (২) হায় হায় আছে কিনা আছে = কবি বলে ক্ষেন্ত দেরে বেলাডুবি গেছে= কলম চলছো

www.pathagar.com

কই (২) খবর লই হইয়াছে পাগল =পাগলে প্যাসেঞ্জারের কথা কিছু আছে নি স্মরণ =লওনা পাঁচ পয়ারে (২) গোসা ধরে ছোলা মার টান =কবি সাখায়েতে বলে পকেটও সাবধান =শুনেন পয়ার সুরে।

ইস্টিমার তো ডুবলো নারে ডুবলো সোনার পুতুলা=হায়রে দ্বিতীয় কারবালা। যখন জাহাজ আসলো ভাইরে চর কমলার কূলে। হু হু করি শব্দ শুনি ইশান গগন তলে। তুপানের আলামত দেখি ডবল ইঞ্জিনে চালায় = হায়রে দ্বিতীয় কারবালা=ঐ সন্দিপের ঘাট ধরে (২) বেশি বাকি নাই=আছম্বিতে ছুটলো তুপান দুনিয়া কাঁপাই। চেরাং চুকানি তারা হইছে বে-খেয়াল=ইস্টিমাইরে ছুটলো ভাইরে কান্দনের রোল। ৪০০ শত নরনারী হায় হায় করে (২) বেতালা = হায়রে দ্বিতীয় কারবালা- ঐ প্রিয় লালের পরে ভাইরে ধন্য শত বার সামাল সামাল বেটা বলে বারে বার = কাল বিকাল খারাপ (২) বিপদ বড় বারি (২) হিন্দুগণে কীর্তন করে বলে হরি হরি, মোসলমানে দোয়া দরূদ পড়েন সবে নিরলা -হায়রে দ্বিতীয় কারবালা-ঐ জাহাজীরে বলে তোমরা আমার কথা রাখ = পরদা কেটে দাও জাহাজের বাতাস কেটে যাক=আমরা নাকি হইছি পাগল কারণ পরানের ডরে। তোমরা যদি হওরে পাগল রাখবে কে, দাপাদপি করি তোমরা জাহাজতো ডুবাই দিলা = হায়রে দ্বিতীয় কারবালো। ঐ হাতিয়ার এক ডিপটি ছিল কুমিল্লা তার ঘর-সাখ দিতে যাইতেছিল পাবনা শহর। হাতে ঘড়ি চোখে চশমা স্যুট পরা তার গায়ে = তিন দিন পরে পাওয়া গেল কমলার দ্বারে। ডিপটি বলি ছিলা গলাতে মোহর মালা-হায়রে দ্বিতীয় কারবালা-ঐ। সন্ধীপের দুইটা মেয়ে মেডিকেল পড়া। মেয়ে কামরা বন্দ রাখি গায় লাগায় বাতাস, হাতে ঘড়ি (২) চোখে চশমা মানিক্য কেশরি। আচম্বিতে কখন ভাইরে মানির মান যায় হরি, আজ পর্যন্ত পচতে আছে জাহাজের নিচের তলায়=হায়রে দ্বিতীয় কারবালা-ঐ বরিশালের একুব মিয়া বড় ধনবান=এক পুত্র, এক কন্যা তার পয়রানের-পয়রান=পুত্র লালকে পাঠাইছিলেন চিটাগাংগের বাড়ি =কন্যা নাইওর আনিবে তারা নাতিন যাত্রা করি। আজ পর্যন্ত গলা ধরি চাডিগার গোয়ার গাঙ্গে টেউ খেলায়=হায়রে দ্বিতীয় কারবালা-ঐ চেরাং কয় চুকানী তুমি চুকান ধর জোরে=৩-৪ জনে যাইয়া তখন চুকান চাপি ধরে=চুকানের তার ছিঁড়িয়া মাথায় পড়ে। করে আল্লাবিল্লা=হায়রে দ্বিতীয় কারবালা-ঐ তার ছিঁড়িয়া চেরাং চুকানি যখন গেল পড়ি=ইস্টিমারের কি অবস্থা দেখেন চিন্তা করি=ইস্টিমারতো ডুবল না রে ডুবল সোনার পুতুলা= হায়রে দ্বিতীয় করবালা-ঐ

কেহ বলে বয়া লইয়া গাঙ্গে সাঁতার দি=কেহ বলে হায়রে আমার বাঁচার উপায় কি। কেহ বলে তোরা স্বামী না জামাই=নিজের জীবন নিজে বাঁচা পোলারে পালাই। পোলায় বলে মাগো তুমি ছাড়িওনা আমার গলা-হায়রে দ্বিতীয় করবালা-ঐ আদি অন্ত বলিব কি আর একটা কথা কই=একটি নারী ভাসি আসে দুইটা পোলা লই। বয়া একটি ভেসে আসে লাগল তার গায় =বয়া যদি ধরে ভাইরে পোলা মারা যায়=বয়া ছেড়ে ডুবদি গেছে দুই হাতে দুই পোলা=হায়রে দ্বিতীয় করবালা-ঐ।

হায়রে নিষ্ঠুর খোদা তুই জানি কেমন, নিরব গাঙ্গে তুইলে করলি শোকের তুপান=পাষাণে হৃদয় কান্দে, অলি কান্দে উহু=ডালে বসি কুকিলা কান্দে কান্দে

www.pathagar.com

কুহুকুহু। = কেমনে করলি এই ডাকাতি নাম শুনেছে জোলজালা=হায়রে দ্বিতীয় কারবালা-ঐ।

প্রিয়লালের প্রতি ভাইরে–প্রভু নেগাবান=তিনটা বয়া ধরিল বেড়াই পাইয়া সন্ধান = একটার উপর মাথা দিয়া হাবুডুবু খায় =আর দুইটা লইছে ভাইরে চিত্তা দি বোগলের তলায়=এইবার হারল নদী =পশ্চাতে দিয়া চলিছে বেটায় নিরালায়। হায় রে দ্বিতীয় করবালা-ঐ। এই পর্যন্ত ক্ষেন্ত করি (পন্থ ধরি) শুনেন ভাই সবায়=ভুল ত্রুটি হইলে কিছু মাপ করবেন আমায় =সবার পায়ে দিয়া ছালাম মাকায়েতে লয় বিদায়-হায়রে দ্বিতীয় করবালা- ঐ।[১১]

২. শিরোনাম : অজ্ঞাত

লেখক লোক কবি সাখাওয়াত উল্লাহ্

(ছাকু সরকার)

(অংশ বিশেষ উদ্ধার করা গেছে)

চিলমছি আর দস্তরখানা সকল জাতে চিনে না-কলা পাতার দুপিঠে দুই জাতির খানা। বন্ধু রিস্তা ছিল আমার রাজকুমারের সাথে = অতিথি হইয়া সে আসে মোর বাড়িতে = খাওয়ার সময় কিছু করেছিলাম ঝাল, খৈই, মুড়ি, দধি, চিনি, মিষ্টি রসের গোল্লা-চৌকির উপর বসাইয়া বড়তনে দিলাম খানা-কলা পাতার দুপিঠে দুই জাতির খানা।

খাইতে-খাইতে বন্ধু অচল হইলো অতি আর খাবে না, আর পারবে না করতেছে মিনতি = একজন মুসলমান নিকট আছিল- ছিলমছি আনিবার তরে তাহারে বলিল = ছিলমছি কথা বন্ধু শুনিল যখন = কহিল খানা আজ রাখেন বারণ = পরে একদিন আসি খাব– আজ তো আর পারব না-ঐ। কলা পাতার দুই পিঠে দুই জাতির খানা।

ঘরের কোনায় থাকি ব্যাঙে কডর কডর করে
ডাক শুনিয়া সর্পরাজ এসে ঢুকে ঘরে
বেড়ার ফাঁকে থাকি ব্যাঙে হিরি হিরি চায়
সর্পরাজায় খাপ ধরিছে এমন দেখা যায়।
চালাকি করিয়া ব্যাঙে এখন সাপেরে কহিল
তোমার পিতার সাথে আমার বন্ধু রিস্তা ছিল। কলা পাতার খানা।
হেথা মোদের বন্ধু রিস্তা পুত্র তুমি জানো না-ঐ।
সর্প ব্যাঙে পিতার পরিচয় পাইয়া সর্পে হেড করিল মাথা
ব্যাঙে বলে পুত্র তুমি কর দেরি
খাওয়ার সময় কিছু আমি যোগাড় করি
তালইর মুখে সাপে দাওয়াত পাইয়া
শুইয়া রহিল সাপ অজু বানাইয়া।
আম্মদ আলীর বধূ গেল ঘরে ঝাড়ু দিতে

www.pathagar.com

চক্করওয়ালা সাপ দেখে পায়ার গোড়াতে
ঝাড়ুর গোড়া ফিরাইয়া মারে সাপের গায়
আম্মদ আলীর বধূর হাতে সর্প মারা যায়।
না হইলো তালইর দেখা-না হইল পুত্রার খানা
কলাপাতার দুই পিঠে দুই জাতির খানা।
গাছের ডালে গেন্দা ফল সুন্দর দেখিয়া
কাক বলে খাব আমি উদর ভরিয়া
কামড় মারিয়া কাক কেন্দা মুখে নিল
বাসায় গিয়া কাকিনিরে কহিতে লাগিল
রঙ ডালিম ফল এনেছি খাব মোরা দুইজনা
কলাপাতার দুপিঠে দুজাতির খানা।
কাকিনি সামনা-সামনি বসে রঙ ডালিম ফল খাবে পেট ভরিয়া
উল্লাসে দুই কাকে দুই টুকরা মুখেতে লইয়া
থু-থু করি ফেলে দিল বিরক্ত হইয়া
কাক বলে ফল আনিলাম দেখিয়া সুন্দর
ভিতরেতে এত তিতা না জানি খবর
রঙ দেখি পাগল হইলাম খাওয়ার কামতো সারলো না
কলাপাতার দুপিঠে দুজাতির খানা।
বান্দরবনের জাতি খায় নানান ফল
আম, জাম, বনের গোটা খাইল সকল
নানান জাতের ফল খাইয়া দাঁত চুকা হইল
নারিকেল খাইতে আবার গাছেতে উঠিল।
চুকা দাঁতে নারিকেল কামড় মারিয়া
বানরের সর্ব অঙ্গ উঠে শিহরিয়া
নারিকেল একটা চুকা ফল বান্দরে করে জপনা
কলাপাতার দুই পিঠে দুই জাতির খানা।
নারিকেল উত্তম ফল মানব জাতি খায়
নারিকেলের তেল দিয়া বহু কাম সারায়
মার্গ পোড়া জাতি তোরা স্বর্ণ রুপা চিনলি না
কলা পাতার দুই পিঠে দুই জাতির খানা।[১২]

চ. বন্দনা

লেখক লোক কবি সাখাওয়াত উল্লাহ্
(ছাকু সরকার)

১. প্রথমে বন্দনা যার নাম তার প্রভু নিরানজন। সেই প্রভু নিরাকার স্থান স্থিতি নাই তার কেয়ামতে পাব দরশন। আছে জানি ব্রম্মপুর না জানি সে কতদূর, আমি তার

www.pathagar.com

রাস্তা নাহি জানি-বায়ু ভরে এসে যায় কেহ না দেখিতে পায় সেই বটে জীবনের জীবন= থাকে সে একাম্বর পুত্র, কন্যা, সহোদর কিছু নাহি আছে বা তাহার= সদায় নিঃশ্বাস ফেলে আহার কদম্ব তলে এসে যায় দিবস যামিনী। সখা তার মুহাম্মদ যাহা হইতে হইলো পয়দা দুনিয়াতে পয়গাম্বর কাজ সেই নবীর কদমেতে কবি ছাপায়ে বলে তুই সময় পাবি না রে উদ্ধারিতে হাশরের দিন।

২. আল্লা-রসুল বলোরে ও সাধুগণ দিন যায় বইয়া= পুবেতে বন্দনা করি পূর্ব ভানুঘর= এক দিগে উদয় ভানু চৌদিগে পহর= তার পূবে বন্দনা করি পাহাড় কাপ-কাপ= সেই পাহাড়ে গেল লোকের গুনা হয় মাপ= তারপরে বন্দনা কবি বাবু জগন্নাথ= ভেদ নাই বিচার নাই (বাজারে বিকায়) কত কত খাইয়া নরনারী মুণ্ডে মোচে হাত= সেই হইতে নাম রাখিলো ঠাকুর জগন্নাথ= তার পূবে বন্দনা করি সাত পাহাড়ের নিচে= ৮০ মনের খেরের হারা চিলে চোপদি নিছে= আল্লা-বোলো, আল্লা-বোলো-রে ও সাধুগণ দিন যায় বইয়া। উত্তরে বন্দনা করি হিমাইল পাহাড়=যেই হিমাইলে দংশিয়াছে ছয়াল সংসার। তার উত্তরে বন্দনা করি হিমাইলের গুহা। উত্তরের হিমাইলে যখন দক্ষিণে দেয় উড়া= তাই দেখিয়া ভয় পাইয়াছে ৮০ কালের বুড়া =বুড়ারা যেমন-তেমন জোয়ানে পাইলো ডর= খেতা লইয়া হাঁদাই গেছে ৮ বেড়ার ভিতর। পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা মসজিদ স্থান = মরণের তক্তে বসি নবী পড়ছিল কোরান। তারপরে বন্দনা করি কূয়া জম-জম= ইসমাইলের পায়ের নিচে আল্লাহর রহম= তার দক্ষিণে বন্দনা করি সেকান্দর নিশানা=তার দক্ষিণে গেলে লোকের খোঁজখবর মিলে না। আল্লা-আল্লা বলোরে সাধুগণ দিন যায় বইয়া।[১৩]

তথ্যনির্দেশ

১. কথক কালা দরবেশ। গ্রাম-কাঠালী, কুশাখালী, সদর লক্ষ্মীপুর।

২. নাম : সিরাজ মিয়া, পিতা : মোহাম্মদ হাছান মিয়া, গ্রাম : খাগুড়িয়া, ডাকঘর : রূপাচরা, সদর, লক্ষ্মীপুর। বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : কৃষি, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র : লোককথক।

৩. মনু মাঝির ভাই, বয়স আশির কাছাকাছি বা উর্ধ্বে ।

৪. নাম : মো. লুৎফুর রহমান, পিতা : মাওলানা রুহুল আমিন, মাতা : মোসাঃ রাবেয়া বেগম, পেশা : ইমাম, নাম : আবদুল খালেক (সেক্রেটারি), পিতা : মৃত সাইফুল্লাহ, মাতা : মোমেনা খাতুন, ঠিকানা : রায়পুর পৌরসভা , ৬ নং ওয়ার্ড, উপজেলা : রায়পুর, জেলা : লক্ষ্মীপুর। নাম : শাহীন আলম, পিতা : ফজলুল করিম, মাতা : মোসা. আনোয়ারা বেগম, ঠিকানা : লক্ষ্মীপুর পৌরসভা, পেশা : ছাত্র।

৫. নাম : ফরিদ, পিতা : আবদুর নূর, মাতা : আমেনা বেগম, ঠিকানা : কাঞ্চনপুর দরগাহ্ বাড়ি, রামগঞ্জ, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষা : এস এস সি পেশা : মাজারের খেদমত।

৬. সংগ্রাহক : নজির আহাম্মদ , সৈয়দপুর (চরশাই)। তথ্যদাতা : আব্দুর রব চৌকিদার (৬০), পিতা : মৃত : সুলতানা আলী, বাড়ি চৌকিদার বাড়ি (দিঘির পাড়) গ্রাম : নাগ রাজাপুর, রামগঞ্জ. শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, পেশা : চাকরি (কৃষি কাজ), সদস্য : ০২ ছেলে ১ মেয়ে।

www.pathagar.com

৭. তথ্যদাতা : নূরনবী মাস্টার (৭২), পিতা : হাজী রশিদ আহাম্মদ মাস্টার, গ্রাম : ফতেহপুর, ডাকঘর : দাসপাড়া, পেশা : অব. শিক্ষক, শিক্ষা : বিএ।

৮. তথ্যদাতা : নাম : ডাক্তার নাজির আহমেদ পাটওয়ারী, (খাদেম) পিতা : মৃত ছালামত উল্যাহ পাটওয়ার, গ্রাম : হরিশ্চর, ডাকঘর : দরগাহ শরীফ, মাতা : আম্বিয়া খাতুন, শিক্ষা : ইন্টার, পেশা : অব. চাকুরে, পরে প্রবাসী, বর্তমান পল্লী চিকিৎসক (খাদেম) বাড়ি- মাঝার সংলগ্ন দিঘির উত্তর পাড়ে, পাটারী বাড়ি। বড়শি- মাছ ধরা, সময়-সন্ধ্যার পূর্বলগ্ন, নাম-সিয়াম, পিতা : শামছুল আলম, গ্রাম : হরিশ্চর, বাড়ি কামিন উদ্দিন মুন্সী বাড়ি, বয়স ৮-৯ বছর, শ্রেণি ৩য়, শখের কারণে দাদি বড়শি বাইত, প্রিয় খেলা- মার্বেল, লাটিম, চাঁড়া বাজি (কুৎকুৎ) সুজন, বড়শি বায়, ৪-৫ জন খালে প্রিয় মার্বেল, লাটিম।

৯. তথ্যদাতা : নামঃ ফজলুল করিম, পিতা : ছায়েদুল হক, ঠিকানা : হাসন্দী, ১ নং উত্তর হামছাদী ইউনিয়ন, পেশা : কৃষিকাজ।

১০. তথ্যদাতা : নাম : রহিমা খাতুন, পিতা : ছায়েদুল হক, ঠিকানা : বাঞ্চানগর, লক্ষ্মীপুর।

১১. তথ্যদাতা : লোক কবি সাখাওয়াত উল্যা (ছাকু সরকার)।

১২. তথ্যদাতা : লোক কবি সাখাওয়াত উল্যা (ছাকু সরকার)।

১৩. তথ্যদাতা : লোক কবি সাখাওয়াত উল্যা (ছাকু সরকার)।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

পুথিগত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার না করে কোনো কারিগর কর্তৃক উদ্ভাবিত ও তৈরিকৃত বস্তু যখন সমগ্র সমাজের সামগ্রী হয়ে ওঠে তখন সেগুলোকে বস্তুগত লোকসংস্কৃতি বলা হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে স্থানীয় উপাদান, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিচারে এ লোক উপাদানসমূহ ব্যবহার করে থাকে। লোকশিল্প (Folk Arts and Crafts)-এর সামগ্রিক আবেদন বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রতিজ্ঞাত হয়। উদাহরণস্বরূপ কুলার গায়ে রঙ দিয়ে যখন কোনো নকশা করা হয় তখন সেই নকশার আলাদা আবেদন অনুভব করা যায়। কুলা আর নকশাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এই দুইয়ের সমন্বয়ে শিল্পবোধ সৃজিত হয়। কুটির শিল্পের অন্তর্গত জিনিসসমূহ বস্তুগত লোকসংস্কৃতিভুক্ত।

১. শীতলপাটি

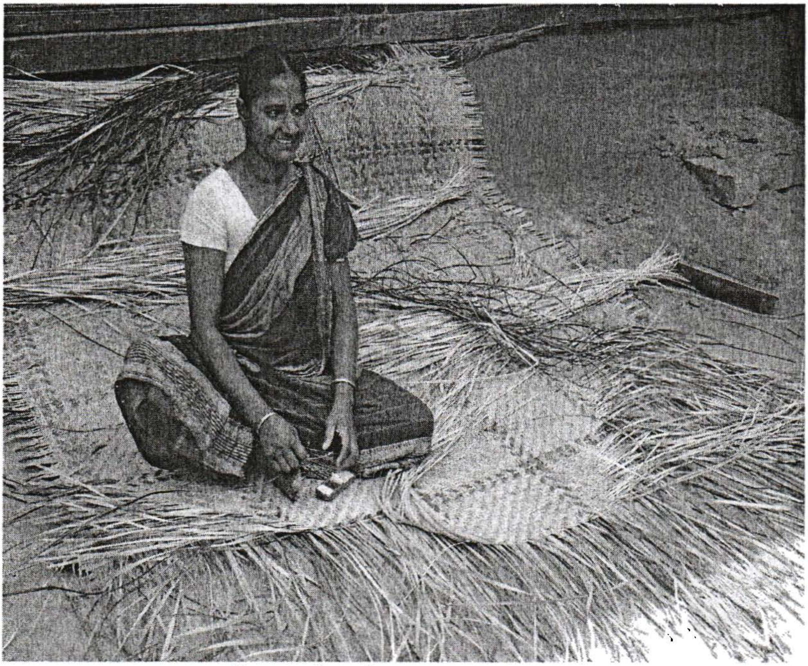

শীতল পাটি তৈরি করছেন ময়মুনা খাতুন

www.pathagar.com

শীতলপাটি শিল্পকর্মের মৌসুম হলো মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাস। কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত এ শিল্পকর্ম ঘরে বসে করা যায়। কৃষিজীবী পরিবারের জন্য এ শিল্পকর্ম উত্তম। সকল ধর্মের লোক অনায়াসে এ কাজ করতে পারে। ভূ-প্রকৃতি (মাটি, নদী, খাল) এ শিল্পের প্রধান উপাদান। কাঁচামাল হলো মোস্তাক। এ মোস্তাকের ঝাঁড় বা বাগানের জন্য সাধারণত সামান্য ছায়া, ভেজা বা স্যাঁতস্যাঁতে পলি মাটি উপযুক্ত স্থান। জেলার পাঁচটি উপজেলার সর্বত্রই এবং প্রায় সব বাড়িতেই এ উদ্ভিদের আবাদ লক্ষণীয়। নদী, খাল, গড়, পুকুর, খানা-খন্দক, বাড়ির আড়ায় এগুলো প্রচুর জন্মে। প্রতি বছর প্রতিটি গাছের গোড়া থেকে নতুন চারা জন্মায়। প্রথমে করুল বের হয়ে আস্তে আস্তে পোক্ত গাছ হয়ে ওঠে। প্রয়োজনীয় সময়ে গাছ কেটে ৫-৭ দিন আস্ত মোস্তাকের স্তূপাকারে বা পুলা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয় যাকে–'জাগ' দেয়া বলে। বিশেষ পদ্ধতিতে বেতা করার পর রৌদ্রে শুকিয়ে বিছানা বানানোর আগে আবার বেতা পানিতে কয়েক দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়। সে জন্য পর্যাপ্ত পানির যোগান লাগে যা পুকুর, দিঘি, গড়-খন্দকে পাওয়া যায়। সেজন্য জলা অঞ্চল বা পুকুর, দিঘি, খাল, গড়-খন্দক পূর্ণ এলাকা বা জনপদের প্রয়োজন। লক্ষ্মীপুরের মৃত্তিকা, খানা-খন্দক, পুকুর, দিঘি, গড় আবহাওয়া এ উদ্ভিদের জন্য খুবই উপযোগী। এ অঞ্চলে জেলার সর্বত্রই এ শীতলপাটি, বিছানা, হাতপাখা তৈরির রেওয়াজ, ব্যবহার ও মর্যাদা সুদূর অতীত থেকে আজ অবধি অটুট রয়েছে যা পারিবারিক ঐতিহ্যের স্মারক বলা যায়।

বেতা তৈরি করছেন (ভেলুয়া) ভেলুয়া বেগম

www.pathagar.com

গরমের সময় বা গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাকালে এ শীতলপাটির সর্বাধিক কদর থাকে। প্রতিটি পরিবারেই এ শীতলপাটি উষ্ণ মৌসুমে আরামে শোবার বিশেষ পাটি বা বিছানা। নতুন মেহমান এলে ফুল করা বা নক্‌শি করা শীতলপাটি বসার জন্য, শোয়ার জন্য দেয়া হয়। বিশেষ মেহমান এলেও যত্নে রাখা (যা পরিবারের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের অন্যতম স্মারক) শীতলপাটি ব্যবহার করা হয়। বিচিত্র নকশা করা হাতপাখা গরমের সময়ে অতিষ্ঠ মানুষের একমাত্র কামনার বস্তু ও সামগ্রী যা মোস্তাকের তৈরি। এ হাত পাখা ও শীতলপাটি নিয়ে অসংখ্য লোকশ্রুতি, প্রবাদ, প্রবচন, কিংবদন্তি, সংগীত, শ্লোক অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। জেলার সর্বত্রই এ শিল্পকর্ম আদৃত, সমাদৃত, আভিজাত্যের স্মারক, ঐতিহ্যিক মূল্য রয়েছে। জেলার বাইরেও এ জেলার শীতলপাটির কদর ও আকর্ষণ রয়েছে।

শীতলপাটি নির্মাণ কৌশল : মোস্তাক থেকে বেতা সংগ্রহ করে দুই হাত ব্যবহার করে সামান্য দক্ষতায় শীতলপাটি নির্মাণ করা যায়।

উপকরণ : মোস্তাক।

হাতিয়ার : দা-বটি-ছেনি-ছুরি, টেঁডিয়া, পিঁড়ি, মুগুর।

পদ্ধতি এবং সংগ্রহ : প্রথমে মোস্তাক বাগানে গিয়ে ন্যূনতম দুই বছর বা তারও অধিক ৩-৪-৫ বছরের শক্ত মোস্তাক মুড়া থেকে কেটে নিতে হয়। পাকা মোস্তাক এনে টেঁডিয়ায় ধারালো দাও বা ছেনি দিয়ে বসে লম্বায় কেটে কেটে চিকন সরু করা হয়। তারপর বুক চেঁছে বেতা তৈরি করা হয়। কাটা মোস্তাকের পাতা, মাথায় সামান্য শাখা ছেঁটে ফেলা হয়। এরপর পুকুরে বা ডোবায় একটু ধুয়ে নিয়ে অনেকগুলো মোস্তাক আটি বেঁধে (একে কোশানো বলা হয়) পানিতে জাগ দিয়ে রাখা হয় ৫-৭ দিন। সেখান থেকে তুলে দা, বটি, ছেনি দিয়ে ফালি-ফালি করে কাটতে হয়। তারপর দাও দিয়ে বুকা ফেলে বা ছেঁটে ফেলা হয়। বাকি শক্ত অংশ মাথায় চুরি বা দাও দিয়ে সামান্য কাটা দিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলে অপূর্ব কৌশলে টেনে টেনে দুটা বেতা আলাদা করা হয়, এদেরকে বলে বেতা। একটা পিঠের, একটা বুকের। বুকেরটাকে বলা হয় বুকা। পিঠেরটা বা পিঠের বেতা দিয়ে তৈরি হয় বিছানা বা শীতলপাটি বা পাটি। বুকেরটা দিয়ে তৈরি হয় বুকার চাটাই বা বিছানা। এ বেতা আবার রৌদ্রে দিয়ে শুকাতে হয়। তারপর আবার এ বেতা কাজের উপযোগী করার জন্য পানিতে কয়েকদিন জাগ দিয়ে রাখা হয়। সেখান থেকে তুলে রংয়ের পাত্রে, বালতিতে রঙানো হয়। এবার মূল কার্য।

নির্মাণ বিবরণ : রঙানোর পর তুলে এনে রৌদ্রে শুকানো হয়। এরপর পাটি বানানোর উপযোগী হয়। কী ছবি বা নকশা আঁকবেন তা প্রথমে মনে গেঁথে সে অনুযায়ী বেতার বিন্যাস করা হয় ও দক্ষতার সাথে বাইনে বাইনে উক্ত নকশা বা ছবি ফুটিয়ে তোলা হয় সুনিপুণ শিল্পীর হাতে। প্রথমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মোস্তাক হতে বেতা সংগ্রহের পর কালি বা রঙ দিয়ে রাঙিয়ে নিতে হয়। এবার কয়েকটি বেতা লম্বার দিক থেকে মাটিতে পাশাপাশি রেখে কয়েকটা বেতা হাতে নিয়ে বিছানো বেতার ফাঁকে-ফাঁকে দক্ষতার সাথে গেঁথে বাইন তোলা হয়। সাদামাটা পাটিতে তেমন দক্ষতার প্রয়োজন হয়

www.pathagar.com

না। নকশা করতে গেলেই দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে। আর নকশা করা পাটি তৈরি করতে হলে দক্ষ নকশাদার থেকে বেশ কিছুদিন প্রশিক্ষণ নিতে হয়। পাখা তৈরির ক্ষেত্রে বেতা বা বেতি বানানো হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেতি রঙ পানিতে ভিজিয়ে রেখে (১-২ রাত) বিভিন্ন রঙ করা হয়। তারপর বাইন দেয়ার সময় শিল্পীর দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় ফুটে ওঠে। বেতার বিন্যাস প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে তিনি কিসের নক্সা তৈরি করবেন। সংসার কর্মের পাশাপাশি এ কর্ম করে শিল্পী বাড়তি আয় করেন। আনুমানিক মাসে ৩০০-৪০০ টাকা এ কর্মে আয় হয়।

বিছানা (আঁতির বিছনা) : একই প্রযুক্তি ও নির্মাণ কৌশল।

হাতপাখা : দুই প্রকারের বেতা দিয়েই হাতপাখা তৈরি করা যায়। নকশা-নকশি করা পাখায় সাধারণত মাছ, ফুল, পাখি, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি নকশা করা হয়। কখনো উড়োজাহাজ অঙ্কিত হাতপাখা বা এ জাতীয় ব্যতিক্রমী পাখাও তৈরি করা হয়।

শিল্পী মূল্যায়ন : এ শিল্পের শিল্পীর সামাজিক, পারিবারিক মর্যাদা খুব উঁচুতে।

দর্শক প্রতিক্রিয়া : দক্ষ শিল্পীর কাজ দেখে দর্শক অভিভূত হয়।

আর্থিক মূল্য : কুটির শিল্পের অপরাপর ধারার মতো এ শিল্পে জড়িত শিল্পীদের আর্থিক মূল্য খুব কম। সামাজিক মূল্য প্রশংসনীয়।

ঐতিহ্যগতমূল্য : শীতলপাটির ঐতিহ্যগত মূল্য ঈর্ষণীয়। নকশাদার শীতলপাটি জেলার বিশেষ ঐতিহ্যিক বিষয়। গরমের সময় হাতপাখার অপরিহার্যতা এ শিল্পের ঐতিহ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে।

শিল্পীরা (পাটিকর) পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য অনুযায়ী কাজ করে চলেছেন। শিখেছেন মা, দাদি, নানি ও সৌখিন শিল্পীদের কাছ থেকে। একটা পাটি ৪-৫ হাত (৩-৩½ পন), একটি পাটি তৈরি করতে খরচ হয় প্রায় ৫০০/- টাকা (১ পন ৬০-৭০ টাকা হারে ২০০-২৫০/- + দুই পদ রঙ- ১২০/- + ১২০/- = ২৪০/-) মজুরি ব্যতীত, সময় লাগে ১০-১৫ দিন। বাজারে বিক্রি ১০০০/- থেকে ১২০০/- অথবা ১৫০০/- টাকা। ছোট (২½/-৩ চিনি) নামাজের বিছানা ৩½/- ৪½ হাত (প্রতিটি পাটিতে লাভ ৩০০-৫০০ টাকা)। চিনি-বিছানা তৈরি করতে খরচ হয় ২০০/-, বিক্রি হয় ৪০০/- টাকায়। আনুমানিক মাসিক আয় ১৫০০/-২০০০/- টাকার মতো, মাসিক ব্যয়, খাওয়া-দাওয়া, বাচ্চার পড়ালেখার খরচ এ আয় থেকে হয়। সঞ্চয় থাকে না। এ অঞ্চলে আরো অনেক মহিলা এ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সারা বছর মহিলারা এ কাজ করে থাকেন। কোনো তরফ থেকে কোনো সহযোগিতা, সাহায্য কখনো পাননি বলে জানান শিল্পীরা। বিছানা ছাড়া হাতপাখাও তৈরি করে বিক্রি করেন। মাসিক আয় ৮০০, ৯০০ ও ১০০০ টাকা। বাৎসরিক আয় ১২-১৩ হাজার টাকা। সামাজিক মর্যাদা আজো অক্ষুণ্ন। কদর বেড়েছে শিল্পীর। ৫ বছর পূর্বের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভালো। ১০ বছর পূর্বের অবস্থা আরো ভালো ছিল। ২০ বছর পূর্বের অবস্থা ছিল রমরমা।[১]

রূপান্তর : বর্তমানে বেতের পরিবর্তে লাইননের সুতা ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

২. মুড়িশিল্প

মুড়ি তৈরির গিগজ ধান শুকানোর দৃশ্য

৪০ কেজি ধানে ২৩ কেজি মুড়ি হয়। প্রতি ৪০ কেজির দাম ২৮০০ টাকা। ২ মন ধানের চাল হয় ৫২ কেজি, মুড়ি হয় ৪৬ কেজি।

হাতে মুড়ি তৈরির দৃশ্য

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ধান, লবণ, লাকড়ি, চুলায় পাতিল ২টা, মাটির খোরা ২টা, ঝাঝর ১টা, চাম্‌মা ১টা, বালু ৮ কেজি, হোমবিল, পাট খড়ির, ধান শুকাতে হোগলা ৬টা,

www.pathagar.com

ধান ভিজাতে গামলা ২টা, সিদ্ধ করতে পাতিল ৪টা, হাইডগা ধান গোলাতে লাই ওড়া/টুরি, বস্তা।

২ মন ধানে লাভ হয় ৫০০-৬০০ টাকা

মালের উৎপাদন বাড়লে মালের দাম কমে যায়।

রোজার মাসে বেশি যায়, ডবল যায়।

মুড়ি ভাজে ভোর ৪টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত। বিকালে চাল ঝারে।[২]

হাতে মুড়ি ভাজার দৃশ্য

মুড়ি তৈরির দৃশ্য দেখাচ্ছেন খোকন চন্দ্র দাস

মুড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত খোকন চন্দ্র দাস বলেন, 'লক্ষ্মীপুরের সমসেরাবাদের জোড় দিঘির পাড়ের বলাই দাসের বাড়িতে ৯টি পরিবারের মধ্যে ৭ পরিবার, সরকার বাড়ি ১২ পরিবারের মধ্যে ৭ পরিবার, মনা দাসের বাড়ি ৪ পরিবারের মধ্যে ১ পরিবার,

www.pathagar.com

সন্তোষ শাখারি বাড়ি ৩ পরিবারের মধ্যে ১ পরিবার, পানাগো বাড়ি ৩ পরিবারের মধ্যে ১ পরিবার, দফাদার বাড়ি ৩ পরিবারের মধ্যে ১ পরিবার, কালীবাড়ি ২ পরিবারের মধ্যে ১ পরিবার, বৃন্দাগো বাড়ি ৩ পরিবারের মধ্যে ১ পরিবার, সহসা অনেকে এই কাম ছাড়ি দিবে। উত্তর মজুপুর আর বাঞ্চানগর গ্রামেও মুড়ি ভাজা হয়।'

ঋণ : গ্রামীণ ব্যাংকের ১৫,০০০ টাকা, সপ্তাহে কিস্তি ৪০০ টাকা। সপ্তাহ ৩৫০ টাকা। ৪৫ কিস্তি ঋণ পরিশোধ করতে হয়। অনেক চালান নাই। তারা ঋণ লয়। আগে গাইগিরস্তি আছিল তারপর চিড়া ভাজাও পুরা পাড়ায় মিলমিশ আছে। লক্ষ্মীপুর থেকে গিগজ ধান অনেক জায়গায় দেয়। পুরুষদের থেকে মহিলাদের খাটুনি বেশি।[৩]

মুড়ি ভাজার গান

১

পোড়া পোড়ায় হইলাম চাই, আর তো পোড়ার অন্ত নাই
সখি গো, পোড়া দেহ আর কি পোড়া যাবে...
যখন আমার প্রাণ যায় কৃষ্ণ নাম লিখিও গায়
আমায় না পুড়িও ঐ অনলে, আমায় না ভাসাইও গঙ্গার জলে
আমারে বান্ধিয়া রাখিও তমালেরই ডালে,
যদি বন্ধু আসে দেশে বলিস তোরা বন্ধুর কাছে
তোমার প্রেমের মরা ঐ তমালেরই ডালে
যদি বন্ধু কাঁদতে চাও শান্ত রাইখো প্রেম সভায়
যেন বন্ধু না পুড়ে অনলে, পোড়ায় পোড়ায়...
সর্ব অঙ্গ খেও কাক রে, না রাখিও বাকি,
বন্ধুর দরশনে রেখো দুটি আঁখি।

জ্যোৎস্না রানি দাস : প্রথম মুড়ি ভাজার কাজ শুরু করেন

www.pathagar.com

সইগো সই, আমরা তো গো কাক জাতি
এই যে মোদের ধারা,
সর্ব অঙ্গ না খাইতে খাই নয়নের তারা।
ও সইগো সই
যখন আমার প্রাণ যায়...

২

আমার মনের আগুন দ্বিগুণ
জলে দিবা নিশি বারণ হয় না
জল দিলে নিভে না।
ব্যথার ব্যথী কে বা আছে
বলব দুঃখ কারো কাছে
ওগো সমান দুঃখের দুঃখী
না হইলে দুখের বেদনা
কেউ জানে না।
জল দিলে নিভে না।
যে দিন শাম মথুরা গমন
সে দিন যদি হইত মরণ
সবে বলত রাধা রমণ
কৃষ্ণ প্রেমের এ যন্ত্রণা
জল দিলে নিভে না।
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে...
জল দিলে নিভে না।

৩

মন পাগল হইলো রে গৌরাঙ্গ রূপ দেখে
কি দেখলাম কি দেখলাম সখি গহুর
রূপের ঝিকিমিকি।।
এ দুচোখে বিনে প্রাণ বাঁচে না, কি যন্ত্রণা
থেকে থেকে পড়ে গো মনে।
মন পাগল হইলোরে গৌরাঙ্গ রূপ দেখিয়া।
ফিরিয়া না দেখলাম তারে নদীর ঘাটে।
তখন আমার কলসী গো কাঁকে
গৌহুর আমার মাথার বেনি খুলে দেখ না প্রাণ সজনী
মন পাগল...
দংশিল গৌরাঙ্গ ফণি, বিষ নামে না প্রাণ সজনী
হায় কি করি।
বিষে অঙ্গ দগ্ধ হলো প্রাণ গোলোকে দেয় ওজা বৈদ্য এসে
মন পাগল...

www.pathagar.com

৪

সইগো সই ছেড়ে গেলে মনের মানুষ তারে পাইবো কই
তোরা বলগো প্রাণ সই, আঁউশ করে দুধ কিনিলাম
হয়ে গেল দই।।
হৃদয় মাঝে জলছে অনল ধান দিলে হই খই।
সই গো সই...
শাশুড়িয়ে বলে মন্দ অঞ্চল (আঁচল) পেতে লই
ননদিনি বলগো মন্দ পুরির বাইর হই।
সই গো সই...
দক্ষিণ পাড়া উত্তর পাড়া মধ্যখানে রই
পাড়া পাড়ায় খোঁজ করিলাম প্রাণ বন্ধু কই
সই গো সই...
ওপার ভাঙে এ পাড় গড়ে মধ্যখানে রই
পাড়া পাড়ায় খোঁজ করিলাম প্রাণ বন্ধু কই
সই গো সই...

৫

ওগো আর আসবে না বৃন্দাবনে
ধরা-চূড়া রেখে যাই।
জন্মের মতো বিদায় হইলাম রাই।
ওগো পায়ে ধরে মিনতি করি নয়ন মেলে চাও না রাই।
জন্মের মতো বিদায় হইলাম রাই।
ভিক্ষার ঝুলি কন্ধে (কাঁধে) করে রামাবলি
মাথায় বেঁধে জয় রাধা শ্রীরাধা বলে
নগরে বেড়াইয়া খাই।
জন্মের মতো বিদায় হইলাম রাই।
এ আর্শিবাদ কর মোরে ঋণ যেন মুক্তি পাই
জন্মের মতো বিদায় হইলাম রাই।
আর আসবে না বৃন্দাবনে
ধরা-চূড়া রেখে যাই।

৩. মৃৎশিল্প

লক্ষ্মীপুর ভূ-খণ্ডে জনবসতি স্থাপনের আদিপর্ব থেকে গৃহস্থালির জন্য মাটির তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা শুরু হয়। এলাকায় মৃৎশিল্পের কারিগরগণ আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন। মৃৎশিল্পীরা কুমোর নামে পরিচিত। এ জেলার প্রতি উপজেলায় কুমোর বাড়ি দেখা যায়। কুমারগণ কয়েক পুরুষ থেকে হাঁড়ি-পাতিল, মটকি, কলস, বদনা,

www.pathagar.com

বইয়াম, মুচি বাতি, আগুনের বোশি প্রভৃতি গৃহস্থলীর অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং মেলার জন্য মাটির রঙ-বেরঙের খেলনা তৈরি করেন। বাড়ির মহিলারাও মৃৎশিল্পের কাজের সঙ্গে জড়িত।

মৃৎশিল্পী শিবানী রাণি পাল

মাটির পাত্র তৈরি করছেন মৃতশিল্পী

বিবরণ

লক্ষ্মীপুরের পৌর এলাকার (লক্ষ্মীপুর সদর) দক্ষিণ মজুপুর গ্রামের গোপীকৃষ্ণ পাল ১৯৭৩ সাল থেকে মাটির কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। মাটি দিয়ে তিনি পুতুল ও বিভিন্ন রকমের খেলনা যেমন : গোরু, ঘোড়া, পাতিল, মোরগ, হাঁস, ব্যাংক, টিয়ে, বাঘ, চড়ুই পাখি, টুনটুনি পাখি, হাতি ইত্যাদি তৈরি করেন এবং এসব তিনি দোকানে ও মেলায় বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মজুপুরের পালকান্দির মৃত রমী পাল ও তার ভাইগণ পূর্ব পুরুষের ধারায় দীর্ঘকাল থেকে পারিবারিক মৃৎশিল্পের কাজ করেছেন। এখনও পালকান্দিতে মৃৎশিল্পের কাজ চলছে। উত্তর বাঞ্চানগর কুমোর বাড়ি, গঙ্গাপুর, পালবাড়ি ও ধর্মপুর কুমোর বাড়িতে শত শত বছর থেকে বংশ পরম্পরায় মৃৎ সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। ভবানীগঞ্জের ধর্মপুরে ১০-১৫টি বাড়িতে মাটির সামগ্রী তৈরি হয়। রাধাপুর গ্রামের ১টি বাড়ি ৪ থেকে ৫টি পরিবার দালাল বাজার খোয়াসাগর দিঘির পূর্ব পাড়ে ১টি বাড়ি ২-৩ পরিবার, মজুপুর গ্রামে ৪-৫ বাড়ি, চৌপল্লী গ্রামের ১টি ৪-৫ পরিবার, হামছাদীতে ২টি বাড়ি ১০-১৫ পরিবার মৃৎ সামগ্রী তৈরি করে থাকে।

রামগঞ্জের শৈরশৈ নামক এক গ্রামে ৬ বাড়িতে অনেক পরিবার মৃৎশিল্পের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কুমোর বাড়ির লোকেরা প্রতিমা, খেলনা, হাঁড়ি-পাতিল তৈরি ও রঙ করে হাট-বাজার, মেলা ও বাড়ি বাড়ি নিয়ে বিক্রি করেন। মৃত বোবা হেলাল নন্দী ও ছেলে নারায়ণ নন্দী মাটির প্রতিমা তৈরির কারিগর হিসেবে প্রসিদ্ধ।

রায়পুর বাজারের রামকৃষ্ণ পাল, মোহন বাঁশী পাল, মিনা পাল, শান্তিপাল গৃহস্থালীর সামগ্রীর সাথে ফুল, পাখি, ফল, পশু ও মুখোশ তৈরি করে পূর্বপুরুষদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

রামগতির করণা নগরের চন্দ্র মোহন পাল কয়েক পুরুষ পূর্ব থেকে মৃৎশিল্পের কাজ করতেন। বর্তমানে এ পরিবার উচ্চ শিক্ষিত হয়ে অন্য পেশা বেছে নিলে মাটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মৃৎসামগ্রী আসে। যেমন : বরিশাল, পটুয়াখালী, ঢাকার রায়ের বাজার, সাভার, টাঙ্গাইল ইত্যাদি।

প্রতিমা তৈরির কারিগর : হিন্দু সম্প্রদায় মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে এবং অর্চনা করে। প্রতিমা তৈরিতে মৃৎশিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। যুগ যুগ ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে আসছে। লক্ষ্মীপুরে দুর্গা প্রতিমার কিছু কারিগর আসে ধর্মপুর থেকে আর বাকি কারিগর আসে ফরিদপুর জেলা থেকে। লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রতিমা তৈরির কারিগর আসে ধর্মপুর, হামছাদী ও রামগঞ্জ থেকে।

উপকরণ : মাটি, লাকড়ি, খর, ডাইস (খাঁচ), চক পাউডার, লাল-সাদা রঙ।

ব্যবহৃত মাটির উৎস : এ মাটির কিছু অংশ আসে রামগঞ্জ থেকে। বাকি সব মাটি নোয়াখালী জেলার জমিদার হাট থেকে কিনে আনা হয়। কারণ এ অঞ্চলে এ মাটি

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। এরজন্য প্রয়োজন আঁঠালো মাটি যা কুমাইয়া মাটি নামে পরিচিত। এখানকার মাটি সাধারণত বেলে মাটি।

নির্মাণ কৌশল : প্রথমে মাটিকে পানি দিয়ে কাদা করে পা দিয়ে মেশানো হয়। তারপর ডাইস বা খাঁচ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হয়। এরপর মৃৎসামগ্রীটিকে প্রথমে রৌদ্রে শুকিয়ে তারপর খড় ও লাকড়ি দিয়ে পোড়াতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী চক পাউডার, সাকু/ এরারোট ও বিভিন্ন রঙ দিয়ে রঙ করা হয়।

মৃৎশিল্পের অবনতির কারণ : লক্ষ্মীপুরের মৃৎশিল্পের পূর্বের সেই জৌলুস আজ আর নেই। তখনকার দিনে মানুষের কাছে মৃৎশিল্পের কদর ছিল অনেক বেশি। প্রতি বাড়িতেই মাটির হাড়ি, মাটির কলসী, মাটির থালা-বাসন এমনকি নিত্যদিনের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির প্রতিটিই ছিল মাটির। বর্তমানে প্লাস্টিক দ্রব্যাদির বিপুল ব্যবহারের কারণে মৃৎশিল্পের দ্রব্যাদি বিলুপ্ত হতে চলেছে।

মৃৎশিল্প বিলুপ্তির কারণগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. বিদেশি শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মৃৎশিল্পকে রক্ষা করা কঠিন।
২. মৃৎ সামগ্রী অন্য জায়গা থেকে আনতে পরিবহন খরচ হয় বেশি।
৩. ধাতব ও চিনা মাটির তৈরি সামগ্রী সহজলভ্য হওয়ায় মৃৎ সামগ্রীর কদর কমে গেছে।
৪. আজকাল মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত মৃৎশিল্পীদের মানুষের কাছে তেমন আর কদর নেই।

মৃৎশিল্পী

www.pathagar.com

ফলে কুমোর বাড়ির নতুন প্রজন্ম তাদের পৈতৃক পেশা পরিবর্তন করছে। মৃৎশিল্প পরিবারের অনেক সদস্য উচ্চ শিক্ষিত হয়ে অন্য পেশা বেছে নিলে অনেক পরিবারে মাটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এখনো অনেক পাল পরিবার এ ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে।

মাটির বাসন (হানক)

মাটির বাসন : লক্ষ্মীপুর জেলার লোকজীবনের অন্যতম সংস্কৃতি ছিল মাটির বাসনে ভাত খাওয়া। যাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'মাডিয়া হানক' বলে অভিহিত করা হতো। তা এখন অতীত স্মৃতিও। মাটিয়া বাসনের সে ঐতিহ্য এখনো মাজার ও মাহফিলে আজো টিকে রয়েছে। মাটির বাসন, মালসা মাহফিলে 'তবরুক' পরিবেশন ও খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। কয়েক হাজার মানুষ একসাথে 'তবরুক' গ্রহণ করতে পারে। মাহফিলকে কেন্দ্র করে এ বিশাল অঞ্চলের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, দলগতভাবে মানত, অনুদান দিয়ে থাকে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, ডাল, চাল, লাউ, কুমড়া, নারকেলসহ নানা সামগ্রী, লাকড়ি, ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে।

www.pathagar.com

মৃৎশিল্পী

৪. বাইনশিল্প

উপাদান : হোগলা পাতা।

হাতিয়ার : শুধু একটা ছুরি অথবা একটি ধারালো ছেনি বা দাও, টেঁডিয়া, হিঁড়া।

ব্যবহার : দুঃখী-দরিদ্র মানুষ ঘরের ছাউনি ও বেড়া দেয়ার জন্য পাতা ব্যবহার করে থাকে। গ্রামীণ লোকজীবনেই এর ব্যবহার অধিক।

www.pathagar.com

হোগলা পাতার পাটি তৈরি করছেন জনৈক মহিলা

পাতার আবাদ : প্রাকৃতিক নিয়মেই পাতাবন গড়ে ওঠে। নতুন জাগা চরে বিভিন্ন তৃণ-উদ্ভিদ-গুল্ম জন্মে থাকে। ধুপা-তৃণ লতাদি, শন, কাঁশ, পাতা গাছ বা বন বা হোগলা/ধাড়ি পাতা এভাবেই জন্মায়। হোগলা পাতার আঞ্চলিক নাম ধাড়ি পাতা। বিগত শতাব্দিতে (বিংশ শতাব্দী) একাধিক বার লক্ষ্মীপুর জেলা ভুলুয়া ও বঙ্গোপসাগর, মেঘনা নদী দ্বারা ভাঙনের কবলে পড়ে জেলার অধিকাংশ এলাকা (লক্ষ্মীপুর সদরের পূর্ব-পশ্চিম, দক্ষিণ অঞ্চল, কমলনগর ও রামগতি উপজেলা, রায়পুর একাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পুনরায় চর জেগে ওঠে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই। এ অঞ্চল তখন বিরান ভূমি ছিল। পঞ্চাশের দশকে (বিংশ শতাব্দীর) এ বিরাণভূমিতে তখনকার সময়ে কোনো ফসলের আবাদ বা উদ্ভিদ জন্মাত না। বিরাণভূমিতে প্রথমে তৃণ গজায়। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগলের বাথান চরত। ধীরে ধীরে কাইচ্ছাবন, শন, পাতাবন, নল-খাগড়া জন্মাতে শুরু করে। কয়েক দশক ছিল এ সবের রাজত্ব। মৃত্তিকার বিবর্তনে শস্য-ফসল, উদ্ভিদ জন্মাতে শুরু হলে মানুষের আবাস তৈরি, ফসলের চাষাবাদের কারণে উজাড় হতে থাকে নলখাগড়া, কাইচ্ছা, শন, পাতাবন। এ পাতাবন তারই বংশধর। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুরের প্রখ্যাত পাতাবন দুহজেলার কয়েক বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এ বিশাল অঞ্চলে হাজার হাজার পরিবার পাতাবনের উপর জীবিকা নির্বাহ করত। অনেক লোকশ্রুতি, প্রবাদ-প্রবচন, আদি-ভৌতিক কাহিনী এ পাতাবনকে ঘিরে সৃষ্ট হয়েছে। এ পাতাবনের (ক্রম ক্ষয়িষ্ণু) পরিধি ক্রমেই কমে আসছে। কারণস্বরূপ পাতাচাষিরা বললেন, আবাদি জমির স্বল্পতা, পাতার ব্যবহার ও মূল্য হ্রাস, পাতার উৎপাদন কমে যাওয়া, বর্ধিষ্ণু মানুষের বাড়ি ঘর তৈরি, অনেকগুলো ইটের ভাটা যা পাতাবনে গড়ে উঠেছে, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কারণে। বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার এ পাতাবনের বেষ্টনী ছিল সৈয়দপুর, রহিমপুর, রামপুর, তিতারকান্দি, ইটখোলা, জালিয়াকান্দি,

www.pathagar.com

খৈয়াটোলা ও কল্যাণপুরে। এ ছাড়া তৎসংলগ্ন নোয়াখালী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। বর্তমানে তিতারকান্দি, নোয়াহাট এলকায় সীমিত আকারে এ পাতাবন বিস্তৃত। জাইল্লাকান্দি খোলা, রায়পুর, রামগতি, কমলনগর, উপজেলার বিক্ষিপ্ত পাতাবন ছড়িয়ে আছে।

নির্মাণ সামগ্রী : ধাড়ি বিছানা শোবার কাজে ব্যবহৃত হয়। বটুনি বসার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হয়। নামাজের বটুনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। চাটাই ধান বা শস্যাদি রোদে শুকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। হাতপাখা (বিচোইন বা বিচুন) এলাকার মানুষ গরমের কালে হাতপাখা ব্যবহার করে থাকে। মেজবানিতে, রোজার খাওয়ানিতে, বিয়ে-শাদিতে মেহমান বসানোর কাজে বিছানা হিসেবে বসার জন্য ধাড়ি-বিছানার ব্যবহার রয়েছে। ওয়াজ-মাহফিল, মিলাদ পড়ানোর সময় বসার কাজে এগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া মসজিদে নামাজ পড়ার সময় এ ধাড়ি বিছানো হয়।

নির্মাণ প্রণালী : হোগলা পাতা দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণ প্রণালী খুবই সহজ। কাঁচা পাতা কেটে ক্ষেতে বা বাড়ির উঠানে রোদে শুকানো হয়। শুকনো পাতা প্রথমে চিটকা পানি দিয়ে একটু আর্দ্র করা হয়। তৎপর একটি ছুরি দিয়ে চেঁছে বুকা (লিল্লা) পালানো হয়। বুকা হল পাতার একপাশে সামান্য ধারের মতো থাকে। এরপর সামান্য পানি ছিটিয়ে পাতা একটা দাঁড়া বা ছুরির বাঁট দিয়ে দুইল (ঘেঁষে মোলায়েম করা) করা হয়। তারপর পাতার সাথে সাথে জুড়ে দিয়ে অগ্রসর হয়। প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি হলে পাতাগুলো মুড়িয়ে কাঠামো ও সামগ্রী তৈরি করা হয়। শুধু হাতপাখা তৈরিতে বাঁশের কঞ্চি বা জিংলা লাগে। বাকি কোনো জিনিস তৈরিতে পাতা ব্যতীত কোনো কিছুই লাগে না।

শিখন প্রণালী : এ বিদ্যা শেখা খুবই সহজ। মা, দাদি, নানি, চাচি, খালা এদের কাছ থেকে দেখেই শিখে ফেলে শিল্পীরা অতি সহজে।

অর্থনৈতিক মূল্য : এ শিল্পীদের অর্থনৈতিক মূল্য খুবই কম। এ শিল্পকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করা খুবই কঠিন। এ ফসলকে কেন্দ্র করে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। প্রথমত পাতাচাষ করে, বাইন কুডা শিল্পী, এরপর ফড়িয়া, ব্যবসায়ী, মজুর-শ্রমিক, রিকসাওয়ালা, ঠেলাগাড়ি, ভ্যান, ট্রাক ইত্যকার পেশাজীবী।

বিক্রয়ের স্থান : স্থানীয়ভাবে পাতা ও পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়। হাট বাজার, গঞ্জ-শহরে, ক্রয়-বিক্রয় হয়। জেলার বাইরে চাঁদপুর এ সামগ্রী বেচা-কেনার বড় বাজার। এ জেলা বড় আকারে রপ্তানি হয় চাঁদপুর, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অনেক বড় বড় শহরে। শীত মৌসুমেই এ ফসল আসে। এ দিয়ে নানা সামগ্রী তৈরি হয়। এ মৌসুমে লক্ষ্মীপুর জেলার হাট-বাজারে বেচাকেনা চোখে পড়ার মতো। ট্রাকে ট্রাকে রপ্তানি হয়। এক সময় লক্ষ্মীপুরের নোয়াহাট, ভূঁইয়ার হাট, দাশের হাট, বসুর হাট, চন্দ্রগঞ্জ, গোইলার হাট, মান্দারী, শান্তির হাট, ফরাশগঞ্জ, নোয়াখালীর ওদার হাট, ঠোকার হাট, খলিফার হাট, বাঁধের হাট ছিল হোগলা পাতার অন্যতম যোগানদাতা ও ব্যবসাকেন্দ্র। এছাড়া বড় বাজার নোয়াহাট, দাসের হাট, ভবানীগঞ্জ বাজার, মান্দারীবাজার, মজুচৌধুরীর হাট,

www.pathagar.com

তেয়ারীগঞ্জ, সাহেবের হাট, করুনা নগর, সুফিরহাট, তোরাবগঞ্জ, আলেকজাণ্ডার, বিবিরহাট, রামগতি বাজার, হায়দরগঞ্জ, রায়পুর, দালালবাজারেও হোগলা পাতা ও পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়। ধাড়ি ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এ হোগলা পাতা ও ধাড়ির (স্থানীয়ভাবে তৈরি বিছানা বিশেষ) অন্যতম রপ্তানিকারক ছিল চাঁদপুর। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় রপ্তানি করা হতো।

শিল্পীরা পুরুষানুক্রমে এ পেশায় জড়িত। শিখেছেন দাদি, নানি, মায়ের নিকট থেকে। এ পেশায় জীবিকা নির্বাহ হয় না। কায়ক্লেশে, অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটে অনেক সময়। একটা ৪-৫ হাত ধাড়ি বানাতে দুদিনের মতো লাগে। নামাজের বড়ুনী, বসার বটনি বানাতে এক, দুই মাদান (বেলা) লাগে। তিন পন পাতা কেনা হয় ৭০-৮০ টাকায়, তাতে ধাড়ি হয় ৩টা। দাম আসে ১২০ টাকা। বানাতে কোনো খরচ নেই, শুধু পরিশ্রম। ৩টা ধাড়িতে লাভ হয় ৪০-৫০ টাকা। দিন-রাত খাটুনি করে ২০/২৫ টাকা দৈনিক আয় হয় জনপ্রতি। হাতে বিকল্প কোনো কাজ না থাকায় তারা এ কাজ করে। এ অঞ্চলের প্রায় বাড়িতেই এ পাতা ও বাইন শিল্প প্রচলিত ছিল ২৫-৩০ বছর আগেও। বাইন ছেড়ে দিয়েছে অনেকেই। সামান্য কিছু হতদরিদ্র মানুষ এখনো এ কর্মে নিয়োজিত আছে।

শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা : এ শিল্পে জড়িত কুঠির শিল্পীরা সবাই মহিলা এবং হত দরিদ্র তার উপর অর্থনৈতিক মূল্য স্বল্পতার কারণে শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা শূন্যের কোটায়।

হাজার-হাজার মানুষ এ ফসল ও শিল্পের সাথে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও এবং এর ব্যবহারিক দিক অনস্বীকার্য হলেও এ পাতাবন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। পাতাচাষি ও শিল্পীদের ভাষ্য অনুযায়ী পাতার ফলন কমে যাওয়া, বাড়ি ঘর তৈরির জন্য পাতবন উজাড় করা, পাতা ও তৈরি সামগ্রী অত্যন্ত সস্তা হওয়ার কারণে চাষিরা পাতাবন উজাড় করে ধান, ডাল, মরিচ এ সমস্ত চাষের দিকে ঝুঁকছে অধিক আয়ের জন্য।

৫ বাঁশ ও বেতশিল্প

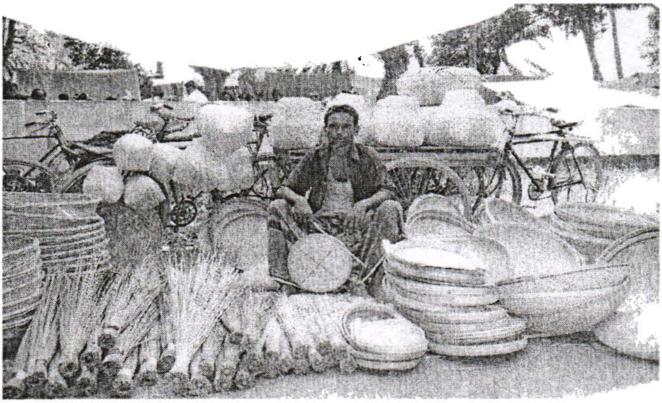

বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র

www.pathagar.com

দাসের হাট বাজারে জনৈক কুটির শিল্পজাত সামগ্রী ব্যবসায়ির কাছ থেকে জানা যায়, জেলার এ অঞ্চলে বাঁশ-বেতের তৈরি গৃহস্থ জীবনের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী সহজেই পাওয়া যায় এবং এগুলোর এখনো ব্যাপক ব্যবহার ও প্রচলন আছে। বাজারে বিক্রির জন্য তিনি নিয়ে এসেছেন লাই, ওঁড়া, খাঁজি, ঢোঙ্গা, খলই, সাজি, কুলা প্রভৃতি। এনেছেন হোগলা পাতার ধাড়ি, বুটুনি, শীতল পাটিও। এগুলোর মধ্যে রূপান্তরিত রূপ পাওয়া গেল মাটি কাটার ওঁড়া, যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলে 'তোয়াইনয়া ওঁড়া', তোড়ার আদি রূপ ছিল বেতের ব্যবহার ও বেত মোড়ানো। এখন বেতের পরিবর্তে প্লাস্টিকের মোটা তার ব্যবহার করা হয়। কারণস্বরূপ উল্লেখ করলেন, এখন আগের মতো বেত পাওয়া যায় না। তাই, বেতের পরিবর্তে ছৈয়ালরা প্লাস্টিকের তার ব্যবহার করছে। তাঁর তথ্যানুযায়ী একটি ওঁড়া কেনা ১৪০ টাকা, বিক্রি ১৫০ টাকা। তিনি এ ব্যবসা সারা বছর করেন এবং তিনি এ ব্যবসায় সন্তুষ্ট স্বচ্ছল। ধাড়ি কিনেছেন নোয়াহাট হতে। বিক্রি করেন দাসেরহাটসহ বিভিন্ন বাজারে। পাতা পাওয়া যায় লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীতে। এগুলো তৈরি করেন মহিলারা। শীতল পাটিও তিনি গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে বাজারে বাজারে বিক্রি করেন। নকসা ও সাইজ অনুযায়ী এর মূল্য হয়। ৪-৫ হাত একটা পাটি নকসানুযায়ী কেনা হয় ৭০০ থেকে ১০০০ টাকা, বিক্রি ৮০০ থেকে ১৩০০ টাকা।

দুলি রাণি

রজনী মিস্ত্রী বাড়ির দুলি রাণি সরকার বলেন, রাতে অবসরে তৈরি করি, স্বামী মিস্ত্রী, রুজা হলে আনন্দ করি। মিস্ত্রীদের ৬ মাস কাজ থাকে না। স্ত্রীদের টাকায় চলে। ঋণ করতে হয় না। মাসে ৮টা বাঁশের কাম করি। মেলার সময় কাম বেশি, বাঁশ কিনি

www.pathagar.com

১৫০ -১৭০ টাকায়। চিনু রাণিকে ২ টাকা করে দেই চালুন বানাতে, এ রকম ২-৩ জন আছে। বোনের থেকে মাসি থেকে শিখি। আমরা বাপের বাড়িতে থাকি ৪ বোন। আমরা ৬ বোন, বাপের বাড়ি মাইজদী আমি ছোট।

ছৈয়াল আবুল কাশেম, আমীর আলী। এরা বাঁশ ও বেত দিয়ে কারু শিল্পের কাজ করেন। দুজনের বয়স সত্তরের উপরে। যৌবনে মাটিয়ালের কাজ করেছেন দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে। এই উদ্দেশ্যে তারা যশোর, ফরিদপুর, সিলেট, রংপুর ও অন্য জেলায় গিয়েও মাটি কাটার কাজ করেছেন। পেশায় বাড়ির নারী-পুরুষ সবাই ছৈয়াল। এখনও বাড়িতে ৭টি পরিবার এ পেশায় নিয়োজিত। বাঁশ এখনও এ অঞ্চলে সহজলভ্য। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এ এলাকায় বাঁশ বাগান রয়েছে। বেত ঝাড় উজাড় হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে সিনথেটিকের পাত ব্যবহার করেন। এদের তৈরি জিনিসের মধ্যে লাই, ওঁড়া, ঝাঁই, খারি, সাজি, কূলা, ডোল, ডাক, খলই, আন্তা, বিঁধি উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান আমল থেকে এরা আজো এ পেশায় জড়িত। নারী, পুরুষ, ছেলে মেয়ে, বউরাও এ কার্যে জড়িত। পাক-আমলে এ বাড়িতে সুতা তৈরি করা হতো। দুটি পরিবারে সুতা পাকানোর চরকা ছিল। জিনিসগুলো বিভিন্ন বাজারে নিয়ে বিক্রি করত যা দিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের জাল, বাটালি, আধা বাটালি, জাল, বুড়ি জাল, হাজাল ইত্যকার জাল বানাত ও গৃহস্থালীর অন্যান্য বাঁধা-ছাঁদার কাজে ব্যবহার করত। স্বাধীনতার পর সুতার বাজার পড়ে গেলে তারা ছৈয়ালি কাজে জড়িয়ে পড়ে যা আজ অবধি এদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। শুকনো মৌসুমে সামর্থ্য ছেলেরা মাটি কাটার কাজ করে। এরা কখনো কোনো সরকারি সহায়তা পায়নি। বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সপ্তাহের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন না। যুগের পর যুগ জীবন যুদ্ধে সংগ্রামী লোকগুলো কখনো স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেননি।

বর্তমান বাজারে ১টা লাইয়ের দাম ১০০-১৫০ টাকা, ১টা ওঁড়ার দাম ৭০-৮০ টাকা, ১টা সাজির দাম ৪০-৫০ টাকা, ১টা খারির দাম ৪০০-৫০০ টাকা, ১টা আন্তার দাম ১০০-৮০ টাকা, ১টা ডোল (মাছের) দাম ৬০০-৮০০ টাকা।

১টা বাঁশে ২-৩টা লাই বানানো যায়। এক দিনে ২টা লাই বানানো যায়। পরিবারের ছেলে, বুড়ো, বৌ-ঝি সবাই এ শিল্পে জড়িত।[৯]

গোয়ালিয়া ডগি, বড় রাস্তার পাশে, দিঘলি বাজারের কালি তলা থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছৈয়াল পল্লী। এখানে কিছু ছৈয়াল বাস করে। দু'শতাধিক পরিবার এ ছৈয়ালি কাজের সাথে জড়িত। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর মিলে হাজারের উপর হবে সদস্য। পাশে বড়ো রাস্তা সংলগ্ন নুরুল্যাপুর মাদ্রাসা তার পাশে অতি প্রাচীন একটি অখ্যাত মাজার অবস্থিত। পুকুরে বাঁশ জাত করার জন্য জাগ দিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়িতে, দাওয়ায় কুটির শিল্পীরা কর্মব্যস্ত।

রূপান্তর : বেতের পরিবর্তে তড়কা বা প্লাস্টিকের পাত।

প্রক্রিয়া : স্থানীয়ভাবে বাঁশ কিনে নিয়ে আসে। এ বাঁশ পুকুরের পানিতে জাগ দিয়ে রাখা হয় ১৫-২০ দিন। প্রয়োজনমাফিক তুলে এনে যে জিনিস তৈরি করা হবে সে অনুযায়ী বেতা তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

বাঁশ-বেত শিল্প তৈরির বিবরণ

উপাদান : বাঁশ, বেত, পুকুর।

বাঁশ নির্বাচন প্রক্রিয়া : যে জিনিস তৈরি করা হবে তার উপযোগী বাঁশের জাত নির্বাচন করা হয়। যেমন : বরো বাঁশ, মুলী বাঁশ, ডুলি- বাঁশ, কাঁচা বাঁশ, পাকা বাঁশ, আধাপাকা বাঁশ, ডেগা বাঁশ। তারপর বাঁশঝাড়ে গিয়ে বাঁশের বয়ক্রম এবং শক্ত/অশক্ত, কাজের উপযোগী কিনা তা খতিয়ে দেখাও প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচন করা হয়।

বেত নির্বাচন : বয়ক্রম অনুসারে।

টোঁয়াল : নতুন, পুরোনো, শক্ত/অশক্ত অনুযায়ী কাজের উপযোগী।

পুকুর : বাঁশের সাইজ ও সংগ্রহ মাথায় রেখে পুকুর নির্বাচন করতে হয়। যাতে বাঁশ (জাত করা) প্রকিয়াকরণ করা হয়।

বিবরণ : নির্বাচিত ও সংগৃহিত বাঁশ ঝাঁড় হতে কেটে এ পানি ভর্তি পুকুরে বাঁশগুলোকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জাগ দিয়ে রাখা হয়। একে 'জাত' করা বলে। কাজের উপযোগী হলে বাঁশ তুলে আনা হয় ও ধারালো ছেনি বা দাও দিয়ে কানা ফেলে দিয়ে ফালি করা হয়। এরপর শিল্পী একটা টেডিয়ার উপরে বসে তাতে ছেনি রেখে ঐ বাঁশের খণ্ড বা ফালিকে পাতলা-পাতলা করে বেতা তৈরি করে। এরপর যে সামগ্রী বা জিনিস তৈরি করা হবে সে অনুযায়ী বিশেষ পদ্ধতিতে বাইন তোলা হয়। বাইন উঠলে সামগ্রীক আকার অনুযায়ী মুড়িয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়। কাঠামো তৈরি হয়ে গেলে বাঁশের মোটা কাইম দিয়ে উপরিভাগের মোড়া তৈরি করা হয়। বেত/টোঁয়াল/প্লাস্টিকের পাত দিয়ে মোড়ার গিট দেয়া হয়। এবার যে জিনিস বানানো হবে সে জিনিসের উপরে ফিট করে বেত বা প্লাস্টিকের পাত দিয়ে চারদিকে মুড়িয়ে মুড়িয়ে ইনটেক্ট করা হয়। ব্যাস ঐ সামগ্রী বা জিনিসি তৈরি হয়ে গেল।

ব্যবহৃত হাতিয়ার : দাও, ছেনি, টেঁডিয়া, মগুর, পিঁড়ি ইত্যাদি।

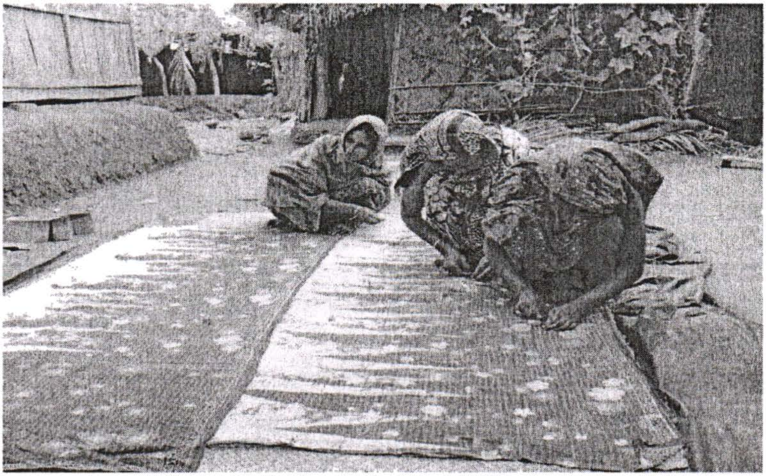

নকশি কাঁথা তৈরি করছেন শিরিন আক্তার

www.pathagar.com

৬. সুচিশিল্প

উত্তর মজুপুরের অজিউল্যা বেপারী বাড়ির ৭ ঘর সুচি কাজ করেন।

রহিমা বেগমের (৩০) বাড়ি রামগতি হাজির হাটের কাছে। ১০-১১ মাস আগে এখানে আসেন। অন্যের ঘরে ভাড়া থাকেন। স্বামী আহম্মদ আলী রিক্সা চালায় । স্বামীর আয়ের জন্য, মেয়েদের (৪ মেয়ে) লেখাপড়ার জন্য এখানে থাকা। গ্রামে আয় নাই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কাজ বেশি হয়, দিন বড় থাকায়। অর্ডারের কাজ করে। পাটি বানায়। ক্রেতারা ঘর থেকে কিনে নিয় যায়।

কাজের বিষয় : কাঁথা (ছোট-বড়), পাঞ্জাবি, ফতুয়া, কামিজ, শাড়ি এম্ব্রয়ডারি ও সেলাই, পাটি তৈরি । সুই, সুতা, কাপড়, আঁকাতে লাগে কলম পেন্সিল। প্রয়োজনীয় উপকরণ:

রহিমা বেগম জানালেন, কাঁথা (ছোট) তৈরি করতে ১৫ দিন সময় লাগে, ৬০-৭০ টাকা পাই, বড়ো কাঁথায় ৩০ দিন লাগে, ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পাই (ডিজাইন করা গুলি)। সাধারণ কাঁথা করতে ৭-৮ দিন লাগে, ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পাই। পাঞ্জাবী বুকে কাজ করি ৩-৪ দিন বা ৮-৫ দিনে, ৩০-৪০ টাকা পাই। ফতুয়ার হাতা ও বুকে, কামিজের নিচের বর্ডার ও বুকে কাজ ৩০-৪০ টাকা করে পাই। শাড়ি ৫ জনে মিলে করি, ১৫ দিনে শেষ হয়, প্রশিক্ষণকালে ৩০ টাকা হারে ১৫০ টাকা পাইছি, কাজ এখন নাই। শিখছি সেভ (এজিও) থেকে। ৩ মাসের প্রশিক্ষণ। এর আগে সাধারণ সিলাই জানতাম। নকশী-টকশী জানতাম না। এ শিল্পের চাহিদা ভালো।[১০]

এ মুহূর্তে তার তৈরি নকশি করা চাদর, টেবিল ক্লথ কাঁথার উপস্থাপন পাওয়া গেল। সখের বশে সে পড়ালেখার পাশাপাশি এ শিল্পকর্ম করে থাকে। এ অঞ্চলে এ জাতীয় ারও সৌখিন কাঁথা শিল্পী রয়েছে যারা পারিবারিক প্রয়োজনে এ শিল্পকর্ম করে থাকে। এটা এ অঞ্চলে পারিবারিক ঐতিহ্যের স্মারক।

উপাদান : কাপড় বা চাদর, সুই, সুতা।

শিরীন আক্তার সখী

www.pathagar.com

তার দেয়া তথ্যানুযায়ী, একটা নকশি-চাদর বানাতে ৪-৫ দিন বা এক সপ্তাহ লাগে। একটা চাদরে খরচ হয় সাদা চাদর (ক্যাম্পাস) ১৫০ টাকা, একশত টাকার সুতা ও সুঁই বাজার মূল্য ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা।

একটা নকশি কাঁথায় সময় লাগে তিন থেকে চার মাস। পরিপাটি করে মনের মাধুরী দিয়ে বানালে ছয় মাসও লাগতে পারে। এ মুহূর্তে যে নকশি কাঁথাটি প্রদর্শিত হলো তা পরিপাটি করে তৈরি করলে বাজার মূল্য হবে দেড় হাজার ১৫০০/- টাকার মতো। এখনো এটার মূল্য আছে ৭-৮ শ। এতে খরচ হয়েছে ২০০ থেকে ২৫০ টাকার কাপড় ও দুই শতাধিক টাকার সুতা। প্রথমে সাদা কাপড়ের উপর কলম দিয়ে নকশা তৈরি করে তার উপর সুঁই-সুতা চালানো হয়। এ কাজ আত্ম-তাগিদ ও সখের বশে করে থাকে সে। নিজের চিন্তা-চেতনা থেকেই শিল্পী এ নকশা ও নকশি কাঁথার সৃষ্টি করেছেন।

শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু : মামী

শিল্পীর কলেজ বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটারের অধিক। সে নিয়মিত পায়ে হেঁটে কলেজে যায় ও ক্লাস করে। এতে সে কষ্ট অনুভব করে না। তার কাছে পড়ালেখা করে মানুষ হওয়াই বড় স্বপ্ন।

৭. লোহাশিল্প

সুশিল কর্মকার

উপকরণ : ১. আইত্তা বাতি (ডোল), ২. কয়লা, ৩. আগুন, ৪. নি ৫. যুগান, ৬. সাড়াসি, ৭. আঁত্তরা, ৮. হাতুড়ি গর্ত করে তাপ দেয় লোহা লাল করি ৯. লবণ ১০. পাট, ১১. জলের গামলা ৬ টা ৬ ধরনের, ১২. হাতুড়ি পাল্লা লাগে, ১৩. লৌহা কাটার ছেনা

www.pathagar.com

১৪. পিড়ি, ১৫. রেত, ১৬. সান পাথর নি কাঠের মধ্যে আটকানো থাকে রেত, রেতের দাম ১৭৫ টাকা। এই দেশে তৈয়ার হয় না।

লোহা কিনে লক্ষ্মীপুর ও চৌমুহনী থেকে। দৈনিক ৪-৫ টা দা বানানো যায়। লোহার কেজি ১২০ টাকা, কাচালোহা। ৭০-৮০ টাকা কাচি ১০-১২ টা বানানো যায়। কোদাল ৮-১০ টা বানানো যায়। কুড়াল ২-৩ টা। দওয়ে লাভ বেশি, চোরতা ২৫০ টাকা।

সুশীল কর্মকার

উৎসব : বিশ্ব কর্মার পূজা, ঐ দিন দোকান কাজ বন্ধ থাকে, দোকান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি, বাড়িতে বাড়িতে যন্ত্রপাতি নিই। ঠাকুর এসে পূজা দেয়। ঠাকুরকে কিছু টাকা দেয়। পূজা হওয়ার আগে সকাল থেকে উপবাস, পূজার পরে খাই। এ পুজা শুধু যারা কাজ করি। বাড়ি লোকদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিমন্ত্রণ করি। ঠাকুর হাজিগঞ্জের উত্তর থেকে আসে (চাঁদপুর)। বেলা ১২টায় পূজা হয়। পরিষ্কার ধুতি পরি। পুজার পর ঠাকুরকে গামছা, টাকা, চাউল দেই। মূর্তি কুমার বাড়ি থেকে কিনি। অনেক সময় মূর্তি কিনি না, ছবি সামনে রাখি পূজা করি। স্বর্ণকার পট্রির সবাই মিলে বাজারে পূজা করে। কীর্তনের সময় চাঁদা দিই। এ ছাড়া আমাদের উৎসব রাস,ঝুলন, দুর্গা পুজা, কীর্তন হয়। জগদীশ চন্দ্র কর্মকার, সুকস চন্দ্র কর্মকার, হরি লাল কর্মকার, কামার বাড়ি, দালাল বাজার।

৮. স্বর্ণশিল্প

এ বাজারে এ মুহূর্তে শতাধিক স্বর্ণ দোকান রয়েছে। ২৫-৩০ বছর পূর্বে ১৫-২০টা স্বর্ণের দোকান ছিল।

বর্তমানে স্বর্ণকারদের কাছ থেকে খুবই কম গয়না তৈরি করানো হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শহর থেকে জুয়েলারি গয়না কিনে আনা হয়।

www.pathagar.com

৯. আয়না বাঁধাই শিল্প

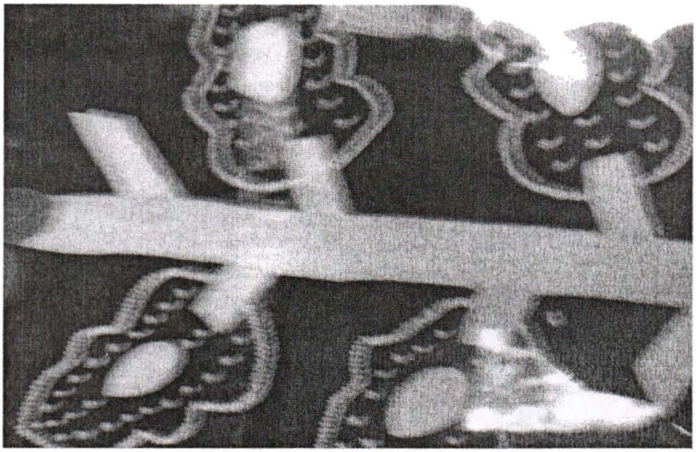

আয়না বাঁধাই শিল্প

আয়নায় শ্লোক লিখে ও নকশা এঁকে ঘরের বেড়ায় বা দেয়ালে টাঙানো হয়। সৌখিন ছড়াকার ও আয়না বাঁধাই শিল্পীরা মোটা কাপড় বা কাগজে আয়না বাঁধাই করে। এক সময় কাঠের ফ্রেম তৈরি ও আয়না বাঁধানো শিল্পী পাওয়া যেত গ্রামের প্রায় বাজারে। এখন এ শিল্পের অবলুপ্তি ঘটেছে। ফ্রেম ও আয়না বাঁধানোর শিল্পী এখন পাওয়া যায় না।

উপকরণ : কাঠের ফ্রেম, আয়না, কালি-কলম, দেয়াশলাই।

আয়না বাঁধাইয়ের শ্লোক

১.

ভুলে যদি সুখি হও ভুলে যাও মোরে
তোমার স্মৃতি চিরদিন রাখিব বাহুডোরে।

২.

এক গাছে দুইটি ডাল দুইটি পাখি লাল
তোমার আমার ভালোবাসা থাকবে চিরকাল

৩.

আমি যদি চলে যাই জীবনের মতন
রেখ মোর স্মৃতি চিহ্ন করিয়া যতন।

৪.

দিনশেষে নেমে আসে শীতল সন্ধ্যা
তোমার সুরভি রয় রজনীগন্ধা।

৫.

নিজ লোক সরে দূরে ব্যবহারের গুণে
পরও আপন হয় স্নেহের বাঁধনে।[১১]

www.pathagar.com

৬.
ভালোবাসি এ কথাটি হয়নি বলা
একই সাথে তোমার আমার হয়নি চলা
তাই প্রেম হলো না বুঝি এই জীবনে।[১২]

১০. নারকেলের ছোবড়ার হস্তশিল্প

নারকেলের ছোবড়া থেকে হাতে বানানো বিভিন্ন ডিজাইনের ম্যাট, পাপোষ ইত্যাদি। অন্যান্য কুটির শিল্প থেকে এটি ব্যতিক্রমধর্মী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

প্রতিমাসে ৫০০০ থেকে ৬০০০ টাকা আয় হয়। প্রতি পিস তৈরি করলে শিল্পী পায় ৩০ টাকা। যখন অর্ডার থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নেই। গ্রামের ভিতর চমৎকার পরিবেশে কাজ হয়। রাস্তা-ঘাটও চমৎকার হওয়ায় মার্কেটিংয়ে কোনো সমস্যা নেই।

এখানে নারকেল, সুপারি ভালো চাষ হয়। নারকেলের ছোবড়া থেকে আঁশ হয়। আঁশগুলো বেনি করে একটা বোর্ডের উপর রেখে কাজ করা হয়। পেরেক, হেমার, সুঁই, হাতুড়ি, কোঁচ, রংয়ের হাড়ি, পিঁড়ি লাগে এই কাজ করতে। তারপর ডিজাইন অনুযায়ী কাজ করতে হয়। একটা পাপোষ তৈরি করতে ২০০/- খরচ হয়, বিক্রি হয় ২৫০/- টাকায়। বছরে ৮-১০ লাখ টাকার অর্ডার হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. তথ্যদাতা : ক. নাম : খুকী বেগম (৩৫), স্বামী : মৃত : মুনীর হোসেন, সন্তান : ৩ ছেলে (অপ্রাপ্ত বয়স্ক), গ্রাম : অভিরামপুর, জীবন খলিফার বাড়ি, ডাকঘর : রামগঞ্জ, শিখেছেন : বড়ভাবির থেকে।
খ. তারিখ : ০৫-০৭-২০১১। স্থান : ১২নং চরশাই ইউপি (সৈয়দপুর), লক্ষ্মীপুর সদর, সময় : ০৩:১৫ মি., নাম : কোহিনুর বেগম (৪০), স্বামী : ইকবার হোসেন (খোকন), পেশা : কৃষি (একসময়ের ট্যাক্সি ড্রাইভার, চট্টগ্রাম), সন্তান : ২ ছেলে ১ মেয়ে, পেশা : চারুকারু (শীতলপাটি), পড়ালেখা : ৫ম শ্রেণি।
গ. তারিখ : ১০-০৩-২০১২। সময় : ১০ টা, স্থান : পূর্ব সৈয়দপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর। নাম : পেয়ারা বেগম,
স্বামী : শাহজাহান, বাড়ি : আবদুল হক মুন্সী বাড়ি, ঠিকানা : গ্রা : সৈয়দপুর, ডাক : রূপচরা, সদর, লক্ষ্মীপুর।
পেশা : গৃহিণী, বয়স : ৪২, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, সংস্কৃতির শাখা : চারুকারু (শীতলপাটি), পিতা-মাতা-স্বামীর পেশা : কৃষি।

২. নাম : প্রদীপচন্দ্র দাস, বিন্দাবন চন্দ্র দাস, মায়া রাণি দাস। ঠিকানা : ঠাকুর বাড়ি, জোড় দিঘির পাড় সমসেরাবাদ, লক্ষ্মীপুর।

www.pathagar.com

৩. খোকন চন্দ্রদাস, স্ত্রীঃ পারুল রাণি দাস, সহযোগী : প্রণতি ও পপী।

৪. যমুনা রাণি দাস (৪১), স্বামী : দুলাল চন্দ্র দাস।

৫. দুলালচন্দ্র দাস।

৬. দক্ষিণ মজুপুর গ্রামের গোপীকৃষ্ণ পাল, রায়পুর বাজারের রামকৃষ্ণ পাল, মোহন বাঁশি পাল, মিনা পাল, রামগতির করণা নগরের চন্দ্র মোহন পাল।

৭. ক. তারিখ : ০৪/০২/২০১২ খ্রিষ্টাব্দ, স্থান : তিতার কান্দি, সদর, লক্ষ্মীপুর, সময় : বেলা ৩ টা।

নাম : জুনি বেগম, বয়স : ৪৫ বছর, স্বামী : লাপাত্তা, সন্তান : দুই ছেলে, পেশা : বাইন শিল্প (ধাড়ি, বিছানা, বটুনী, বিচোইন/ পাখা), গ্রাম : তিতার কান্দি, ডাকঘরঃ পাক রামপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর। (আনার বাড়ি)।

খ. নাম : মোবাশ্বেরা বেগম, বয়স : ২৫-২৬ বছর, স্বামী : মৃত, ১ ছেলে, বাড়ি : আনার বাড়ি, গ্রাম : দক্ষিণ তিতার কান্দি, সদর, লক্ষ্মীপুর, ডাক : পাক রামপুর, পেশা : বাইন শিল্প (ধাড়ি, বিছানা, চাটাই, বটুনী, বিচোইন/পাখা)।

গ. নাম : বাবুল (৫৫), পিতা : মৃত আবদুর রহমান, তিতারকান্দি, লক্ষ্মীপুর।

৮. দুলি রাণি সরকার, রজনী মেস্ত্রী বাড়ি, স্বামী : তপন, পিতা মৃতঃ হরে কৃষ্ণ, মাতা মৃত সখিতারা।

৯. ছৈয়াল আবুল কাশেম, আমীর আলী, তারিখ : ০৫.০৭.০১১ খ্রিষ্টাব্দ, স্থান : বরকন্দাজ বাড়ি, সৈয়দপুর, চরশাই, সদর, লক্ষ্মীপুর।

১০. ১৯.০১.২০১২। রহিমা বেগম (৩০), স্বামীঃ আহম্মদ আলী, অজি উল্যা বেপারী বাড়ি, উত্তর মজুপুর।

১১. তারিখ : ২২.০৭.২০১১ শিল্পী : শিউলী আক্তার (বিবাহিত, বয়স ২৫ বছর), পিতা : সিরাজ মিয়া, মাতা : লোক চিকিৎসক ফয়জুন্নেছা, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : সৈয়দপুর, ডাকঘরঃ রূপচরা, সদর, লক্ষ্মীপুর, স্বামী : রাকিব হোসেন (চাকরিজীবী/ ড্রাইভার), শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি, স্বামীর ঠিকানা : গ্রাম : কাঠালী, ডাক ঘর : দিঘলী বাজার।

১২. তারিখ : ২৪.০৯.০১১ লাইলী আক্তার, আলী আহাম্মদ ছৈয়ালের ঘর, দিঘলি।

তথ্যদাতা : পরেশচন্দ্র পাল, বর্তমান বয়স : ৬৫ বছর, স্থান : খালেকগঞ্জ (দেওপাড়া), তারিখ : ১৪-০৭-০১১, সময় : ০৬:৩০ মিনিট

নকশী কাঁথা (সুই-সুতা) সদর

শিল্পী

নাম : শিরীন আক্তার সখী। বয়স : ২২ বছর।

পেশা : ছাত্রী, জনতা ডিগ্রী কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

পিতা : আবু তাহের। পেশায় জাহাজ নির্মাণ শ্রমিক।

গ্রাম : মদনা

ডাক : পুকুরদিয়া, সদর লক্ষ্মীপুর।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো লক্ষ্মীপুর জেলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য মাছ, মাংস, ডাল ও সবজি। বিভিন্ন উৎসবাদিতে বিত্তশালীরা পোলাও, কোর্মা, রোস্ট ও অন্যান্য উন্নত খাবারের আয়োজন করে থাকে। তারা খাবারের সঙ্গে সালাদ, বিভিন্ন ধরনের আচার ও বোরহানি খেতে পছন্দ করে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মাছ, শাক-সবজি, ডাল ও ভাতে অভ্যস্ত। ডাল সকল শ্রেণির জনগণ অত্যন্ত পছন্দ করে। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য সবজি ও ডাল। মুসলমান সম্প্রদায় সব ধরনের মাংস খায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এখনও মাংস খায় না। তারা মাংসের পরিবর্তে পেয়াজ ও রসুনবর্জিত সুক্তা, তিক্ত ডাল, লাবরা বা পাঁচ তরকারি খায়।

নানা ধরনের ফল যেমন– কলা, আনারস, আম, জাম, কাঁঠাল সকলেই পছন্দ করে। এসব ফল এই জেলাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রামপালের কলা এক সময় বিখ্যাত ছিল। এ জেলার জনগণ পিঠা, পায়েস খুব পছন্দ করে। জেলার লোকজন আগে রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল না। বর্তমানে অধিকাংশ লোকই ভাতের বিকল্প হিসেবে আটার রুটি খায়।

লক্ষ্মীপুর জেলা বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নোয়াখালী জেলার অধিবাসীদের খাদ্যাভাস সম্পর্কে পরিব্রাজক মার্ক পলো ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে বলেছিলেন, এখানকার লোকজন বিভিন্ন ধরনের মাংস, ভাত, দুধ ইত্যাদি খেতে অভ্যস্ত ছিল। এই এলাকা শস্য উৎপাদনের দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। বিভিন্ন ধরনের শস্য, আদা, চিনি এবং অন্যান্য শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো।

জেলার লোকখাদ্যের মধ্যে খেজুরের রস, তালের পিঠা, সানকি পিঠা, চাঁইয়া পিঠা, পুলি পিঠা, ভাপা পিঠা, চিতল পিঠা, মুড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রয়েছে। মেহমান অতিথি এলে ডাবের পানি, পান ও পিঠাপুলি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় সুদূর অতীত থেকে অদ্যাবধি। পা ছুঁয়ে সালামের রেওয়াজ বিদ্যমান। বিশেষ অতিথি এলে বা মেহমানদারীর অতীত ঐতিহ্য এখনো রয়েছে।

এ জেলার সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ হলো পিঠাপুলি। পুরো বছরই এ জেলার লোকেরা পিঠাপুলি খাওয়ায় অভ্যস্ত। নতুন মেহমান আসলে তো তাকে নানা জাতীয় পিঠাপুলিতে আপ্যায়ন করা হবেই। পিঠার জন্য লক্ষ্মীপুর, সারা দেশে এমনকি ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই বিখ্যাত হয়ে আছে। এ জেলায় পিঠাপুলির ব্যবহার বহুবিধ। প্রতিটি ধর্মীয় উৎসবে পিঠা অপরিহার্য উপাদান।

মুসলমানদের রোজার ঈদ, শব-ই-কদর, ঈদুল আজহা, শব-ই-মিরাজ, ইত্যকার ধর্মীয় উৎসবে পিঠা চাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পূজা পার্বণে পিঠা থাকবেই। গৃহস্থ পরিবারে বিভিন্ন পার্বণ যেমন : নবান্ন, পৌষ-সংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, পরব প্রভৃতি

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে পিঠার প্রচলন সর্বাধিক। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিয়ে-সাদীতে সূচনালগ্ন থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলেও বিভিন্ন পার্বণে পিঠা দেয়া-নেয়া হয়। এমনকি নবাগত নাতি-নাতকরদের জন্ম উৎসবে, দাঁত উঠা উৎসবে, দাঁতের পিঠা দেয়া ও পাওয়ার রীতিমতো রেওয়াজ। মৌসুমী পিঠার মধ্যে শীতের তালের পিঠাও অন্যতম।[১]

১. খেজুরের রস

আবু তাহের গাজী (৬০-৬২ বছর) খেজুরের রস পাড়ার কাজে জড়িত ৪০-৪২ বছর ধরে। তিনি বলেন, 'আমি বর্গা চাষি। অর্ধেক কৃষকের অর্ধেক চাষির। ২ দিন অন্তর করি গাছ কাটার কাজ। প্রথমে (হোইলা দিন) আগ কাটা, পরের দিন জের কাটা। ২ দিন ঘানি (বিরতি)। মৌসুম অগ্রহায়ণ মাসে ১ তারিখে ছিল, ১৭ তারিখে আঁড়ি (হাড়ি) দিই।

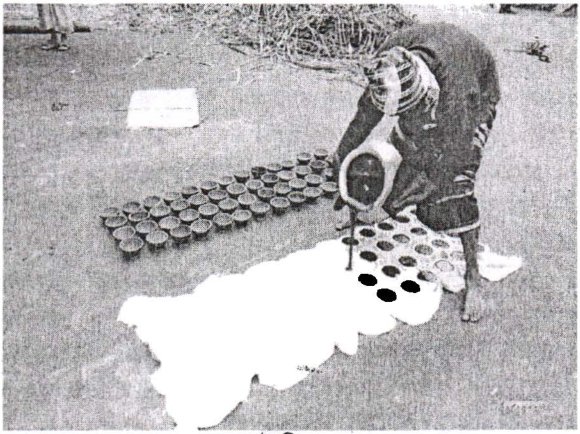

পাটালি গুড়

ফাল্গুন ১৫ পর্যন্ত সময়কাল। প্রতি হাঁড়ি ১২০ থেকে ১৩০ টাকা। ৪০টা গাছ আছে। একদিনে ২২-২৩টা কাটি। প্রতিদিন ১০-১২ আঁড়ি (কলসি) পাই। এর অর্ধেক মালিকের আমি দৈনিক ৬ আঁড়ি পাই। বাড়ি থেকে কিনে নেয়। কোনো কোনো সময় বাজারে নিই।

রসের ব্যবহার : রসের সিন্নি, হিডা পিঠা, জালদি জুরী খাঁজ করি। চাইন্না হিডা, দুঁই হিডা ।সামাজিক মর্যাদা আছে। সমাজে এদের কদর আছে। রসের সময় কদর বাড়ে।[২]

২. পিঠাপুলি

এ জেলার প্রতিটি বাড়িতেই কম-বেশি নারকেল গাছ রয়েছে। পিঠাপুলির অন্যতম উপাদান হলো নারকেল। তারপর কলা, গুড়, চিনি, ছরা দৈ, খেজুর রস-গুড় (রাব),

www.pathagar.com

তালের রস, প্রধান উপাদান ঢেঁকিছাটা চালের গুঁড়ি। এছাড়া জেলার দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে শুঁটকির গুঁড়ি দিয়েই নানা সুস্বাদু পিঠাপুলি তৈরি হয়। এ জেলার সর্বত্রই এখনো পিঠাপুলির প্রচলন রয়েছে যা জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

৩. চিতল পিঠা

উপাদান : চালের গুঁড়ি, নারকেল, লোহার কড়াই বা কড়িয়া। তেল লাগে না। এ পিঠা আবার দুধে ভিজিয়ে তৈরি ও পরিবেশন করা হয়।

তৈরির পদ্ধতি : চালের গুঁড়ি প্রয়োজন মতো পানিতে মিশিয়ে নারকেল কোরা একসাথে গুলে তপ্ত কড়াইতে যত্নসহকারে তাপ প্রয়োগ করে চামচের সাহায্যে তুলে নিতে হয়ে। এরপর পাতে পরিবেশন করা হয়। ঐ পিঠা এমন অবস্থায়ও খাওয়া যায় আবার রাবের সাথে মিলিয়েও খাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে বানানো 'চিতল পিঠা' গুড়ের রসে তপ্ত কড়াইতে টুকরো টুকরো করে কেটে বা ছিঁড়ে দিয়ে আবার রান্না করে সেটি চামচের সাহায্যে তুলে পাতে পরিবেশন করা হয়।

৪. পাটিসাপটা

উপাদান : গুড় বা চিনি, পানি, বাদাম তেল, ভেরনের তেল বা সরিষার তেল, নারকেলের তেলও ব্যবহৃত হয়।

তৈরির পদ্ধতি : গুড় বা চিনি (গুড় পানিতে দিয়ে গরম কড়াইতে রস তৈরি করতে হয়) পানিতে গুলে চালের গুঁড়ি মিশিয়ে তরল অবস্থায় তপ্ত কড়াইতে সামান্য তেল ঢেলে হালকা দ্রবণ চামচের সাহায্যে ঢেলে দেয়া হয়। অল্পক্ষণ পরে চামচের সাহায্যে তা বঁটে বঁটে শীতল পাটি গুটানোর মতো করে যত্নসহকারে চামচের সাহায্যে তুলে আনা হয় ও গরম অবস্থায় পাতে পরিবেশন করা হয়।

৫. ডিমের পিঠা

উপকরণ : প্রয়োজন মাফিক ডিম, চালের গুঁড়ি, পানি, নারকেল কোরা, বাদাম, নারকেল অথবা সরিষার তেল, লবণ।

তৈরির পদ্ধতি : পানির সাথে চালের গুঁড়ি মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করা হয়। সে দ্রবণে প্রয়োজনমতো লবণ, গুড় বা চিনি সমন্বিত করে ডিম ভেঙে দিয়ে ভালোভাবে মিশ্রণ করে তপ্ত কড়াইতে পর্যাপ্ত তেল গরম করে পরিমিত কাই পাঁচ-সাত চামচ আলাদা-আলাদাভাবে ছাড়া হয়। ভাজা হয়ে গেলে চামচের সাহায্যে একটা একটা করে তুলে আনা হয়।

৬. চমচম

উপাদান : গুড় বা চিনি, চালের গুঁড়ি, সরিষার তেল।

তৈরির পদ্ধতি : গুড় বা চিনির পানির দ্রবণ তৈরি করে তপ্ত কড়াইতে তেল গরম করে পাঁচ আঙুলের সাহায্যে ফোঁটা ফোঁটা করে আঙুলের বিশেষ নৈপুণ্যে ছোঁড়া হয়। কড়া ভাজা হয়ে গেলে চামচের সাহায্যে তুলে আনা হয়। এ পিঠাও বেশ সুস্বাদু। তবে খাওয়ার সময় বেশ শব্দ হয়।

www.pathagar.com

৭. খোয়াসাগর

উপকরণ : কাঁঠাল পাতা, গুড় বা চিনি, পানি, তেল, নারকেল কোরা।

তৈরির পদ্ধতি : চিনি, গুঁড়ি ও পানির দ্রবণ তৈরি করে নারকেল কোরা মিশানো হয়। তারপর কাঁঠাল পাতা ঐ দ্রবণে বা মিশ্রণে ডুবিয়ে বা চুবিয়ে আনা হয় এতে কাঁঠাল পাতার উভয় পাশে কাই লেগে থাকে। অতঃপর এই কাঁঠাল পাতা তপ্ত কড়াইতে ফুটন্ত তেলে আলতোভাবে ছাড়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে এই কাঁঠাল পাতা তুলে এনে দুই পিঠের পিঠা আলাদা করা হয়। এ পিঠা খাওয়ার সময় ভাঙ-চুরের শব্দ হয়, যা অতিথিদের নানা রসিকতা ও কথকতার অবতারণা করে।

৮. সানকি পিঠা

উপকরণ : কলা, আইট্যা কলা, তালের দ্রবণ (তাল), বরগ (কলার পাতা), মাটির পাতিল, নারকেল কুচি, পানি, চালের গুঁড়ি।

তৈরির পদ্ধতি : সামান্য পানিতে চালের গুঁড়ি দিয়ে তার সাথে পাকা কলা বা আইট্যা কলা, তালের দ্রবণ খুব গাঢ় করে গুলে গরম কড়াইতে বরগ বিছিয়ে সাথে সাথে ঐ কাই বরগে লেপ্টে দেয়া হয়। উপরেও একস্তর বরগ দিয়ে বটুয়া (পাতিলের ঢাকনা) দিয়ে এমনভাবে ঢাকনা দেয়া হয় যাতে ভাঁপ ঢাকনার ফাঁকফোকর দিয়ে বের হতে না পারে। এরপর আস্তে আস্তে ঐ পাতিলে বা কড়াইতে তাপ দেয়া হয় যাতে পিঠা পুড়ে না যায়। আধ থেকে এক ঘন্টা সময় পর কড়াই তুলে আনা হয়। কড়াই ঠান্ডা হলে ঐ পিঠা তুলে কেটে টুকরা করা হয় ও পরিবেশন করা হয়।

৯. চাঁইয়া পিঠা (মুষ্ঠি পিঠা) বা শীতের পিঠা

পিঠাশিল্পী মাহমুদা আক্তার, পিতা : ডাক্তার মোহাম্মদ উল্যা, গ্রাম : মদনা, ছাত্রী : জনতা ডিগ্রী কলেজ, লক্ষ্মীপুর

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের পিঠা নিয়ে নানা মুখরোচক শ্রুতি, স্মৃতি, স্তুতি, ব্যাজ স্তুতি, ছড়া, ব্রত কথা প্রচলিত আছে। চাঁইয়া বা শীতের পিঠা নিয়ে এমনি একটি ব্যাজস্তুতি প্রচলিত আছে–চাঁইয়া হিড়া মাইয়ার নাম, তারে আমরা খাই না। মূলত এ পিঠা মৌসুমী পিঠার অন্তর্গত। শীতকাল মানেই গ্রাম বাংলার সর্বত্রই এ শীতের পিঠার প্রচলন ও কদর সর্বাধিক। শহরের মানুষও এ পিঠার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। লক্ষ্মীপুরের ধনী-দরিদ্র সব পরিবারেই শীত মৌসুমে এ পিঠা মহা ধুমধামের সাথে তৈরি করা হয়। নতুন আত্মীয়ের বিশেষত নব দম্পতির বাড়িতে এ পিঠা দেয়া এক রকম ফরজ কাজ।

উপকরণ : রাব (খেঁজুরের রস/গুড়), নারকেল কোরা অথবা কুচি চালের গুড়ি।

তৈরির পদ্ধতি : কড়াইতে তপ্ত অবস্থায় খেঁজুরের রসের আধরেয়া (গুড় তৈরির আধা আধি অবস্থায়) বা খেঁজুরের গুড় (রাব) চালের গুড়ি, তারপর নারকেলের কোরা বা কুচি দিয়ে কাইম দিয়ে ঘুটে কাই করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ কাইসহ কড়াই তুলে আনা হয়। ঐ গরম কাই ডানহাতে নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করে পিঠা তৈরি করা হয়। এভাবে সমস্থ কাই পিঠায় পরিণত করে পুনরায় কড়াই বা পাতিলে ভরে আবার উত্তপ্ত চুল্লিতে চড়িয়ে তাপ বা ভাঁপ দেয়া হয়। প্রসঙ্গত ঐ পাতিল বা কড়াইতে এমনভাবে বটুয়া (ঢাকনা) দেয়া হয় যাতে কোনো প্রকারে ভাঁপ ঢাকনার ফাঁকফোকর দিয়ে বের হতে না পারে। তা হলে কাই সিদ্ধ হবে না এবং পিঠার ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে, যে পিঠা খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাঁপের পর ঐ পাতিল তুলে আনা হয় ও পাতিল শীতল হলে আস্তে-আস্তে পিঠা এক এক করে বের করে আনা হয়। প্রসঙ্গত ঐ পিঠার চেয়ে কাই কোন অংশেই কম সুস্বাদু নয়। ছেলেমেয়েরা অনেকেই পিঠার চেয়ে কাই খেতে পছন্দ করে। এমনকি বয়স্করাও পিঠা বানানোর সময় ফাঁকে ফাঁকে ঐ কাই সবাইকে মুখে দিতে দেখা যায়। তাই মায়েরা ছেলেমেয়েদের বলতে শোনা যায়, বাবারা আগে পিঠা বানাই, তোদের লাইয়েনা পিঠা বানাই। কাই খাইলেও তোরা, পিঠা খাইলেও তোরা।

১০. ভাঁপা পিঠা

শীতের পিঠা ও ভাঁপা পিঠার উপকরণ ও পদ্ধতি অনেকটা একই রকম। উভয়েই শীত মৌসুমের পার্বণিক পিঠা। এ পিঠা গ্রামের সমান্তরাল শহরের অলিতে গলিতে, ফুটপাতেও দেদারচে তৈরি হয়। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন ও পিঠা প্রেমিকদের দোকানির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে দেখা যায়। কাঁচা মরিচের ভর্তা দিয়ে এ পিঠা খেতে বেশ মজাদার।

উপকরণ ; চালের দানাদার গুঁড়ি, নারকেল, গুড়।

www.pathagar.com

চিতল পিঠা তৈরির দৃশ্য

তৈরির পদ্ধতি : চালের দানাদার গুঁড়ি, নারকেল কুচি ও খেঁজুরের গুড় মিশিয়ে নারকেলের মালায় (কোরানো মালা) পুরে তা সম্মুখস্থ চুল্লির কড়াইতে বা পাতিলে গলাা পরিমাণ পানি পুরে তাপ দিতে হয়। পানি ফুটতে থাকলে পাতিলের মুখে উল্টোভাবে ঢাকনা দিয়ে তাতে ঐ নারকেলের মালার কাই ঢাকনায় রেখে তাপ প্রয়োগ করতে হয়। অতঃপর সময় বুঝে পিঠা তুলে নিতে হয়। এভাবে এক এক করে পিঠা তৈরি করা হয়। অনুরূপভাবে উল্টো পদ্ধতিতে তা শীতের পিঠার মতো হৈন দিয়ে (পরস্পর সাজানো) পাতিলে রেখে উপরে ঢাকনা দিয়ে রাখতে হয়। সময় বুঝে পাতিল তুলে আনা হয় এবং পাতিল শীতল হলে এক এক করে পিঠা বের করে আনা হয়।

১১. তালের পিঠা

লক্ষ্মীপুর জেলার সর্বত্রই তাল গাছ বর্তমান। সুদূর অতীতেও এ জেলার তালের সুখ্যাতি সর্বজন বিদিত। এ তাল গাছ ও তাল নিয়ে এ জেলায় বহু প্রবচন, প্রবাদ, কিংবদন্তি, শ্রুতি, স্মৃতি, লোক কাহিনীর ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে। এ জেলার সংস্কৃতিতে তাই তাল অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। গৃহস্থালির কাজে তাল পাতার অনন্য ভূমিকা এই সেদিনও ছিল। দরিদ্রজন সাধারণ তালপাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দিত। ঘর তৈরি করতে তালের আড়া ছিল অনস্বীকার্য। এর ডগা অন্যতম জ্বালানী, পাতাও। এর ফল দুভাবে খাওয়া হয়। এক : ডাব, দুই : পাকা তাল। তাল গাছে ভুত-পেত্নী, জ্বীন, দেও-দানো থাকে এমন একটা লোক বিশ্বাস এখনও জাজ্বল্যমান। এর পাতা দিয়ে দরিদ্র ও রসিকজন তালপাতার পাখা তৈরি করে গরমকালে শীতল বাতাসের পরশ নেয়। একসময় যুবকরা ধাবাস ঘুড়ি (ধাউশ) বানাতো, এর পাতা দিয়ে ভোঁড়রা ভেঁপু তৈরি করত। তালগাছের

www.pathagar.com

তড়কা ছৈয়ালেরা কুটির শিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করত। তাল ও তালগাছ নিয়ে রচিত কয়েকটি পঙক্তি :

১. তালপাতার সিপাই।
২. তাল দেওইয়নঞা আছে খাঁড় দেওইয়াইঞা নাই।
৯. তাল দেওইয়নঞা আছে নাইল (নাকেল) দেওইয়াইঞা নাই।
১০. তালের কোঁদার নাইল। তালের কোঁদা।
১১. হোলা যেমন তালের চারা।
১২. ভদ্র মাসে তালের পিঠা- যৌবনকালে স্বামী মিঠা।
১৩. ভাদিয়া তালের মজাই আলাদা।
১৪. তালপাতা ঝিকিমিকি, বন্ধু করে আঁকি- বুঁকি।

উপকরণ : তাল, নারকেল, চালের গুঁড়ি।

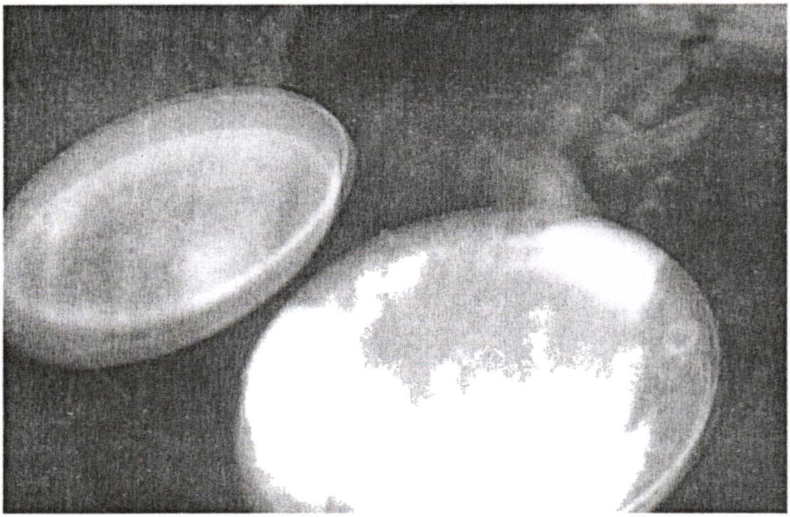

তৈরির পদ্ধতি : পাতিলে প্রয়োজনমত পানি নিয়ে তালের ছোবড়া ছাড়িয়ে পানিতে ফেলে হাত দিয়ে কচলিয়ে যে মিশ্রণ তৈরি হয় তার সাথে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে নারকেল কোরা দিয়ে কাই তৈরি করা হয়। একটা কড়াইতে তেল গরম করে তারপর পিঠা তৈরি করা হয়। কড়াই শীতল হলে পিঠা তুলে কেটে সাইজ করা হয়। অনেকটা সানকির পিঠা তৈরির পদ্ধতি। অন্যভাবে কাই বা দ্রবণ তৈরি করে তালের জলন্ত কড়াইতে তেল পূর্ণ অবস্থায় চামচে এক চামচ এক চামচ করে দ্রবণ বা কাই তেলের কড়াইতে ছোঁড়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে তা চামচ দিয়ে তুলে আনা হয়। তালের পিঠা ছাড়াও, শিরনি, পোলাও করা হয় সুগন্ধী বা সরু চাল দিয়ে। শুঁটকির পিঠা, হাত রুটি, সেমাই, ঝিরা পিঠা, নারকেলের চিড়া, ডালের পিঠা, বড়া ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

পুলি পিঠা তৈরি করছেন পেয়ারা বেগম

পেয়ারা বেগম ; পিঠা শিল্পী (পিঠাপুলি)
পিতা : মফিজ উল্যা মোন্দার
গ্রাম : পূর্ব সৈয়দপুর, চরশাহী, লক্ষ্মীপুর

১২. ঝালপিঠা

মৌসুম : শীত

উপকরণ : আলুর কুচি, কাঁচা লংকা, চালের গুঁড়ো, লবণ, পেঁয়াজ, সরিষের তেল।

তৈরির পদ্ধতি : প্রথমে কয়েকটা আলু দা দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা হয়। এরপর একটি মিশিয়ে পাত্রে নিয়ে প্রয়োজনীয় পানি, লবণ চাউলের গুঁড়ো মিশিয়ে কাই তৈরি করা হয়। কাই প্রস্তুত হলে জ্বালানো উনুনে তেলের কড়াইতে পর্যাপ্ত তেল গরম করে ভেজে ফেলা হয়। ব্যাস, ঝাল পিঠা তৈরি হয়ে গেল। পিঠা শিল্পি মাহমুদার মতে সারা বছরই পিঠা তৈরি হয় পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী। তবে, শীতকালে এ অঞ্চলে খেঁজুরের রস ও গুড় দিয়ে শীতের পিঠা তৈরি আদি সংস্কৃতি। এ জাতীয় পিঠার নাম ছাইয়া হিডা, দুঁই হিডা, মালা হিডা, রসের শিন্নী। পিঠা তৈরি মা, দাদি, নানির কাছ থেকে শিখেছে।[৪]

১৩. মুড়ি

দিপালী বণিকের দুই ছেলে এক মেয়ে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মীপুর। তার শ্বশুর বাড়িতে শাশুড়ির কাছে মুড়িভাজা শিখে বাপের বাড়িতে এসে মাকে শেখায়। সেখান থেকে মুড়ি শিল্পের সাথে জড়িয়ে পড়েন। লক্ষ্মীপুর থেকে মেয়ে জামাই ঘিগজ ধান এনে শাশুড়িকে দিতেন। সে মুড়ি বাজারে ও বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করতেন। শীতকালে

www.pathagar.com

মুড়ির মোয়া তৈরি করে স্বামী ও ছেলে বাড়িতে বাড়িতে বিক্রি করত। বাজারে গঞ্জে নিত। সে সময় শীতকালে দুবেলা এ মোয়া তৈরি করেন। দৈনিক এক দেড়মণ মুড়ির মোয়া তৈরি করেন। ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৩০০-৩৫০ কেজি চালের মুড়ি ভাজতে পারতেন। এখনো এ বয়সে ১০০-১৫০ কেজি চালের মুড়ি ভাজতে পারেন। পদ্ধতি দুচোখে বালু থাকে, দুচোখে চাল থাকে। উপাদান : চাল, বালু (জল-লবণ) পাতিল, ঝাঁঝির, কলার ডগা, চুলা বাউলি। ন্যাকড়া, (মাটির পাতিল)। ধান বাজারুয়া চাল অটো, স্বর্ণাচাল, গুঁটিচাল। ছেলেমেয়েরা এখনো এ কর্ম ও ব্যবসার সাথে জড়িত।

তথ্যনির্দেশ

১. তথ্যদাতা : সুফিয়া বেগম, স্বামী : আবদুল হাই, গ্রাম : সৈয়দপুর, ডাক : রূপচরা, সদর, লক্ষ্মীপুর। বয়স : ৬২ বছর, শিক্ষা : ৪র্থ শ্রেণি, শিখেছেন : দাদি, নানি, মাতা ও শাশুড়ির কাছ থেকে শিখিয়েছেন : দুই মেয়ে ও দুই পুত্র বধূকে।

২. আবু তাহের গাজী (৬০-৬২), পিতা : আহমেদ উল্যা, স্ত্রী : সাফিয়া বেগম (৫৫)। পেশা : গৃহিণী, ওসমান আলী পণ্ডিতের বাড়ি, সাং : টুমচর, ডাকঘর : টুমচর মাদ্রাসা ১ মেয়ে ৪ ছেলে।

৩. মাহমুদা আক্তার : পিঠা শিল্পী (পিঠাপুলি) পিতা : ডাক্তার মোহাম্মদ উল্যা । গ্রাম : মদনা। ছাত্রী : জনতা ডিগ্রী কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

৪. দিপালী বণিক। স্বামী : দুলাল বণিক। শিক্ষা : এসএসসি পাশ। গ্রাম : শ্রীপুর। ডাকঘর : রামগঞ্জ।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

রাত্রিযাপন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও হিংস্র জীবজন্তুর-আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আবাসস্থলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মানুষ। এই আবাসস্থলে অবস্থান করে মানুষ বৃষ্টি-ঝড়-রোদ ইত্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। ঘর নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে স্থানীয় উপাদান-উপকরণ, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি। এর গঠন-কাঠামো ও নকশায় ব্যবহার উপযোগিতার বিষয়টি যুক্ত, একই সঙ্গে নির্মাণের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়ে থাকে। লোকস্থাপত্য বিষয়ে রবিউল হুসাইনের ভাষ্য,"আমাদের দেশের লোকজ স্থাপত্য মূলত গ্রামের ঘরবাড়িতে পরিদৃষ্ট যার ভেতর দিয়ে সাধারণত মানুষের জীবনযাপনের রুচি, ব্যবহারিক চাহিদা সব কিছুর প্রকাশ পায়।"[১]

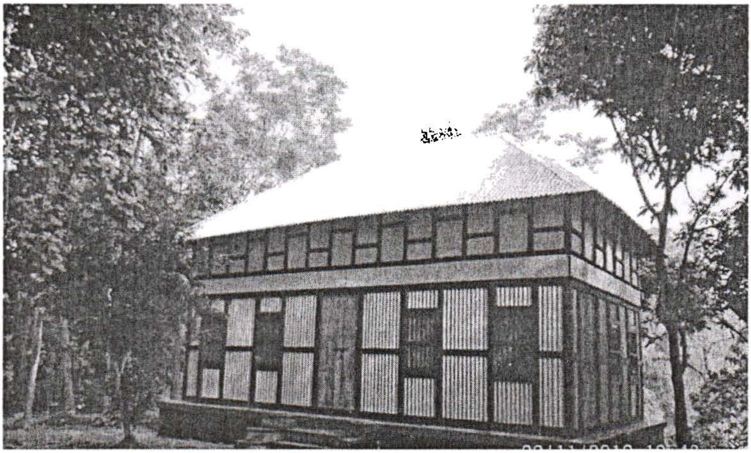

টিন-কাঠ নির্মিত চারচালা ঘর

লক্ষ্মীপুর জেলার ভূ-প্রকৃতি নিচু ও প্লাবনময়। এই জন্য এখানকার অধিবাসীরা মাটি তুলে উঁচু করে বাড়ি তৈরি করে। বাড়িগুলো বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। ভরা বর্ষায় এই বিচ্ছিন্ন বাড়িগুলো ভাসমান দ্বীপের মতো মনে হয়। নিম্ন ও প্লাবনভূমি হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে লোকজন বিদেশে গিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার কারণে এ জেলায় পাকা বাড়ির আধিক্য দেখা যায়। যদিও অধিবাসিরা টিন-কাঠের ঘরে বসবাস

---

১. রবিউল হুসাইন, 'বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ; বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, সম্পাদক শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৬৭

www.pathagar.com

করতে অভ্যস্ত। দেখা গেছে লোহা কাঠ ও উন্নতমানের জাপানি সিটের ঢেউ টিন দিয়ে একটি ঘর তৈরি করতে যে পরিমাণ খরচ হয়, তা দিয়ে ঐ মাপের একটি দালান নির্মাণ করা সম্ভব। লোহা কাঠ দিয়ে ঘর তৈরি এ এলাকার মানুষের প্রাচীন ঐতিহ্য। কোন ভিটিতে ঘর তৈরি করলে বসবাসে আরামদায়ক হয় এ সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে—

'দক্ষিণ দুয়ারি ঘরের রাজা
পূর্ব দুয়ারি তাহার প্রজা
পশ্চিম দুয়ারি তাহার ভাই
উত্তর দুয়ারির মুখে ছাই'।

অর্থাৎ বসবাসের জন্য দক্ষিণ দুয়ারি ঘর সর্বোৎকৃষ্ট আর উত্তর দুয়ারি ঘর সর্ব নিকৃষ্ট।

আবহমানকাল ধরেই এ জেলার কাঠ মিস্ত্রিরা গৃহ নির্মাণে দক্ষতা অর্জন করে এসেছে। তাদের এ দক্ষতা অর্জনের নেপথ্যে রয়েছে বংশপরম্পরায় লালিত শিল্প নৈপুণ্য। এ জেলার মতো শিল্পসুষমামণ্ডিত ঘর বাংলাদেশের আর কোথাও দেখা যায় না বলে অনেকের ধারণা। গৃহনির্মাণ ও বিপণনের জন্য সদর উপজেলার রায়পুর বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র।

দোচালা খড় বা ছনের ঘর

এ ধরনের ঘর সাধারণত দোচালা (দুচাল) আকৃতির হয়। সাধারণত এই ঘরের এক দিকে বারান্দা থাকে। বারান্দাগুলি হয় বেশ উঁচু। কোথাও কোথাও শোলাকার বারান্দাও নজরে পড়ে। দোচালা ঘর সাধারণত নিম্নবৃত্ত কৃষকেরা থাকার ঘর হিসেবে ব্যবহার করেন। এই ঘরের চালাগুলো সাধারণত কাশ, খড় বা ছন দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে। বাঁশ বা সুপারি গাছের বিশেষ কাঠামো তৈরি করে তার উপর কাশ, ছন বা খড়গুলো সারিবদ্ধভাবে বসানো হয়। এ ধরনের ঘরের বেড়ায় এবং মেঝেতে মাটি লেপা থাকে। দোচালা মাটির বা ছনের ঘর তৈরিতে সময় লাগে কমপক্ষে দেড় থেকে দুই মাস। আবহমানকাল থেকেই এ অঞ্চলে সাধারণত ছৈয়ালনামের লোকেরা দোচালা খড় বা ছনের ঘর তৈরি করে আসছে। কোথাও কোথাও বাড়ির সামনের দিকে তৈরি করা হতো দোচালা ছনের ঘর। এই ঘরে দূর-দূরান্ত থেকে আগত লোকজন একটুখানি প্রশান্তির জন্য বসে যেত। এ ঘরে গ্রীষ্মকালে তেমন গরম অনুভব হতো না। তাই লোকজন বসে বসে আড্ডা বা গল্পগুজব করত। বাড়ির সামনের দিকের এ ঘরকে এ অঞ্চলের লোকজন কাছারি ঘর বলে চিনে। বর্তমানে এ ধরনের ঘর আর তৈরি হয় না। প্রায় সকল বাড়িতেই চোচালা টিনের নকশি করা ঘরে তৈরি হচ্ছে। এমনকি টিনের ঘরের প্রচলনও দিন দিন উঠে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে প্রতিটি বাড়ির লোকজন বিদেশে গিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। তারা তাদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে ইট, বালু ও

www.pathagar.com

সিমেন্টে পাকা বাড়ি তৈরি করছে। দৃষ্টি ঘোরালেই প্রতিটি বাড়িতেই দুই থেকে চারটি দালান চোখে পড়ছে। আবার অনেক বাড়িতে দোতলা থেকে তিনতলা দালানের দৃশ্যও চোখে পড়ে।

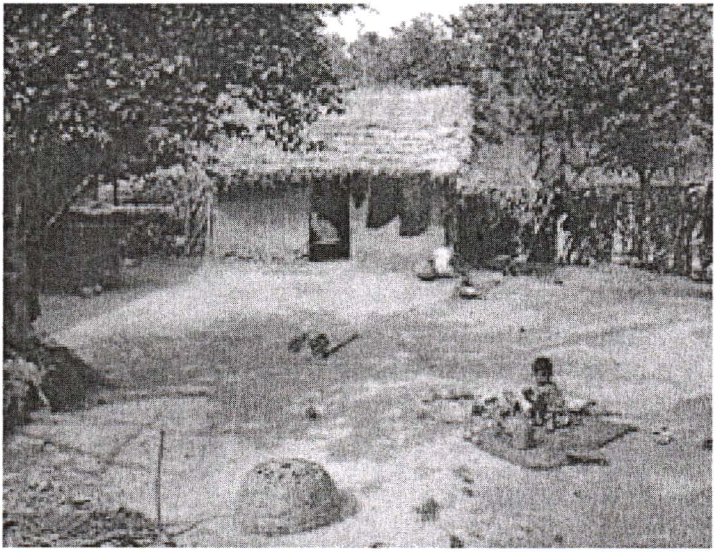

ছন বা খড় দ্বারা নির্মিত দোচালা ঘর

খড়ের পুঞ্জি বা পারা

লক্ষ্মীপুর জেলার প্রতিটি গ্রামের বাড়িতেই খড়ের পারা দেখা যায়। ধান মাড়াইয়ের পর যে খড় উচ্ছিষ্ট থাকে তা রোদে শুকিয়ে বাড়ির উঠানের এক পাশে বা সুবিধাজনক স্থানে খড়ের পারা দেয়া হয়। এ অঞ্চলে একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো 'খড়ের পারায় মানুষ চেনায়'। অর্থাৎ খড়ের পারা দেখে তার সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থা বোঝা যায়। যার বাড়ির খড়ের পারা যতো বড় হয় সে গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা তত ভালো। খড়ের পারার জন্য প্রথমে পরিমাণ মতো জায়গা নির্বাচন করতে হয়। তারপর গোল করে মাটি দিয়ে একটি উঁচু ভিটা তৈরি করা হয়, যাতে বৃষ্টি হলে পানি নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে না পারে। পারা তৈরির পূর্বে মাঝখানে একটি শক্ত খুঁটি পুঁতে দিতে হয় যাতে খগগুলো খুটিটিকে আঁকড়ে থাকতে পারে বা কোনোদিকে হেলে পড়তে না পারে। এরপর সেখানে একের পর এক খড় বিছিয়ে উঁচু করা হয়। উপরের দিকে গিয়ে ক্রমশ একটু একটু সরু করা হয় বা চারদিকে ঢালু করা হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ড়'ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এতে বৃষ্টির পানি অনায়াসেই চারদিকে সহজেই গড়িয়ে পড়তে পারে। একটি খড়ের পারা সাধারণত এক বছরের জন্য নির্মাণ করা হয়ে থাকে। আবার নতুন ধান আসার পর নতুন পারা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

বর্তমানে আবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ঔষধের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেকেই কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য পেশায় জীবীকা নির্বাহ করে চলছে। এখন আর এই খড়ের পারা তেমন চোখে পড়ে না।

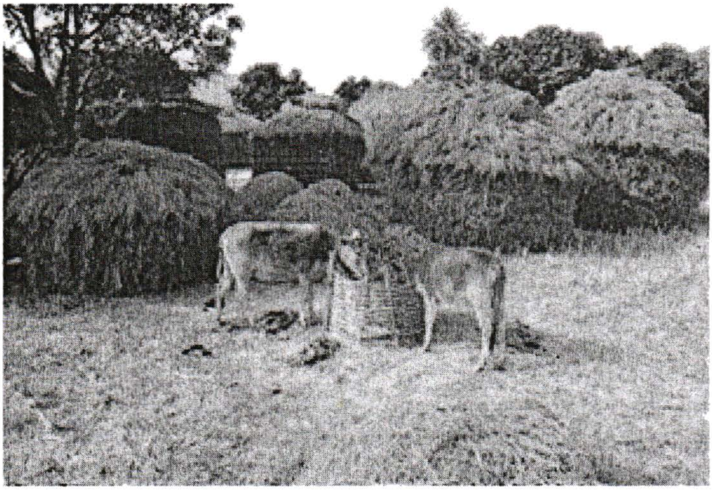

খড়ের পারা

www.pathagar.com

লোকসংগীত

লোকসংগীতের এক বিচিত্র ভুবন ছিল লক্ষ্মীপুর জেলায়। বছরের প্রতিটি মুহূর্ত দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই সংগীতের অপূর্ব মূর্ছনায় এ জনপদ মুখরিত থাকত। অদূর অতীতে হাটে, মাঠে, বাটে, পথে-প্রান্তরে, ঘরে-ঘরে মানুষের মুখে ছিল গান। খেতে যেতে, হাঁটতে যেতে, খেলতে যেতে, জাল বাইতে যেতে, হাল চষতে যেতে, ফসল বুনতে ও ফসল তুলতে, ঘুমাতে যেতে ও উৎসবে প্রতিটি মানুষের কণ্ঠ থেকে অজান্তেই গানের কলির সুর ভেসে আসত। মহিলারা কলসি কাঁখে জল আনতে যেতে, ধান মাড়াই করতে, ঢেঁকিতে ধান ভানার সময়, রানতে কুটতে, কুটির শিল্পের কাজের সময়, সখের পাটের সিকা, শীতলপাটি বুনতে বসে, শীতের কাঁথা সেলাই করতে বসে, শীতকালে আগুন পোহানোর সময়, রাতে মশারি টানানোর সময় গুন গুন করে হলেও সংগীতের লহর তুলত। সারা বছর নানা উৎসব আয়োজনে সংগীতের ভূমিকা ছিল মুখ্য। মূলত (১৯৭১) স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে সামগ্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবর্তনে, প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়নে, উৎপাদন, অবকাঠামো, জীবিকার ব্যাপকতায় এ সমৃদ্ধ জনপদ তার সামগ্রিক পরিবেশ-প্রতিবেশে পরিবর্তিত রূপ নিতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলে এই অঞ্চলের সংগীতেও এর প্রভাব পড়েছে। বিগত শতাব্দি বা বিংশ-শতাব্দিতে এ জেলায় সংগীতের যে ভাণ্ডার ছিল তা সংগ্রহ করা গেলে বোঝা যেত সংগীতের এক সমুদ্র ছিল এই জনপদ। এখনো ক্ষেত্রবিশেষে গীত হয়, অভিনীত হয়, পরিবেশন করা হয় এবং লোকেরা এখনো স্মৃতিচারণ করে।

সাইর, পালাগান, (কবিগান, সরকারী), সারিগান, বাউলগান, ভাণ্ডারি, কীর্তন, জারি, মেয়েলিগীত, প্রাচীন প্রেম-বিবাহ সম্পর্কিত লোকগীতি, ভণিতা, বারমাসী ইত্যাদি জেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীত।

বিলুপ্ত সংগীতের বিবরণ : বিয়ের গান, বয়াতির গজল, বয়াতির বয়াত বা গান, করাতির গান, জেলে সম্প্রদায়ের গান, মেয়েলি গীত, বারমাসী– এছাড়া ধর্ম সম্পৃক্ত বিবাহ কাহিনির সাথে সম্পৃক্ত গান, আদি ভৌমিক বিষয়ক কাহিনির সাথে সম্পৃক্ত গান, কিংবদন্তি কাহিনি সম্পৃক্ত গান, পশু-পাখি বিষয়ক গান, কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ বিষয়ক গান, প্রকৃতি বিষয়ক গান, লোক কবির সমকালিন ঘটনাবলি, অতিপ্রাকৃত, লোক কবিতাসহ নানা আঙ্গিকের সংগীত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্ষীয়ান লোকের কাছ থেকে এখনো এমন অনেক মূল্যবান সংগীত সংগ্রহ করা যেতে পারে তবে তা খুবই সামান্য হবে। কারণ, গায়কেরা নেই, গীতিকার নেই। কালের গর্ভে এরা হারিয়ে গেছে, যা আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

গজলগান - সদর

সৈয়দপুরের ১২ চরশাই ইউনিয়নের আমির উদ্দিন গাজি (ছালাম) সংগীতের সাথে জড়িয়ে পড়ের কৈশোর বয়স থেকেই। বিশেষ করে বিয়ের আসরে গজল গান থেকেই সংগীতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। স্কুলজীবনে রাত্রে চুরি করে গজলকারদের সাথে চলে গেছেন বিয়ের আসরে গান গাওয়ার জন্য। জেলার প্রখ্যাত গজলকার নেছার সরকারের দলের পয়ারী বা দোহার ছিলেন। এদের দলের শিল্পীরা ছিলেন : খাগুড়িয়ার শাহ আলম, আবদুল হাই, গাইজ্জা, মোহাম্মদ, বসুর হাটের আনার উল্লা, আবুল কালামসহ (কাঠালী) আরো অনেকে। বৃহত্তর নোয়াখালীর শত শত জায়গায়, বাড়িতে বায়না করে গাইতে যেতেন। নেছার সরকারের দল ছিল সমগ্র নোয়াখালীতে বিখ্যাত। এ দলের সাথে পাল্লা দিয়ে কোনো দল সহজে জিততে পারত না। গান গেয়েছেন এমন আসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কামার হাট, চৌপল্লী, দত্তপাড়া, দেওপাড়া, দেলিয়াই, দিঘলী, ভবানীগঞ্জ, ছয়ানী, রাজগঞ্জ, রামগঞ্জ, রামগতি, মতির হাট প্রভৃতি অঞ্চলে। সে সব দিনের স্মৃতিচারণ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন সতীর্থ কাউকে পেলে। লোকসংগীত ও সংস্কৃতির অনেক অজানা তথ্য ও ঘটনাবহুল আসরের দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়ান এ বর্ষীয়ান প্রবীণ শিল্পী। সুদীর্ঘকাল এ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক সময় স্মৃতির জাবর কাটেন। গানগুলো এখন আর মনে নেই। তবে, এখনো ঐ শিল্পীদের নিয়ে সংগীত আসর করলে অনেক কিছু মনে আসবে বলে জানান। অনেকেই গান গেয়ে শোনানোর জন্য শিল্পীকে অনুরোধ করে। শিল্পী বললেন, এখন আর এসব গান এভাবে মনে আসে না। গাওয়াও যায় না। একটা ছোটখাটো ঘরোয়া আসর করলে তিনি গাইবেন।

প্রসঙ্গক্রমে 'শাবাল কন্যার গান' সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইলাম। উত্তরে শিল্পী বললেন, এ গান তাঁরা অনেক আসরে গেয়েছেন। তাঁদের কণ্ঠে এ গান শুনে অসংখ্য মহিলা তাঁদের ভক্ত হয়েছিলেন। অনেক মহিলা প্রেমও নিবেদন করেছিলেন এ গান শুনে। শিল্পী বললেন, শাবাল কন্যার ষোল বছরের বর্ণনা পয়ার সহকারে শিল্পী গেয়ে শোনান। শিল্পী বলেন, নেছার সরকারের সাথে আমরা অনেক আসরে এ গানটি গেয়েছি। সে সময়কালের (ষাটের দশক পর্যন্ত) সংগীতের মধ্যে পালাগান বিশেষত কবিগান, যাত্রাপালা, বিয়ের গান ও গজল, বয়াতির গান, পুঁথি ও বাউল গান এ সবের প্রচলন ছিল। শিল্পীদের কদর ছিল সমাজের কিশোর যুবক শ্রেণী এসব গানের ভক্ত ও অনুরাগী ছিল। বুড়োরা তেমন পছন্দ করত না। মহিলারা এসব গান শোনার জন্য পাগল ছিল। অনেকে এসব আসরে এসে গান শোনার জন্য শ্বশুর বাড়ি ও বাপের বাড়িতে ভর্ৎসনার শিকার হতেন। মানসিক ও শারীরিকভাবে অনেক মেয়ে ও বধূ লাঞ্ছিত হয়েছেন পরিবারে ও সমাজে। কাঠমোল্লাদের দৌরাত্মে অনেক আসর ছেড়ে শিল্পীরা পালিয়ে এসেছেন। মারপিট, দাঙ্গা হাঙ্গামাও হয়েছে মোল্লাদের ও সামাজিকদের সাথে অনেক জায়গায়।

এ গজলকারদের অবস্থান ছিল প্রায় প্রতিটি জনপদে। নামকরা দলের মধ্যে ছিল : হাঁড়িয়ার দল, (হাবজপুরিয়া কাইনজাইল্লা) রামগতি, হায়দরগঞ্জ, দিঘলী,

www.pathagar.com

চৌপল্লী, খিলপাড়া, ছয়ানী, রাজগঞ্জ, রঘুনাথ কোম্পানিগঞ্জ, তিতারকান্দি, চাঁদখালী, খাগুড়িয়া (নেছার সরকারের দল), দেলিয়াই, চাটখিল, রামগঞ্জ, দোয়ালিয়া, ঝিরতলী প্রভৃতি ।

এছাড়া কিছু কর্মসংগীত যৎসামান্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : কাঠমিস্ত্রিদের গৃহ নির্মাণের সময় গীত গান, ঘরের চাল-ছাওয়ার সময়ের গান, দালানের ছাদ পেটানোর গান, গাছ কাটা ও টানা বা তোলার সময় বুলি সর্বস্ব গান, শুকনো ক্ষেতে মাটির ঢেলা ভাঙার সময়ের গান, নৌকা তৈরির সময় নৌ-শিল্পীদের গান, পালকি ও বেয়ারাদের গান ইত্যাদি।

ক. কবি গান

১

সরকার জান না, মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না (২)
হাইল্লার বাকামি ভাইরে যদি থাকে হাল
জাইল্লার বাকামি ভাইরে যদি থাকে জাল
বাতির বাকামি ভাইরে থাকিলে কাছারি
বাগিছার বাকামি ভাইরে বৃক্ষ নারি-সারিরে
সরকার (দোহারি) জাল মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না (২)
আইলার কাঁধন নাঙ্গল জুলাইল, জাহিল্লার কাঁধঅ হনি
আইজগার ধুয়া বেশকম অইলে খুরাই মরিয়ন কোনি গো
সরকার দোহারি, জান না মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না।
রসিকের বাকামি ভাইরে মাথাভরা চুল
রসিকের বাকামি ভাইরে কামে হুলস্থুলগো- সরকার
দোহারি : জান না মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না (২)
কিষানের বাকামি ভাইরে হালের বড়ো গরু
মিথ্যুকের বাকামি ভাইরে কাইলগার কতা হোরু
মুসাফিরের বাকামি জান খেরে হাতে হোতেন
কুত্তার বাকামি ভাইরে ধ্যাঙ্গ তুলি মুতন গো।
দোহারি : সরকার জান না, মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না (২)
কলির ডাইলের মান উডাইছে বত্তা হেড়ুয়া খাই
বৈতালীর মান উডাইছে ঘর জানাই জোরাই
কাছারির মান উডাইছে মুসাফিরে হুতি
লেপ-তোশকের মান উডাইছে নোয়া বোয়ে মুতি গো
দোহারি : সরকার জান মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না (২)
ভদ্র লোকের মান উডাইছে হোলা হাইন জোরাই
সরকারির মান উডাইছে যেতে হেতে গাই
লেংটা হোলায় ডর লাগাইছে বুড়ারে চোক গোরাই

www.pathagar.com

কবিগানের মান উডাইছে কলের গান জোরাইগো
দোহারি : সরকার জান না, মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না (২)
ওরে,
হোলার গাত দেয় হাওয়াই শার্ট, বাপের কোত্তা নাই
কলিকালের হাওয়া বইছে উল্টা দাঁড় কোবাই
আমনা কতা হরে রে কইলে তারে কই যে হর
ওরে,
চৈত্র মাসে খ্যাতা গাত দিলে তারে কয় যে জ্বর
দোহারি : সরকার জান না, মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না (২)
চোরের বাকামি ভাইরে না পড়িলে ধরা
ফসলের বাকামি ভাইরে না পড়িলে খরা
সরকারের বাকামি ভাইরে কতার মালাগাঁথা
গাছের বাকমি ভাইরে অগতির পাতা
দোহারি : সরকার জান না, মান্দারে ফুলে মধুগো মিলে না (২)
আসরের বাকামি ভাইরে বসি থাকা চুপ
মনের আগুনে পোড়ে খেরের হারার ধুপ
বিড়ালের বাকামি ভাইরে জ্যান্ত ইঁদুর ধরা
ভক্কা ধোরি বআস্যা থাকা চোখের পহরা গো সরকার দোহারি-ঐ
এরে,
বাঘের বাকামি ভাইরে হরিণ ধরা তার
রাজরানির বাকামি ভাই অষ্ট-অলংকার
কবির বাকামি ভাই কতার গ্যাছ লাগান
এরে,
বদিল্লার গবুরে বলে বুট-মুরি খানগো সরকার
দোহারি : জান না মান্দার ফুলে মধুগো মিলে না (২) ঐ।[১]

টীকা : হাল্লা-হাল চাষা। বাকামি-দক্ষতা, গর্ব, ক্রেডিট। কাছারি-কাচারি, বৈঠকখানা। আইল্লা-হাল চাষা। হনি- জোয়াল। আল-হাল। হানি-পানি। কাইল-কাল। কাইলগার কতা-গতকালের কথা। হোরু- পড়ুশু। খের-খড়, ধানের বিচালি। খেরে-হাতে খড়কুটায়। হোতন-শোওয়া। মুতন- প্রশ্রাব করা। হেড়ুয়া- পেটুয়া, ভূই। বৈ-তালী-কিশোরী, কিশোরী বধূ, কন্যা। হুতি- শুই, শুয়ে। নোয়া বো-নববধূ। উডায়ছে-উঠিয়েছে, খর্ব করেছে। হোলা-হাইন-পোলাপান। যেতে-হেতে যে, সে। চোকগোরাই-চোখ রাঙিয়ে। গাত দেয়- গায়ে পরে। কোত্তা- জামা, শার্ট। কতা- কথা। হর- পর, অপর। খ্যাতা-কাঁথা। খরা- আকাল, অনাবৃষ্টি। খেরের হারা- খড়ের পারা। বদিল্লা-কামলা। বদিল্লা গাবুর-কামলা যুবক।

(কবিয়াল হারান শীল ও তার দল। প্রতিপক্ষ : নেছার সরকার, মুনা সরকার, লাল্লা সরকার ও তাদের দল। দিঘলী বাজার, সদর, লক্ষীপুর।)

www.pathagar.com

নেছার সরকার : ধুয়া

তোরা, তল ছেগানি চেগাই ধর নাপিতের হুত হইছে বালাস্টর- দোহারি- ঐ
কাইল বেয়ানের বৈরাগি আইজ ভাতেরে কয় হস্বাদ দোহারি
কহিলে বেয়ানের বৈরাগি মাইজ ভাতের কয় হস্বাদ
পাদের লগে উড়াই দিয়ুম দুনিয়ার হেই মাতাত
মুনায় সরকার করে তার বাবা মাস্টার।
দোহারি : তোরা ছেগানি চেগাই ধর নাপিতের হুত হইছে বালাস্টর (২)
বোগলের তল উল্টাই দেখ কি কামান কামাইছে
দোহারি : রাত দুপুরে আমারে ছুঁই পুষ্কুণ্ডুতে নামাইছে
তিন মাতা এত্তর কোরি পুষ্কুন্ডিতে কাঁপে থরে-থর।
দোহারি : তোরা তল ছেগানি চেগাই ধর নাপিতের হুত হইছে বালাস্টর। (২)
নাপিত যদি কুপিত হয় গাল কাটিয়া যায়
দোহারি : বিশ থেকে তিরিশ হলে বোগল বাজায়।
পেঁচারে কয় লক্ষ্মীসোনা, জোনাক পোকা শশধর
দোহারি : নাপিতের হুত হইছে বালাস্টর (২)
তারা তল ছেগানি ছেগাই ধরচ। ঐ
পেঁচা ধোরি পূজা করে হনুমান কয় দেবতা
দোহারি : ক্ষুর-কেঁচি আর চিরণিতে জীবনের খাতা।
আমের চেলি করি কালি শ্মশানে যাই চাবি ধর। ঐ
দোহারি : নাপিতের হুত হইছে বালাস্টর (২)
তোরা হলছেগানী চেগাই ধর নাপিতের হুত হইছে বালাস্টর।

টিকা : ছেগানি–আলগা করা। তল ছেগানি চেগাই ধর– নিচের কাপড় তুলে ধর। হুত- পুত, পুত্র। কাইল বেয়ান- গতকালের সকাল; গত কালকের। হস্বাদ- প্রসাদ। হেই মাত- মাথায়, সেই প্রান্তে। বালাস্টার-ব্যারিস্টার। পুষ্কুণ্ডি-পুকুর। এত্তর-একসাথে।

হারান শীল : ধুয়া

হারান কথা কয় প্যাছে–ওছে আর নেছে
দোহার : হারান কথা কয় প্যাছে–ওছে আর নেছে
হারান : নাছতে না জাইনলে মাগি শুধু হোঁদ ঘুরায়।
দোহার ...(২)
হারান : কথা কয় প্যাছে–ওছে আর নেছে নাইছতে না জানিলে মাগি শুধু হোঁদ-ঘুরায়।
হারান : এরে পণ্ডিতে পণ্ডিতে পড়লে করে আলাপন (২)

www.pathagar.com

মূর্খ-পণ্ডিতে পড়লে বাজে ঠনাঠন, হারান...
দোহারি : হারান কথা কয় প্যাছে–ওছে আর নেছে নাইচতে না জানিলে মাগি শুধু হোঁদ ঘুরায়। ঐ
হারান : এরে, পিঁপীলিকার পাখা গজাইলে মোক্কা যাইতো চায় (২)
এরে, হেঁচ্ছা ভাইয়ে লাগুড় পাইলে মাদিনা দেখায়
দোহার...
হারান : এরে, ভুল করিয়া আইয়া পড়িলে বাঘের খাঁচায়।
দোহার : নাইচতে না জাইনলে মাগি শুধু হোঁদ ঘুরায় (২) ঐ
আবার : এরে, চৈদ্দগুষ্টি বদিল্লা তোর আইলি কৈত্তে সরকারি
দোহারি : বাধি বাড়ি খাই হালাইয়্যুম আইওহা তরকারি রে
দোহারি : ...তরকারি
হারান : বাড়ির দিগে চলি যা গৈ তোরে আইজগা শৈন্যে ঘুরায়
দোহারি : নাইছতো না জাইনলে মাগি শুধু হোঁদ ঘুরায় (২) ঐ
হারান : এরে, হেচ্ছার সাধ হইছে রাজা হইবার, দোহার...
এরে, জলন্ত কড়াইতে পোড়া এ দেহ তাহার
দোহারি...
হারান : এই মাছরাঙার সৌন্দর্য দেখি হিংসায় জ্বলি যায়
দোহারি : নাইছতে নো জাইনলে মাগি শুধু হোঁদ ঘুরায় (২) ঐ

কবিয়াল হারান শীল

মালেক রব্বানা, চড়ুয়া মুন্সি চইলছে গো মদিনা (২)
দোহারি...
হারান : এরে ; গাধার পিঠে– পুথে– দিলে হয় না সে সায়ের
ঝামা দিয়া মাজলে কাউয়ার রং যায় না গায়ের গো মালেক
দোহারী : রব্বনাা চড়ুয়া মুন্সী চইলছে মদীনা (২)
হারান : এরে, লেজের মধ্যে পুচ্ছ দিলে কাকে হয় না ময়ূর
মদীনা তো দূরের কথা, দিল্লী বহু দূর গো মালেক
দোহারি : রব্বানা- ঐ
এরে ছবক নেয়ার আগে কেরে বুজুর্গ হইল
মন্ত্র শিখার আগে সাপুড়ে সর্পতে মরিল রে–মালেক রব্বানা
দোহারিঃ চুড়ুয়া মুন্সি চইলছে গো মদীনা (২)
এরে, সর্প ধরার আগে ভাইরে বিদ্যা জানা সার
অবিদ্যায়তো জান বাঁচে না হইলে দরকার গো মালেক
দোহারি : রব্বানা চড়ুয়া মুন্সী চইলছে মদীনা। ঐ[২]

www.pathagar.com

টিকা : ওছে-নেছে=উপরে-নিছে, সাবির্কভাবে। হোঁদ-পাছা। বাজে ঠনাঠন-তাৎক্ষণিক জড়িয়ে পড়ে। হেচ্ছা-এক প্রকার কালো পাখি বিশেষ। বদিল্লা-কামলা। কৈত্তে-করিতে। খাই হালাইয়ুম-খেয়ে ফেলব। আইন্ন্যা তরকারি-লবণ ব্যতীত তরকারি। শৈন্যে ঘুরায়-শনির দশায় পড়া, বিপদ সংকেত। চড়ুয়া মুন্সি : চড়ুয়া, কম ভক্ত মৌলবি। কাউয়া-কাক। অবিদ্যায়-বিদ্যাহীন।

কতিপয় ধুয়া

আহারে মোর পাগলা ঘোড়া রে-ঘোড়ায় দিক নির্দেশ মানে না, যাইতো কই নাম মো সোনাইমুড়ি ঘোড়া চইলছেরে নদনা। হারান শীল।

চরুয়া ঘোড়ায় খাইছে চনাবুট, হোলের তলে হুতি রইছে আস্ত একটা বাইল্লাহুট, চরুয়া ঘোড়ায় খাইছে চনাবুট। হারান শীল

সাদের কলমির লতা, লাগবো লেঠা পানি শুকাইলেরে স্বাদের কলমির লতা। হারান শীল।

হারুন বাড়ির যাগে ভাত খাই আগে গাইল্লাইবো তোর মায়-রে। হারান শীল।

কইলকাত্তায় লাগছে আগুন, ঢাকা শহর পোড়া যায়-সীতাকুণ্ডে উঠছে ধুমা ফেনির দিগে ধায়।

টিকা : নদনা- স্থান বিশেষ। হোলা পুল-সেতু। হুতি-শুয়ে।[৩]

৩

নাতিন যাইও না, যাইও না কেলা বাগানে
সোন্দর মুখে চুম্মা দিব রসিক তিন জনে
নাতিন যাইও না। ঐ
এরে, নাতিন আমার রূপ-সুন্দরী রাস্তা দিয়া যায় (২)
লাজে-শরমে কয় না কতা ইশারায় বোলায়, নাতিন যাইও না (ঐ)
এরে, নাতিন আমার গুণবতী রাইনতো জানে ভালা (২)
হোঁদের ঠেলায় হালাই দিছে রসি ঘরের হালা
নাতিন যাইও না। ঐ
এরে, নাতিন কোনাই যান, কোনাই যান
খাড়াই কতা হন
অনেক দিনে হান খাবাইলি কোডরাত নাই চুন।
নাতিন যাইও না। ঐ
(কবিয়াল-গীতিকার : হারান শীল)[৪]

৪

কি প্রেম শিখালি রসিক জাইল্লারে।
আগে ছিলাম ব্রাহ্মণের মাইয়া, ও হায়রে করতাম শিবের পূজা

www.pathagar.com

তুই জাইল্লার সনে পিরিত কোরি কাড়ি জালের হুতারে।
কি প্রেম শিখালি জাইল্লারে।
জাইল্লা যায়রে মাছ ধোরিতে
খালে আরো বিলে
বালিশ নেয় না, ক্ষেতা নেয় না, জাইল্লা মরে তিলে তিলে রে।
কি প্রেম শিখালি জাইল্লারে।
জাইল্লার মাতায় জালের হোজা, আমার মাতায় খারি
দুই চরণ ভিজিয়া পড়ে হুঁছা হুড়ির হানিরে। ঐ
(সংগৃহীত গান : টপ্পা -আঞ্চলিক প্রতিশব্দ টক্কা গান, খেমটা-খিস্তি-খেউড়)

অর্থ : কাটি-কাঠি। হুতা-সুতা। মাতায়-মাথায়। হচা-পচা। হুঁটি-পুঁটি মাছ। হানি-পানি।[৫]

ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে জেলের সাথে প্রেম করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দুই বিপরীত জীবনের প্রতিচ্ছবি বিধৃত হয়ে আছে এই গানে। রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। গীত হয়ে আসছে পরম্পরায়।

৫

ও হোরে রসিক নাইয়া, তুই আমারে করলি দেওয়ানা।
লক্ষ্মীপুরের মাডি ভালা, নারী সোন্দর পুরুষ কালা
ওরে সেই নারীয়ে পুরুষ মানে নারে রসিক নাইয়া।
লক্ষ্মীপুরের মাডি খাডি কতা উঠে মাড়ি হাডি
ওরে সেইখানে অলক্ষ্মী জম্মে নারে রসিক নাইয়া । ঐ

৬

রাইত হোয়াইছে, রাইত হোয়াইছে রাতায় দিছে ডাক
রাইত হোয়াইছে, রাইত হোয়াইছে কুরুয়ায় দিছে ডাক
হোলা-মাইয়া চেলাইদেগৈ বাইল টোগাইতো যাক।
আম টোগাইতো যাক।
যাইয়ুম যাইয়ুম বিয়ালে,
মোরগ নিছে হিয়ালে
মাইজ্জাবি গো মাইজ্জাবি মোরগের ছাগুন কোনআনদি
গুলে আর বেজিয়ে, কাউয়ায় চোলাই- বোলাই খাক।[৬] ঐ

৭

প্রশ্ন : জমিনে নাই কোনো দুই মরা
আশমানে নাই কোনো দুই তারা

www.pathagar.com

সাগরে নাই কোনো দুই মাছ
পাহাড়ে নাই কোনো দুই গাছ
পারলে উত্তর দি তুই বাঁচ ॥
হারান শীল ও তার দল:
উত্তর খুঁজিয়া দেখ তুই নিদানে

* * *

সকল প্রশ্নের উত্তর পাবি দ্বিন দুনিয়ার বিধানে।
উত্তর ... (ধুয়াকার)
চতুর্থ আসমানে ইসা (নবি) ঘুমাইয়া রয়
তিনার লাশ জান দুনিয়াতে নয়। উত্তর (ধুয়াকার)-ঐ।
শিশু নবি বেহেস্তে যাই ফিরিয়া না আসিল
তিনার জ্যান্ত লাশ সে খানে রহিল রে উত্তর ...(দোহারি)।
চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত ঘোর অন্ধকার
নুহের প্লাবনের কথা শুন সমাচার
তামাম জাহানে কোনো আলো নাহি ছিল
চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা সকল পলাইল
কিস্তির দুই গলুইতে ভাই দুই তারা আছিল
চল্লিশ দিন পর সেই তারা অন্তহিত হইলো- রে
উত্তর (ধুয়াকার)
আসমানে নাই সেই তারা, নাই তো জমিনে প্রশ্ন করিল এক নাপায়া কমিনে রে।
উত্তর (ধুয়াকার)
মুসা নবির হইল সাধ সকল প্রাণীরে
একবেলা খাওয়াইবে খানা আপন মন্দিরে
গাঁয়েব পরওয়ার দেগার-এর কাছে মুসা আরজ করিল
আরজ শুনে আল্লাপাক নিষেধ করিল
তবু মুসা হাল ছাড়ে নাই আল্লার খাতের, দাওয়াত করিল সবে খাস দাওয়াতের ছয় মাস ধরিয়া মুচায় খানা পাকাইল, সাগর হইতে দুই বাইন উঠিয়া আসিল।
দুইজনে দুই লোকমা খাইলে খানা যায় পুরাইয়া, কান্দে মুসা জমিনেতে বুক থাপাইয়ারে।
উত্তর (ধুয়াকার)
চেজদায় পড়িয়া মুচা কান্দে জারে জার
আমার গুনা ক্ষমা কর আপে-পরওয়ার ঐ

www.pathagar.com

দুই মাছেরে জিজ্ঞাসা করে মুচা জানতে পায়
প্রতিদিন এভাবে তিন বার খোদায় যে খাওয়ায় রে। ঐ
সেই না দুই মাছ ভাইরে সাগরেতে নাই,
বেহেস্তে রাখিছে তাদের আপে আল্লা সাইরে। ঐ
পাহাড়ে নাই দুই গাছ শুন বিবরণ,
নুহের কিস্তির তক্ত সেই অমূল্য রতন
সেই ও না গাছের বিজ জমিনে না হয়
বেহেস্তের গেট হবে সেই বৃক্ষদ্বয়ের। ঐ (ধুয়াকার)[৭]

খ. খিস্তি-খেউড়

১

ও রঙ্গের ঝিয়ারি
প্রেম রঙ্গের আচার খাইছ নি (২)
জল পিপাসায় বক্ষ ফাটে
কুয়ার পানি পাইছ নি। ঐ
স্বর্ণকারে স্বর্ণ চিনে লোহা চিনে কামারে
ভালোমন্দ নাই ভেদাভেদ জেলে আর চামারে
আসরে নামাইলা কেন অসময়ে আমারে। ঐ
রসিকে রসিক চিনে, ভোমরা চিনে মধু
গরুর রাখাল চিনে কলির ডাইল আর কদু
তালই মজে না তালের রসে ফিরে
ও কি রঙের ঝিয়ারি
প্রেম রঙ্গের আঁচার খাইছ নি।[৮]

২

ঝিয়ারি আর তালির পিরিত লোকে করবে কানাকানি
হয়ে গেলে জানাজানি।
ঝিয়ারি কয় তালির কাছে
বিড়াল উড়ে মান্দার গাছে
এগো মই না থাকলে হাতের কাছে
পরিণাম তার হবে কি।

www.pathagar.com

লোকে-লোকে কানাকানি
হয়ে গেলে জানাজানি। (২)
তালির কাছে প্রশ্ন করি
না পাইয়া প্রাণের হরি
রাধা কি গো গেল মরি
উত্তর কি গো দিবানি। ঐ
ঝিয়ারি কয় তালির কাছে
হোঁদের কাছে খন্তা নাছে
কয়দিন বাঁচার আশায় আছে
চোখে নাছে জোনাকি। ঐ[৯]
কবিয়াল তারাণ শীল।

গ. দ্বিন-দুনিয়ার জারি

প্রথমে বিসমিল্লা নাম তারিফ আল্লার
বন্দাতেরা গান্দা আমি অতি গোনাহগার
লইয়া পাপের বোঝা মাথার উপর
মাফ করো মাফ করো খোদা; তফছির আমার
তুমিতো মকসুদ মেরা সকল কামেতে
পুরা কর সব কাম তেরা ফজলেতে
তেরা খুশি হয় মাওলা যেই কাম করে
সেখানে কায়েসে মাওলা রাখিবে আমারে
আমার মতলব খালি রাজি যে তোমারে
ইহা ভিন্ন নাহি কিছু খায়েস আমার
তোমার উপরে আল্লা ভরসা আমার
তাওয়াক্কাল করি খালি তোমার উপর।
দুনিয়া আখের আমি সকলি ছাড়িনু
তেরা দিদারের লাগি আসক্ত হইনু
বড় নেয়ামত আল্লা তোমারি দিদার
নেয়ামত কর পুরা আমার উপর।
তেরা মহব্বত খালি সেবা মতো হবে
আর কারো মহব্বত দেলে না আসিবে

www.pathagar.com

মারফতের নূর দিয়া কলবও আমার
রওশন করো আল্লা ফজলে তোমার
তোমার এস্কের আগুন কলবে আমার
জ্বলাইয়া দেও আল্লা কর্মে তোমার
বাদশাহি না চাহি আল্লা, না চাহি জগৎ
আমি মাত্র চাহি তেরা দিদার জগৎ।
আল্লা পাক তুমি পরওয়ারদেগার
আম্বিয়া, আওলিয়া যত মাহবুব তোমার
ইহাদের খাতেরে আর তোফায়েলের চুল
খাকছারের দোয়া আল্লা করহ কবুল।
ডরিত কম্পিত আর আজেজ হইয়া
হাত উঠাই আল্লা কান্দিয়া-কান্দিয়া
খাতা ও কসুর মাফ কর মেহেরবান
হোমতে তোমার নাম রহিম রহমান।
জেন্দেগি করিনু পানি নাফরমানিতে
পাহাড় অধিক গুনা হইয়াছে তাতে
গুনার পাহাড় আল্লা মাথায় লইয়া
তোমার দুয়ারে কান্দি মাফের লাগিয়া।[১০]
সাখাওয়াত উল্লা (ছাকু সরকার)

ঘ. ছয় দফার গান/বঙ্গবন্ধুর গান

হইরে কোথায় রইলা বঙ্গবন্ধু নাইয়া
সোনার বাংলায় নাও বাইয়া যাও ছয় দফার সুর লইয়ারে বঙ্গবন্ধু নাইয়া।
বাতাসেতে আসছে বইয়া তোমার ছয় দফার সুর
এগার দফা সঙ্গে লইয়া হইয়াছে মধুর রে বঙ্গবন্ধু নাইয়া। ঐ
সাত সমুদ্র তের নদী আসলা তুমি বাইয়া
আমরা সবাই রইলাম বসি তোমার দিকে চাইয়া রে বন্ধু। ঐ
সোনার বঙ্গোপসাগর বন্ধু তোমার সোনার বাংলা নাও
সোনার বাংলায় নাও লাগাইয়া চাষির পানে চাও
সোনা মুখের সোনার বাণী যাওরে শুনাইয়া
চাষি সোনার দেহ করলো মাটি তোমার লাগিয়ারে

www.pathagar.com

কোথায় রইলা বঙ্গবন্ধু নাইয়া। ঐ[১১]

সাখাওয়াত উল্লা (ছাকু সরকার)

ঙ. গজল

১

ছিল সেই ফুল আরশেতে পঞ্চ পিরিতে, ছিল মধুভরা ফুলে
ফুটিল ফুল মক্কায় চৌদিক তার সৌরভ যায়।
অন্ধকার সাত মহলে বাজলো নূরের ডেরা
ফুলে ছিল মধুভরা (২ বার)
ফেরেস্তারা আইলোরে যখন হইয়া তখন খাড়া
মরু সাহারার বুকে ফুটলো এক নূরের তারা, ফুলে ছিল মধুভরা। ঐ
আহাদে আহম্মদ হইল মোহাম্মদ নাম রাখা ছিল
আবদুল্লার পেছনিতে ভাসলো নূরের সেতারা,
তিনশ আওরত পাগোল সেই নূর দেখে হইল মাতয়ারা
যে দেখেছে সে পাইয়াছে পাইলনা রে অন্ধ যারা
ছিল সেই ফুল আরশেতে পঞ্চ পিরীতে
একদিন রাত্রিকালে মা আমেনা স্বপ্ন দেখে আকাশের তারা এসে গর্ভে চন্দ্র তারা।
ঐ
স্বপনের ভেদ জানিয়ারে মা হইল দিশেহারা, কইতে নারে, সইতে নারে,
চতুরদিগে কাঁটার বেড়া–ফুলে ছিল মধুভরা। ঐ[১২]

২

শুন বন্দুগণ, দমে দমে জপ আল্লার নাম,
দমে দমে আয়ু কমে বইলা গেছে নিরানজন। ঐ
দমে দমে আল্লার নাম সদায় দিলে রাখিয়া
যথায় তোমার মনে ধরে তথায় যাও না চলিয়া। ঐ
কীটপতঙ্গ পোকা আদি প্রদীপেতে আসিয়া
জম্প দিয়া প্রাণ ত্যাজে আয়ু রবে ভুলিয়া
কি করিবে আয়ু থাকতে সামনে তোমার কাল-সমন। ঐ[১৩]

৩

গফ্ফর ছাত্তার তুমি কাদের মোক্তার
আজো নই কিনা আমি কমিন লাছার।
গুনামোয় করমে তোমার

তোমার আজাবের ভয়ে কান্দি জারে-জার।
তুমি মাপ না করিলে গুনা কে করিবে আর
কার কাছে দাঁড়াইব কে আছে আমার।
তুমি ভিন্ন আর মোদের নাহিক উপায়
মাফ করো ওহে আল্লা ধরি তোমার পায়।
ক্রন্দনের জায়গা আর নাহি কোনো ঠাঁই
মাফ করো যদি আল্লা তবে রক্ষা পাই।
মহাপাপ অধম অতি সকল হইতে
সবা হতে মন্দ হইনু নছিবের দোষেতে।
তোমার কুদরৎ আল্লা অসীম অপার
নছিবের মন্দ বাসা করহ আমার
দেলে জাঙ্গার আল্লা দূর করো তুমি
তোমার ভিন্ন যেন কিছু নাহি জানি আমি
খায়রুল আর মহব্বত রাসুল
এই ভিক্ষা দান করো কান্দি অকাতুল।
জাহেরি বাতনি যত নেয়ামত তোমার
তামাম করহ আল্লা উপরে আমার
মা বাপ ওস্তাদ পির যত মোসলমান
রাজি থাক সবা পরে ওহে ছোবাহান।[১৪]
সাখাওয়াত উল্লা (ছাকু সরকার)

৪

মরণের আগে মন যাও রে মরিয়া।
ক্রন্দনের আগে কিছু লও রে কান্দিয়া।
দিন গেলে কবেরে মন একেলা কান্দিবে।
সে কান্দনা কেহ তেরা নাহিক শুনিবে।
হায়রে গাফেল মন ভবেতে মজিয়া।
মরণের কথা তুমি গিয়াছ ভুলিয়া।
হায়রে গাফেল মন মউত তোমার ।
দিবসেতে পঞ্চবার ডাকে বারে বার।
দিবানিশী কান্দি কিছু নেকি লও যাতে।
দেরি নাহি হবে জান কবজ করিতে।
হায়রে পাগল মন কি করো বসিয়া।
মাওলার দরকারে কিছু লও না কান্দিয়া।

www.pathagar.com

নিশিতে নামাজেতে নবি এতেক কান্দিত।
পাও মোবারক দোনো ফুলিয়া যাইত।[১৫]
কালা দরবেশ (সংগ্রহ)

৫

দিদার করিতে নবি খোদার নিকট যায় গো
বোরাকে সওয়ার হইয়ে আরশের পরে যায়।
যখন গেলেন আরশের ধারে বলেছিল নবিজীরে
পায়ের জুতাসহ করে আরশের পরে আয়
নবি বলে ও রব্বানা মুছাকে কৈরাছ মানা (২)
আমায় কেন বল তুমি জুতাসহ আয়। আরে... ঐ[১৬]
কালা দরবেশ (সংগ্রহ)

৬

বিসমিল্লাহ বলিয়া নৌকা খোলো বেলা গেল (২)
ছয় খোপে মাল গুদাম
নবির নামে দাঁড় বাদাম (২)
চালাও রে মানবের গাড়ী মদিনার কিনারে। ঐ
সাড়ে তিন হাত নৌকাখান
নবির নামে দাঁড়-বাদাম (২)
চালারে মানবের গাড়ি সোনার মদিনায় গো। ঐ[১৭]
টিকা : ছয় খোপ- ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।
মোহাম্মদ (সংগ্রহ)

চ. মারেফাত

১.

ঐ ডাকছে মোর দিনের নবী, পার হবি কে আয়রে আয়
কে যাবি মদিনার পথে, দয়াল নবির রওজায়।
নবি আকুল প্রাণে অজর নয়নে
চাহিয়া উম্মতের পানে, (২ বার)
দয়াল নবির দয়ার গুণে (২) তাওহীদের বাণী শুনায়।
পার হবি কে আয়রে আয়। ঐ
এ জগৎ তরাবে বলে
ঘরে ঘরে নাম বিলাবে (২বার)
ঐ নামের মহব্বত হলে (২)

www.pathagar.com

পাপি তাপি তইরে যায় (২)
কে যাবি মদিনার পথে দয়াল নবির রওজায়। ঐ
কে যাবি দাবি পাবি বলে
নবির কাছে আয়রে চলে (২ বার)
দয়াল নবির দয়ার গুণে (২) মহর নবুয়ত দেখায়।
সাখাওয়াতের এই বাসনা
যাইতে মক্কা আর মদিনা (২)
মায়ের ঋণে হইলাম দেনা দিন গেল হেলায় হেলায়
দিন গেল হেলায় হেলায়, পার হবি কে আয়রে আয়।[১৮]
ছাকু সরকার

২

একটা পাখি পাইল্লাম শখ কৈরে
ও পাখি ধরতাম গেলে দেয় না দেখা রে
পাখি যথা-তথা যায় চৈলে। ঐ
ওরে ছোটকালে পালছি রে ময়না দুধকলা খাবাইয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর পাখি চাইলো না ফিরিয়ারে। ঐ[১৯]

বাউল আবুল কালাম

www.pathagar.com

ছ. আঞ্চলিক গান

১

কালা বিলাই ধলা বিলাই কোন হতিনে হালেরে
বিলাই কোন হতিনে হালে।
বেয়ান রাইতগা দমকার বিলাই দুয়ার ধোরি ঠেলেরে।
কোন ঘরের রঙিলা বিলাই রে। ঐ
ও বিলাই রে...
কাইলগা খালি বাডা মাছ, আইজগা আইলি লোভেরে বিলাই
আইজগা আইলি লোভে
ও তোর দুই কানও কাটিয়া নিবো (২)
কুড়ালিয়া কোবে রে।
কোন ঘরের রঙিলা বিলাই রে।
ও বিলাইরে...
বৃষ্টি হড়ে টাপুর টুপুর, বাইরে কেন ভিজেরে বিলাই
বাইরে কেন ভিজে
ওরে ঘরের হিছে টাঙ্গ কচুগাছ (২)
ছাতা মেলি ধর রে
কোন ঘরের রঙিলা বিলাইরে।[২০]

অর্থ : বিলাই-বিড়াল। হতিন, হোতিন-সতিন। হালে-পালে। বেয়ান রাহিত-বিহান রাত, শেষ রাত। দমকার বিলাই-আদুরে বিড়াল। কাইলগা-গতকাল। বাডামাছ-বাটামাছ। আইজগা-আজ। আলি-আসলি, আসা। খালি-খাইলি। হড়ে-পড়ে। হিছে-পিছে, পেছনে।

ব্যাখ্য : যত দূর ধারণা করা যায় এটা পরকিয়া প্রেম বিষয়ক একটি অনন্য সংগীত। রঙিলা বিড়ালের রূপকে পরকীয় পুরুষকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃষ্টিতে বিড়াল ঘরের পিছনে ভিজতেই পারে, কিন্তু বিড়াল কি ছাতার ব্যবহার জানে? গানের স্তবকে বিড়ালকে কচুগাছের পাতা ছাতা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে, যাতে সে না ভিজে। এখানে সরাসরি প্রেমিক পুরুষকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২

হোলাতোনো মাইয়া ডাঙ্গর (২)
এই বিয়ারনি ঢক আছে।
আরো হুনি মাইয়া ইগা উঠত জানে আমগাছে।
আম হাড়ে, জাম হাড়ে, আরো হাড়ে তাল

www.pathagar.com

এই বাড়ির তোন ঐ বাড়ি যাইতে টোক্কি হার অয় খাল
খালে দিয়া যাইতে মাইয়া কামড়াইছে বোয়াল মাছে
কামড়াইছে বোয়াল মাছে। ঐ
মাইয়াতোরে মাইয়া নয়, মইচ্ছেতোনো জ্বাল
এ বাড়িত তোন ওই বাড়িত যাইতে টোক্কি হার অয় খাল
খালে দিয়া যাইতে মাইয়া, কামড়াইছে বোয়াল মাছে।
আরো হুনি ঐ।
দুপুর অইলে মাইয়া ইগা বাড়ি বাড়ি হিরে
হঁতের মইধ্যে ছেঁংড়া হোলা হলাই ভেংচি মারে
দুগা, তিনগা এত্তর অইলে মাইয়া কাপড় তুলি নাছে।
আরো হুনি ঐ।[২১]

অর্থ : হোলা-ছেলে। মাইয়া-মেয়েলোক ডাঙ্গর-বড়ো। ঢক-সৌন্দর্য বা মানানো অর্থে। হুনি-শুনি। ইগা-এইলোক। তোন-হইতে, থেকে। টোক্কি-লাফ দিয়ে। হার অয়-পার হয়। অইলে-হইলে, হলে। হিরে-ফিরে। হঁতের-পথের। ছেংড়া-অল্প বয়স্ক ছেলে। হাইলে-পাইলে, পেলে। হলাই-পলাই, পলায়ন। এত্তর- একত্র, একসাথে।

৩

কলির ভাব দেখিয়া মরিরে, কলির ভাব দেখিয়া মরি
বাপের হিন্নাত ছিরা তেনা, হোলায় লাগায় চশমা ঘড়ি। ঐ
বাপে টানে হাদার হুরিয়া, হোলায় টানে বিড়ি।
বাপে দেয় বদিল্লারে ভাই, হোলায় করে বাবুগিরি। ঐ
বাপ হাটে যায় গামচা গাতদি, হোলার হাওয়াই। শার্ট
উপরে দি বাবুআনা, ভিতর সদর ঘাটরে-কলির। ঐ।[২০]
সামু (সংগ্রহ)

৪

পিরিতির কপালে দিলাম ছালিরে, নিষ্ঠুর বনমালি
আমি পিরিতির কপালে দিলাম ছালি। (২)
ও মনরে...
আমি আপন হাতে গাছ লাগাইয়া
আপনি হইলাম মালিরে বন্ধু
আপনি হইলাম মালি...
ও আমি গাছ লাগাইয়া ফল পাইলাম না

www.pathagar.com

গাছ লাগাইয়া ফল পাইলাম না
জল ঢালিলাম খালিরে নিষ্ঠুর বনমালি
পিরিতির কপালে দিলাম ছালি। ঐ
ও মনরে ...
খালে-বিলে নাইরে পানি
ব্যাঙের ফালাফালি রে বন্ধু, ব্যাঙের ফালাফালি (২)
ও আমি জাল বাইয়া মাছ পাহিলাম না (২)
শুধু বাইলাম ঠেলা জালি রে নিষ্ঠুর বনমালি
পিরিতির কপালে ছালি। ঐ[২৩]
বাউল আবুল কালাম

টিকা : ছালি- ছাই, বাইলাম- বাইলাম, ঠেলা জালি- এক প্রকার জাল।

৫

বাঁশের কানা হালাই দিস্
তাতে হবে ডোলের মিশ
বেচা-কিনার সম অইলে আগ বাজারে নিস
বাঁশের কানা হালাই দিস (২) ঐ
বাঁশের কানা হালাই দিস (২)
মনা বলে ওরে ধনা ভাই
তাড়াতাড়ি চল আমরা আগ বাজারে যাই
দুই-চাইর আনা লাভ অইলে ডোল বেচি হালাই দিস
লাভের টাকা দিয়ারে ভাই হান-হাদা কিনিস।
বাঁশের কানা হালাই দিস (২) ঐ[২৪]
কালা দরবেশ (সংগ্রহ)

টিকা : বাঁশের কানা-বাঁশের কঞ্চি। হালাই দিস- ফেলে দিস। ডোল– ধান রাখার গোলা, মাছ রাখার– বিশেষত বেয়ালের মাছ-মাছ রাখার যন্ত্রবিশেষ। সম-সময়, অইলে- হলে। আগ বাজার- হাট বসার পূর্বলগ্ন। হানি- পান, হাদা- সাদা।

(রায়পুরের পূর্ব গাইয়ার চরের বয়াতি হায়দার আলী সরকার-এর বয়স ৭০-৮০ বছর। তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি আঞ্চলিক গান)

৬

কত পাষাণ বান্দাইছ তুমি পতি মোহন বৈদেশেতে।
জ্যৈষ্ঠেতে অমূল্য ফল আষাঢ়েতে নিশান জল

www.pathagar.com

শাওন কাটাইলা তুমি সায়রে সায়রে।
ভাদ্রতে তালের পিঠা আশ্বিনেতে শসা মিঠা
ওরে কার্তিক মাস কাটাইলো কাতরে কাতরে।
অঘ্রাণে নবান্ন ভাতে পৌষেতে শীতেরি রাত ধৈর্য না মানে কাল মাঘেতে।
ফাল্গুনে নয়ন কালা চৈত্রেতে রোদেরি জ্বালা ধৈর্য আনে কাল বৈশাখে।

৭

সকালে মিলছে মেলা বিকেলে ভাঙ্গিয়া যায়
প্রেমময় প্রেম সাগরে প্রেমের মানুষ ভেইসে যায়,
প্রেম করেছে আইয়ুব নবি যার প্রেমেতে রহিমা বিবি
যারে ১৮ কাল পিড়ায় খাইলো ত'ও না প্রেম ছাড়তে চায়
প্রেমময় প্রেম সাগরে...

৮

মাওলা যারে দয়া কইরাছে রে...
পিরিতির বান মাইরা, ঘরের বাহির কইরাছে
ওরে আমার মাবুদ মাওলা, আমি দিনে দিনে হইলাম দেনা
আমার সেই দেনার আর শোধ হবে না
খোদা বলতাছি তোমার কাছে
পিরিতির বান মাইরা... ঘরের বাহির কইরাছে।

৯

দয়াল নবিজি আমার পারেরি কাণ্ডার
সাফায়াতের ভার আল্লায় দিয়েছে যারে
চিনলাম নাগো আমার দয়াল নবিরে (২)।
একদিন আবু জাহেল কী করে
কয়ডা পাথুরের মুর্তিরে গোসল করাইয়া ভক্তি করে।
নবি কয় চাচাজান ভক্তি করেন কী কারণ
জ্ঞান আত্মা আল্লাতায়ালা দেয় না যারে
চিনলাম না গো...

১০

আমার ঘর ছাড়িয়া মন উড়া পাখি পালাবে যখন
আমার দেহ কাঁদিয়া করছে আলাপন।
পাখি আমার ঘোর জঙ্গলে করছ আগমন

www.pathagar.com

কত দুগ্ধ ননি মাখন চিনি খাওয়াইছি তোরে মনের মতোন
এখন দোষ পাইয়া যাইবা ছেড়ে পাখিরে নিদয়া নিঠুরের মতোন।
বলরে পাখি তোর সঙ্গে কি আমার আর হবে না দেখা
তোর সঙ্গে মোর কথা বার্তা কইতাম আমি মধু মাখা
এখন আমায় ছেড়ে চইলা গেলি পাখি জন্মের মতোন দিয়াছে ধোঁকা।

১১

আল্লা আমিন বল ভাইরে ওরে মমিন ভাই
পার করো আল্লাজির নামে মিছা দুনিয়ায়
আল্লার নামটি লইয়া মানুষ যে যেখানে যায়
সাপে নাই দংশন করে বাঘে নাহি খায়

হানিফ বয়াতির (৭৫ বছর) চারটি আঞ্চলিক গান নিচে উপস্থাপন করা হলো

১

ওগো অমূল্য ধন বিরকি করে
অমূল্য ধন বিরকি করে বিনামূল্যে পাবিরে
যদি মারফতের দেশে কেহু যাবিরে (পাগল) (২)
গুরুকেড়া কিনে সখা যাইতে যদি যেমন দেখা
সামনেতে বন্ধুর দেখা পাবিরে।।
কলবেতে রূপের খনি নাইকা তাতে দিন রজনি (২)
সর্বময় জিকিরের ধ্বনি কানে শুনতে পাবিরে।
মারফতের কলমা কানা পিরের কাছে আছে জানা (২)
পানা বিলা হইলে দেখবি তবে পিরের ছবিরে।।
লাহুত নাকছুদ মালকুত যবুদ
তার ভিতরে খেলছে মাবুদ
ঐ নামে পানা বিলা হবিরে।
গুরুকে রাখিয়া সখা যাইতে যদি চাও মন ঢাকা
সর্বময় বন্ধুর দেখা ওগো সামনেতে পাবি
মারফতের দেশে যদি যাবি।

২

মায়া নদী পার হবি কেমনে ভাবো মনে (২)
মায়া নদী পার হইবা কেমনে।
নদীর নাম কামেলা সাগর বেকে বেকে উঠে লহর (২)

www.pathagar.com

ঢেউ উঠে দক্ষিণা তুফানে ।
মায়া নদীর উর্দু দ্বার মাসে তিন দিন হয় জোয়ার
তিন মহাজন, ওগো তিন মহাজন আছে তিন সাধনে।
দেখিয়া স্রোতের কাটাল হানিফ দেওয়ান হইলাম বেহাল
বৈঠা ভাঙা মস্তুর খাইছে ঘুণে।
নদীর নাম কামেলা
সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা তাহার সনে সহাকর্তা
ওগো চুম্বুক লোহা বসাইছে সন্ধানে
দেখিয়া স্রোতের কাটাল
কাম নদীর তরঙ্গ ভারি কেমনে ধরিব রে পাড়ি
লাহুত নাকছুদ মালকুত যবুদ
দয়াল আমায় পার করো সন্ধানে ভাবি মনে
মায়া নদী পার হবি কেমনে ভাবো মনে।

৩

কেন ভিক্ষা করে মুসলমান মানববাদী পাক আল্লার কোরান (২)
কোরানে নামাজের কথা
ঐ নাম ধ্যান করিলে শুনতে পাবি (২)
আছে আল্লার খাচ জবান (২)
কোরানে নামাজের কথা
ওকি মুসসালাতা, ওকি মানে দাঁড়া করা আগে তাহা জান
যেমন বেকা কাতার সোজা হইলে (২) দেখবি রে বিশ্বের কল্যাণ
কোরান পড়লে হবে কি
ও তার ব্যাখ্যা না বুঝি
অনুমানে সারা কোরান মুখস্থ কইরাছি (২)
যেমন বেকার বুকায় সব মওলানা কোরান কে করে চালান।
ধর্মে কয় পরের উপকার মন তুমি জান সমাচার
ইয়ার চেয়ে বড় নাই বলছে পরওয়ার
মানুষ কোনো দিন কি কয় রাখছো বোকা শুনলে পায় হানিফ দেওয়ান।

৪

কে বানাইলো রঙ্গের জাহাজ মেস্তুরি কোথায় (গো)
কে বানাইলো রঙ্গের জাহাজ মেস্তুরি কোথায়

www.pathagar.com

ওগো কে বানাইলো রঙ্গের জাহাজ মেস্তরি কোথায়
ধন্য বালি কারিগুরির কি সুন্দর সারি সারি।
সামনের দিকে মেলের টেরি বাত্তি বলা যায় গো (২)
কি সুন্দর সাতটি জোড়া মাটির জাহাজ করছেন খাড়া
দুই ধারেতে পাংখার জোড়া ইঞ্জিনে দৌড়ায় (২)
ধন্য বলি কারিগুরির কি সুন্দর সারি সারি।
সামনের দিকে মেলের টেরি বাত্তি বলা যায়।
ধন্য বলি কারিগুরির বাত্তি বলা যায় (গো)
দেওয়ান হানিফ ভেবে বলে একদিন ডুববো জাহাজ মায়াজালে
কর্মদোষে ডুব পড়িব রঙ্গপুরা দরিয়ায় গো (২)

জ. বারোমাসি

১

বাড়িয়ে বাড়িয়ে বাঁধেরে, কালিয়া জিরার বারা
মা বাপে বুঝলো নারে আমার স্বামীর জ্বালা
মা-বাপে বুঝলো নারে আমার মনের জ্বালা। ঐ
ফাগুনে ন গুন জ্বালা পবন দিলে মোড়া
যে বা নারীর স্বামী নাই সদাই কপাল পোড়ারে,
কালিয়া ধানের বারা ঐ চৈত্র মানে কুকিল ডাকে কুহু কুহু স্বরে
যে বা নারীর স্বামী নাই কলিজা তার ধরেরে, কালিয়া ধানের বারা। ঐ
বৈশাখে কৃষকের ক্ষেতে মাঠে বুনে ধান
রাখালের গান শুনিয়া মন করে আনছান (বিদরে পরান) রে...
এসো এসো প্রাণের বন্ধুরে এসো তাড়াতাড়ি
ইতিমধ্যে না আসিলে গলায় দিব ছুরিরে, কালিয়া ধানের বারা। ঐ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আছে জানা গাছে পাকে আম
কারে নিয়া খাইতাম দেশে নাই মোর স্বামীরে ... ঐ
আষাঢ়ে বরষার রীতি ভেফু বাজায় বাঁশি
যে বা নারীর স্বামী নাই মুখে নাই রে তার হাসিরে... ঐ
শ্রাবণে অসীম জল, খালে-বিলে পানি
কেমনে রহিলা দূরে অবলার পরানিরে? কালিয়া ধানের বারা... ঐ
ভাদ্র মাসে আছে জানা গাছে পাকে তাল
কারে লইয়া খাইতাম আমি এ দুঃখের কপালরে... ঐ

www.pathagar.com

আশ্বিন মাসে পূজার কাজ মনে অতি আপ
তোমার দিকে চাইয়া-চাইয়া যৌবন করলাম শেষরে
কার্তিক-অগ্রাণ দুই মাসেতে মাঠে পাকে ধান
নতুন ধানের নতুন পিঠা খায় ঘরে ঘরে রে... ঐ
পৌষ মাস দুই মাসে শীতে দেয়রে ঠেলা
যে বা নারীর স্বামী নাই অঙ্গে বড় জ্বালারে...। ঐ[২৫]
সংগ্রহ : নিমাইচন্দ্র বাঢ়ৈ মফিজ সরকার

২

কৈ গেলা, কৈ রইলা বন্ধুরে, বন্ধু কৈ গেলা, কৈ রইলা বন্ধুরে।
ও বন্ধু ছাড়ি আপন দেশ তোমার লাগি কান্দি-কান্দি, সোনার জৈবন শেষরে। ঐ
আইলোরে বৈশাখ মাস, গাছে পাকা আম
কারে লোই খাইতাম আমি ঘরে নাই মোর শামরে। ঐ
কৈ গেলা, কৈ রইলা বন্ধুরে-বন্ধু, ছাড়ি আপন দেশ তোমার পন্থে চাইয়া-চাইয়া, আমার দেহ শেষরে। ঐ
জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের জ্বালা, গাছে পাকে মেওয়া, দিনে পড়ে রোইদের ছামা, রাইতে গরম হাওয়া, এমন সময় যার আছে নতুন সাথী, বসি বসি গল্প করে বিছাই শীতল পাটিরে। ঐ
আষাঢ় মাসে বরিষার ঋতু ব্যাঙে বাজায় বাঁশি যেই নারীরত সোয়ামী নাই–মুখে নাই তার হাসিরে
শাওনে অসীম জ্বালা, খালে-বিলে পানি পাইলে হরানের বন্ধু কোলে লোইতাম টানিরে–ঐ।
ভাদ্র মাসে আছে জানা, গাছে পাকা তাল (কারে লইয়া খাইতাম আমি ঘরে নাই মোর সাধ) যে নারীরও সোয়ামী নাই তার পোড়া এ কপাল–রে। ঐ
আশ্বিন মাসে পূজার বন্ধ, মনে অতি আশ তোমার পন্থে চাইয়া-চাইয়া দেহ আমার শেষরে ঐ/ যৈবন।
কার্তিক মাসে বরষা গেল, পানি গেল ছৈলে
এসো এসো প্রাণের বন্ধু অভাগিনীর কোলেরে ঐ
অগ্রাণ মাসে চাইয়া দেখ, মাঠে ভরা ধান রাখালের বাঁশির সুরে গান শুনিয়া বিদরে পরানরে -ঐ
পৌষ ও মাঘ দুইওরে বেশি জ্বালারে ঐ।
ফাল্গুনে নয়গুন জ্বালা যৈবন দিল মোড়া
যেই নারীর নাই সোয়ামি, সদায় কপাল পোড়ারে।

www.pathagar.com

চৈত্র মাসে কিষাণের ক্ষেতি, মাঠে বুনে ধান
তোমার লাগিয়া বন্ধু, সদায় কান্দে প্রাণরে ঐ।
কৈ গেলা, কৈ রইলা বন্ধুরে।[২৬]

টিকা : বাড়িয়ে বাড়িয়ে-বাড়িতে বাড়িতে।

কালিয়া জিরা, কাইল্লা জিরা-অভিজাত শ্রেণির ধান বিশেষ, এখন চাষাবাদ খুব কম।

প্রাপ্ত বারোমাসি গানে (মহীউদ্দিন দুলাল/দুলাল হুজুর, কমলনগর, ছাকু সরকার-লক্ষ্মীপুর সদর, নিমাই সূত্রধর (বাটে), লক্ষ্মীপুর (সদর) দেখা যায়, দুলাল হুজুর ও ছাকু সরকার থেকে প্রাপ্ত গান মূলত একই সুর, পাঠ ভিন্নতা রয়েছে। নিমাই বাড়ে থেকে প্রাপ্ত বারোামাসিতে সুর-ভনিতা/ভুনুতি। প্রথম দুটিতে সুর মেঠো সুর, তৃতীয়টিতে ভুনুতির সুর। তিন বারোমাসিতেই বিরহের আর্তি প্রতিফলিত। যদিও মাস বিশেষে পাঠ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এছাড়া বারোমাসি গানের আরো রূপ বা ধারা বর্ণনা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

ভুনুতি : মর্সিয়া গানের অনুরূপ। সুরেলা মায়াবি কণ্ঠে দরদ মাখানো বিলাপ। যাতে থাকে বিলাপ, প্রলাপ, ক্ষেদ, মান-অভিমান। দূর আর্তিতে মহিলা গায়িকারা শখ করে, দরিদ্রতার কারণে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এ ভুনুতি গেয়ে শোনাতেন। অনেককেই ভুনুতি শুনে আসরেই অঝোরে কাঁদতে দেখা গেছে, কেউ ডুকরে কেঁদে উঠত–কেউবা নীরবে কাঁদতো, কেউ সন্তর্পণে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে গিয়ে নিরবে কাঁদতো। রাতে সাধারণত বাড়ির উঠোনে বিছানা বিছিয়ে, শীতলপাটিতে বসে বাড়ির নারী, পুরুষ শিশু-কিশোর এ ভুনুতি শুনত। শিল্পীকে প্রতি ঘর থেকে চাল, ডাল সংগ্রহ করে দেয়া হতো, কেউ কেউ শিল্পীকে টাকা দিত সম্মানী হিসেবে। ফাগুন, চৈত্র, বৈশাখ মাসেই এ গানের আসর বসত। কখনো-কখনো দুতিন বাড়ির মহিলারা মিলে গায়িকাকে বায়না এনে এ ভুনুতি, জারির আসর বসাত।

লোকশিল্পী গোলাম মহিউদ্দিন দুলাল (বয়স ৫১ বছর, পিতা : জমসের আহমেদ, মাতা : আমেনা বেগম, ঠিকানা : চরপাগলা, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর), পেশায় চর পাগলা ফাজিল মিয়া দাখিল মাদ্রাসার পিয়ন। এ শিল্পীর গানের খাতা থেকে বারোমাসি সংগীতের দুটো স্তবক পাওয়া গেছে যা উদ্বৃত করা হলো :

অঘ্রাণ মাসেতে যে ক্ষেতে উল্লাস হইয়া
মাঠের ধান কাটে গিয়া কাচি হাতে লইয়া
নয়া ধানের নবান্ন খায় এক সাথে বইয়া (২)
আমার ক্ষেতের পাকা ধানগুলি টিয়ায় কাটি লইয়া যায়। ঐ
আইলরে বসন্তের বাহার মধুর ফাগুনে
ছটফট করে মন কোকিলারও গানে।
যৌবনো জোয়ার যায় উথলে মনে (২)
বন্ধু আমার দূরদেশে সদাই মনে তারে চায়। ঐ

www.pathagar.com

ঝ. কর্মসংগীত

ধান কাটা, রোপা বপন, ধানক্ষেত নিড়ানি,

কোবানির সময়, সাধারণতঃ গীত হয়।

অধ্যাবধি প্রচলিত। বিশেষতঃ

জেলার দক্ষিণাঞ্চলে। চরাঞ্চল ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত।

নূর মোহাম্মদ

১

ধুয়া : আল্লাহর নামটি লইয়া বন্দা যে যেখানে যায়

সাপে নাহি দংশন করে বাঘে নাহি খায়

হরথমে আল্লাজীর নাম লই। (২)

অল্লাজির ওহৈ... (কোরাস)

ওহৈ হরথমে আল্লাজির নাম লইও।

সরকার : হরথমে আল্লাজির নাম লইও সকলে, ওহৈ (সমস্বরে) আল্লাজির

সরকার : আম হাতা খসখৈসশ্যা ভালারে, লাউ হাতা গরম

www.pathagar.com

শাশুড়িয়ে কেন্নে জানে, জামাইর গা গরম, হরথমে আল্লাজির
সমস্বরে : হরথমে আল্লাজির নাম লোইও সকলে। (২)
সরকার : আতঅ লইয়া বোলাইরে বরি লবণ দিয়া খাই ও।
বয়সের কালে বিয়া করি বৈদেশে না যাইও আরে ওহৈ।
সরকার : আগা ছিকন হাছা মোড়া হলকম ঠনাঠন
ওরে সে ও নারী কৈল্লে বিয়া ছ মাসে মরণ রে।
সমস্বরে : হরথমে আল্লাজির নাম লোইও ও হাই (২)
সরকার : মাছের মধ্যে কৈ মাছ ভালাগো, কৈ মাছ ভালা
নারীর মধ্যেই চিকন আর কালা ওহৈ। সমস্বরে
সমস্বরে : হরথমে আল্লাজির নাম লোইও (২)
সরকার : সুন্দুরীরা ভাতও রাঁধেরে, চালে উড়ে ধুমা
কাল ভোমরা উড়িয়া যাইতে মুখে মারে চুমা, আরে ও হোই। ঐ
ভৈষে ভৈষ মারিয়া বাতাম কৈল্লে খালি
শাশুড়িয়ে জামাইগো মারি ঝিরে কৈল্লের বাঁড়ি আরেও
সমস্বরে : হরথমে আল্লাজির নাম লোইও
সমস্বরে : হরথমে আল্লাজির নাম লোইও রে পাগলা
সমস্বরে : হরথমে আল্লাজির নাম লোইও।

২

হাইরবা না-হাইরবা না রে বন্ধু, যত করে আশা
বাহিরে জঙ্গলে বসি (২) কত মাইরবা মোশারে
হাইরবা না-হাইরবা না রে বন্ধু (২)। ঐ সমস্বরে
বিষ্টি হড়ে টাপুর-টুপুর বন্ধু শাড়ি না ভিজাইও
ঘরে হিছে টাঙ্গ কচুগাছ-সমস্বরে (২বার)
ও বন্ধু টানি মাথায় দিওরে, হারাইবা না (২) বন্ধুরে।
বাঁ কিনার দি কোলের শিশু ডাইন কিনার দি শুইও বন্ধু
মনের যত ব্যথা-বেদনা (২ বার)। সমস্বরে।
আমার বুকে রুউওরে (কোরাস) পারিবা না (২) বন্ধুরে। ঐ (কোরাস)

৩

আমার আশা ছাড় বন্ধুরে, ও বন্ধু আমার আশা ছাড়
আল্লাহর আশা যেমন তেমন বন্দার আশা গড়রে। ঐ
ও বন্ধুরে আমার লগে করি ভাও, পাড়া পড়শির মন জোগাও (২ কোরাস)

www.pathagar.com

এ পিরিতির কেবা আশা করে রে, (কোরাস) আমার আশা ছাড় বন্ধুরে ঐ
কোন বা দেশে থাকবে বন্ধু, কোন গেরামে থাক (কোরাস)
আমারে ভুলিয়া তুমি কোন নারীর মন রাখরে বন্ধু (কোরাস) কোন গেরামে থাক।
সমস্বরে ঐ
ও বন্ধুরে আমার লগে কোরি ভাও
তালতো বোইনের মন যোগাও এ পিরিতির কেবা আশা করে রে (কোরাস)। ঐ
ও বন্ধুরে মনে ছিল বড় আশা বান্দিবো সুখের বাসা
তুমি বন্ধু কৈরলা নৈরাশা (কোরাস)।
আগে জানিলে এমন কুত্তা পিরিত কে করে (কোরাস)

৪

চোকরা বন্ধুরে এত গোস্বা তোমার অন্তরে
আইবা কই তুমি কথা দিলা
কি কারণে বন্ধু না আসিলা এত গোস্বা বন্ধু তোমার অন্তরে (কোরাস)
বাগিছার পিছনে কুমড়ার হুল, বাতাসে উড়ায় মাতার চুল (কোরাস)
বন্ধু নাহি মোর জানে চোকরায় রে-ঐ (কোরাস)

৫

ওকি পতিধন জান বাঁচে না জৈবন জ্বালায় মরি
পাখির বসন্ত কালেরে ডালে বাঁধে বাসা
নারীর বসন্তকালে মুখে মধুর হাসি
পুরুষের বসন্তকালে হাতে মোহন বাঁশিরে ও কি পতিধন -ঐ
তালগাছের আগাত আছে চুড়িয়ার বাসা
সোনা বন্ধু না ফুরাইলো আমার মনের আশারে- ওকি পতিধন -ঐ

৬

কুকিলরে তুই ডাকিস নারে আর - এই বসন্ত কালেরে, বন্ধু নাই আমার ।
উঁচু ডালে থাকরে পাখি নজর বহুদূর।
তুমি কি কইতে পার -বন্ধুর খবর রে-এই বসন্তকালেরে, বন্ধু নাই আমার
কইও কইও কইও পাখি কইও বন্ধুর কাছে।
অভাগিনী চাইয়া রইছে তোমার পথের পাছেরে।

৭

ও সইগো সই প্রেমের চিঠি লেখ বন্দের বাড়ি (সমস্বরে)
আকাশকুলে কালো মেঘে আকাশ গেছে চাইয়া (সমস্বরে)

www.pathagar.com

ওরে আর কত কাল থাকব আমি তোমার দিগে চাইয়াগো হায়গো-
প্রেমের চিঠি...
আরে ও হৈ (সমস্বরে) প্রেমের চিঠি লেখ বন্দের বাড়ি-ঐ (সমস্বরে)
সইগো সই সমস্বরে ও হৈ...
তুই বন্ধের পিরিতির লাগি কত মারা মাইরছে মায় (সমস্বরে)
কত মারা মাইরাছে মায়
ও সখি গো (সমস্বরে হৈ হৈ) গায়ের কাপড় খুলে দেখ
কত দাগ পইড়াছে গায়। ঐ
সাদা কাপড়ে দাগ পড়িলে সেই দাগ তো আর উঠে না (সমস্বরে)
আমার বন্ধুর মনে দাগ লাগিলে সেই দাগ আর উঠে না (সমস্বরে)
প্রেমের চিঠি লেখ বন্দের বাড়ি (সমস্বরে)
ও সইগো সই তুই বন্ধুর পিরিতির লাগি
জন্মকুলে হইলাম দাগি (২ বার) (সমস্বরে) যাইতে রাজি ভব সংসার ছাড়ি।
(কোরাস)

৮

সরকার : দূরের নাইয়া আমায় পার কর রে। (২)
স্বামী আমার গাঁজা খোর সদাই বলে আগুন তোলরে। (সমস্বরে) ঐ
দূরের নাইয়া আমায় পার কর রে। (সরকার, তৎপর দোহারি)
ওই আগুন তুলতে তুইলতে লাগল কালির দাগরে
(দোহারি) দূরের নাইয়া পার কররে।
স্বামী আমার গাঁজা খোর সদাই বলে আগুন তোল (সরকার+ দোহারি)
দূরের নাইয়া পার কররে ঐ
আমায় যে করিবে পার দান করিব গলার হার রে (সরকার+ দোহারি)
আমি এপার হৈতে ওপার গেলে জৈবন কৈরব দানরে।
সরকার : এপার হৈতে ওপার গেলে জৈবন করব দানরে।
দূরের নাইয়া পার কররে (কোরাস)

এগুলো কর্মসংগীত। মেঠোগান। এ জাতীয় অজস্র গান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এগুলোও অবলুপ্তির পথে। তিন বছর পুরো জেলায় উদ্ধার করতে পারিনি। ভাগ্যিস শেষ পর্যায়ে এসে এগুলো উদ্ধার হলো নূর মোহাম্মদের কাছ থেকে। পেশায় দিন মজুর কামলা। এখনো খেতে রোপা রোপণের সময়, ধান কাটার সময় সহকর্মী সাগরেদ নিয়ে গেয়ে থাকে। হাল চষতে ক্ষেতে নিড়ানির সময় গায়। রামগতি কমলনগরে এগানের এখনো রেশ রয়েছে বলে জানা গেছে। এ গান প্রথমত একজনে গায় সাথে সাথে

www.pathagar.com

সমস্বরে কর্মরত সবাই গায়। এসব গানে প্রকৃতির সাথে মানব মনের নিবিড় সম্পর্ক যেমন বিধৃত থাকে তেমনি নিত্য দিনের কিষানের সুখ-দুঃখ, কামলা মজুরদের সুখ-দুঃখ বিরহী নারীর আকুতি ও প্রকৃতি বঞ্চনা মূলত মুখ্য বিষয়।[২৭]

ঞ. গাছ টানার বুলি (বোল)

সংগ্রহ : ছবি উল্যা, পিতা : ছায়েদল হক, ফকির বাড়ি, গ্রাম : সৈয়দপুর, ডাকঘর : রূপাচরা, লক্ষীপুর।

১

সাবাস যোয়ান-হেঁইয়ো লোচ
মারো টান-হেঁইয়ো লোচ
বন্ধু কেরে- রসিয়া
মারো টান-কষিয়া
সাবাস জোয়ান হেঁইও
আরো জোরে হেঁইও
কেরে জোয়ান হেঁইও
জোয়ান কৈরে-রসের টীলা
তোর কেনরে-জৈবন ঢিলা
ঢিলা জৈবন মারিয়া
গাছগা লোয়ো টানিয়া।
মারো টান-হেঁইও।
এইরে, মারো টান-হেঁইও
আরো জোরে-হেঁইয়া
হেঁইয়ো-হেঁইয়ো
হেই, আল্লাজির নাম-হেঁইয়া
নবিজির নাম-হেঁইয়ো
আরো জোরে-হেঁইও
হেঁইওরে হেঁইয়ো
মারো টান-হেঁইয়া
বলি জুম মারমার টান
সাবাস জোয়ান
হেঁইরে- ঠেলা দেও
আল্লাহর নাম
জোয়ান কেরে রচিয়া

www.pathagar.com

ঠেলা দিও কষিয়া
তোর কেনরে জৈবন ঢিলা
সাবাস জোয়ান-মার, মার টান।
ছবু উল্লা।

২

সোনার নাতিন কাডের টিয়া
(সম্বস্বরে) সোনার নাতিন কাডের টিয়া
কাট কাডাইলো হোগলে দিয়া... ঐ
ও বুলিরে বুলি-ওবুলিরে বুলি
মারো টান হোঁদ তুলি-মারো টান মাজা তুলি
মার, মার টান সাবাস জোয়ান
বুড়িয়ারে বুড়িয়া মাতা তোল-তোর লাই রইছে কোমড়ার ঝোল।
...কচুর ঝোল
খাবি না না খাবি একবার বোল
ও বলি জুম-বলি কি
জিগায় না ধোইরবো হিগার বোরে চোদ।

ট. করাতির গান/বুলি

উট সেলিনা দুয়ার খোল, উট সেলিনা দুয়ার খোল
দুয়ার নো খুইল্লে গণ্ডগোল... ঐ
তোর দুলা ভাই রঙের গোলা- তোর লাই আইনছে কালা হোলা
খাডে নো খাডে একবার বোল- উট সেলিনা দুয়ার খোল
এই সেলিনা রঙ সুন্দরী- উঠ সেলিনা দুয়ার খোল
তার বড় বোইন বান্দরি... ঐ
বান্দরিরে- বান্দরি-চেচাই আনগৈ হোঁদ ধোরি উঠ সেলিনা... ঐ
দুলাইন কেরে মাতা তোল... ঐ
ছবু উল্লা।
দুই প্রান্তে করাত টানার
ছন্দে- ছন্দে, তালে-তালে গান।
পোলের (খালের উপর) পালা কোঁপার বুলি।
ডিপ কল গাঁড়ার সময় গীত (বুলি)

www.pathagar.com

৩

হেঁইয়ো লোছো-লালছে (বাকিরা সমস্বরে)
লালছেরে আরো জোরে মারিওরে
হেঁইয়ো লোছো লালছে- (২)
তালে-তালে মারিও টান-(সমস্বরে)... ঐ
হোঁতের হানি ছত্রছান... ঐ
হেঁইয়ো লোছে-লালছে (বাকিরা সমস্বরে)
মারো টান রসিয়া- হেঁইয়ো লোছে-লালছে (বাকিরা সমস্বরে)
কষিয়া ধরো লালচে-হেঁইয়ো লোছো লালছে- (২)

৪

নাতিন তিন দিন তোর বাড়িত গেলাম
লাগুড় পাইলাম না নাতিন তিন দিন (সমস্বরে)
আইতে-যাইতে ছয়আনা গাঙ পার অইতে চাইর আনা (২)
আইতে-যাইতে ষোলো আনা উসুল হইলো না।
নাতিন তিন দিন তোর বাড়িত গেলাম লাগুড় পাইলাম না (২)
তোর মায়ে কয় বাড়িতে নাই-তোর বাপে দেয় গালি (২)
জামাই তোর কিসমতে নাই তোর কপালে ছালি
নাতিন তিন দিন... ঐ
তোর পিরিতির আশার আশে–কান্দি আমি ভাদ্র মাসে –(২)
আশ্বিন-কার্তিক পার ওই যায়গৈ তোরে পাইলাম না
নাতিন তিন দিন... ঐ

টিকা : যোয়ান-জোয়ান, জওয়ান। কাড-কাঠ; কাডের টিয়া-কাষ্ঠের কটিদেশ; কাট-কাষ্ট, কাঠ। কাডাইলো-কাটালো।

হোগলে গিয়া-উগলে গেলো, গড়িয়ে পাড়লো। বুলি-বোল, কথা বলা, শব্দ করা। হোঁদ-পাছা, মাজা- কোমর। বুড়িয়া-বৃদ্ধ। মাতা-মাথা। রাইনেছ-রান্না করেছে। চুদি-সঙ্গম করি (ব্যাঙ্গার্থে), নাজেহাল করা। উট-ওঠ, ওঠো, কালা হোলা-কালো ছেলে।

খাডে-খাটে, পছন্দ হওয়া। বান্দরি-বানরের মতো। বাঁদরের স্বভাব।

ঠ. বিয়ের গান

হিন্দু মেয়ের বিদায় : বিয়ের সময় কন্যা অনেক ধরনের গান বানানো হয়। তার মধ্যে কন্যাকে বরের বাড়ি বিয়ের পর নিয়ে যাবে এ সত্যকে 'দুঃখও বিয়ের সুখের' দুধরনের রস আশ্রিত গীত গেয়ে বাড়ির পরিবেশ তুলে ধরে। যেমন :

www.pathagar.com

বাল্যকালে পালছিল সীতা/দুধ ভাত দিয়া
এখন কেন নিতে আইলো/বুকে শেল দিয়া

মুসলিম মেয়ের বিয়ে :

মেন্দির বাগানে-কিসের বাদ্য বাজে
কেবা আমার আঁইসের আপা-নিতো নাকি বিজেরে (বিজে)
আমার বাবার কাঁদনে-গামছার আঁচল বিজেরে (ভিজে)
আমার ফুফুর কাঁদনে-চুলার আগুন নিবেরে (নিভে)

ছেলের কথা : বর-ছেলের পক্ষের মহিলা বা কিশোরীরা সুর করে গায়। এটি কোনো দুঃখের গীত নয়। এটি বিয়ের পরিবেশে মধুর আমেজ আনার জন্য অনেক গীতের একটি :

যখন কালে আরশাদ মিয়া- মেন্দি সাজন সাজে
তখন কালে রাইলা বিবি-মেন্দি ধরি কাঁদে
কাইন্দো না গো রাইলা খাতুন-তোমার আল্লার কিইরা গো
তোমারে ছাড়িয়া করমু-দোসরা নহে বিয়া গো

বিয়ের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর বরকে কনের গৃহে যখন নেয়া হয় এসব স্লোক পরিবেশিত হয়। প্রথমে ঘরের দরজায় আটকিয়ে কনের ভাই, বোন বা আত্মীয় প্রশ্ন উত্তরের মাঝে এসব স্লোক বলে। পরে ঘরে নিয়ে অনুরূপভাবে স্লোক দিয়ে অপর পক্ষকে আটকানো হয়। কিংবা প্রতিপক্ষ উত্তর দিয়ে নিষ্কৃতি পায়। এসবের পর বর কনেকে এক বিছানায় বসিয়ে দেখাদেখি করা এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজন থেকে প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়। এ সময় বর কনেকেও উপহার (টাকা-আংটি) দেয় এ-ধরনের একটি কথোপোকথন নিম্নরূপ :

কনেপক্ষ : আচ্ছালামু আইলাইকুম এন/জামাই আইছে বিয়া কৈত্ত আমেনেরা আইছেন কেন?

বরপক্ষ : ওয়ালাইকুম সেলাম ওবা/দুলা আইছে বিয়া কৈত্ত আমরা আইছি শোভা

কনেপক্ষ : বড় বাড়ির হোলা তুমি/সবাই তারিফ করে
উল্টা হাড়িত হাত দিয়া/জাতি নষ্ট করে

বরপক্ষ : ওলি গাছের ডুলি হাতা/আকাশেরও তুলি
কোন বুবুজান ঘরে আইছেন দুয়ার দেনগো খুলি

কনেপক্ষ : গরে (ঘরে) গরম বাইরে ঠাণ্ডা
দুলাভাই খাড়াই থান দুই-চার (ঘণ্টা)

বরপক্ষ : অক্ষির লতা শুকাইল/বিবি (ভাবি) আমার লুকাইল
যদি বাবি (ভাবি) আমার হন/দুয়ার খুলি গরে (ঘরে) লন।

www.pathagar.com

কনেপক্ষ : মেহমান বইছেন চেয়ারে
কনছেন মেহমান, মেহমান শরবত খাইতে কি কি লাগে।
বরপক্ষ : বড় গরুর দুর্দ (দুধ) লাগে, মাইনারি দোয়ানের চিনি লাগে
বড় একট গ্লাস লাগে, সুন্দরী বাবির (ভাবি) আত (হাত) লাগে

ড. লোকগীতি-নকশা

শাবাল কন্যার গান

১

রাজ নন্দিনি আমি রাকপাল বোলাইবোরে
বন্ধু বোলাইবো কোন লাজে (২বার)
ছাবাল কন্যার জন্ম হইল চন্দক্ষণ আরে...
সারাটা জীবন কন্যার লাগিল গ্রহণরে। বন্ধু বোলাইবো কোন লাজ ঐ (২ বার)
কন্যার জন্মের কালেরে কুরুয়ায় দিল ডাক
আরে...
তামাম জাহানে কন্যার সাড়া পড়ে যাকরে। ঐ
নানি, মামি, ফুফু, খালা, সকলে আইল
আরে...
কন্যার পুরিতে যেন চাঁদের হাট বসিল রে। ঐ
পয়ার:
রাজ- নন্দিনি আমি রাকপাল বোলাইবোরে- বন্ধু বোলাইবো কোন লাজে (২)
যখন শাবাল কন্যার বছরের এক–
আরে...
ডাক কাঁধে তার মাদন কড়ি, বা কাঁধে তার রেখ রে। বন্ধু...ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের দুই
আরে...
মায়ে-বাপে পালন করে বুকের উপর থুইরে... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের তিন
আরে...
গুইল্লা টেংরা খাইতে কন্যার মুখে লাগে ঘিনরে- বন্ধু... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের চাইর
পাশা খেলাইতে বসে মাইয়া সাইরও সাইর ওরে... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরেরও পাঁচ
বন্ধুর বাড়ি দেখে আইলাম নয়া করুল বাঁশ রে- বন্ধু... ঐ

www.pathagar.com

যখন ছাবাল কন্যার বছরের ছয়
নৌকায় ছড়িতে কন্যার মনে লাগে ভয়রে... ঐ
আরে... যখন ছাবাল কন্যার বছরেরও সাত
তৈয়ার অইছে দারুয়া- দাড়ি চড়াই দিছে ভাতরে বন্ধু...ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের আট
বন্ধুর বাড়ি দেখি আইলাম সোনারওনা খাট রে বন্ধু... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের নয় আরে... যখন নয়
হাঁটিতে মুটিতে কন্যা কত কথা কয়রে বন্ধু ... ঐ.
যখন শাবাল কন্যার বছরের দশ আরে ... দশ
উড়াল পাখির মনে লাগে নব রসরে বন্ধু ... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের এগার
এই বাড়ি, ওই বাড়ি কন্যা দেয় সবার বেগার রে বন্ধু... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের বার
ঝলকাইয়া, ঝলকাইয়া উঠে রূপেরও সাগররে বন্ধু...ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের তের
এলাইয়া বেলাইয়া দেখে গাইয়ে বিয়ার খেররে। বন্ধু... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের চৌদ্দ
ভুত ছাড়াইতে কন্যার ডাকি আন বৈদ্দরে... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের পনর।
ভদ্রা ভাঙ্গিতে ডাক জৈগুন খোনার রে। বন্ধু... ঐ
যখন শাবাল কন্যার বছরের ষোলো।
আরে... ষোল পূর্ণিমার চন্দ্র কন্যা আকাশের কোলরে। বন্ধু... ঐ[২৮]

মহেন্দ্র অঞ্চলে শ্রুতি, স্মৃতি ও গাওয়ালদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিয়ে বাড়িতে গীত হতো। মেয়েলি কণ্ঠেও গীত হতো, পুরুষ কণ্ঠেও গীত হতো। কখনো এককভাবে, কখনো দলবদ্ধভাবে, পয়ারিযোগে।

গ্রামের নিরক্ষর বয়াতি, সরকার, কবিয়াল এ জাতীয় অসংখ্য গান, পালা-কাহিনির স্রষ্টা। নিজেরাই গান বেঁধে নিজেরাই সুর করে গেয়ে বেড়াতেন গ্রামের রসিক, বিদগ্ধ, অবস্থাপন্ন গুণিজন এদের সমাদর করতেন। কখনো জমায়েতে, আসরে এরা গাইতেন। গৃহস্থ বাড়ির উঠানে সরকার বা বয়াতি একা গাইতেন।

লক্ষীপুর সদরের পূর্ব সৈয়দপুর গ্রমে এক দরিদ্র, মহিলা ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। অপূর্ব কণ্ঠ ছিল তার। গান, কাহিনিও অনেক জানা ছিল। মাঝে মধ্যে বাড়ির মহিলারা তাকে রাতে দাওয়াত দিয়ে আনতেন। রাতে কোনো একঘরে খাওয়া দাওয়া করানোর পর উঠোনে মাদর বিছিয়ে আশে-পাশে মহিলাদের ডেকে তার গান শোনত।

www.pathagar.com

এ ধরনের গীতকে 'ভুনুতি' বলা হত। গীতে পর্যাক্রমে বয়াতি নেচে-গেয়ে ঠাট্টা, হাস্য-রস যোগে পরিবেশন করত। পুথি পাঠেরও শেষ পর্যায়ের রেওয়াজ ছিল। রোদনের পালা আসলে মহিলারা অনেকেই ঢুকরে কেঁদে উঠত।

মুদ্রিত কোনো পুথি বা গ্রন্থে শাবাল কন্যার গানের কোনো কাহিনি পাওয়া যায়নি। সম্ভবত গ্রাম্য কোনো লোককবির কাহিনি বা গীত হতে পারে। যা মুখে প্রচলিত ও গীত হয়ে আসছিল।

কাহিনি : রাজ-নন্দিনী অর্থে সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ কৃষক পরিবারের কন্যা। তার সাথে রাখাল বালকের প্রণয়। কিন্তু রাখালকে বন্ধু বা স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। রাজ-নন্দিনীর জন্মক্ষণ হতে শুরু করে একে একে ষোলো বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বয়ক্রমের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য এ গানে তুলে ধরা হয়েছে।

আকাশে পূর্ণ শশি। মধ্যরাতে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়, যে গ্রহণের রাতে ও সময়ে ছাওয়াল কন্যার জন্ম। ঐ চন্দ্রের গ্রহণই শাবাল কন্যার সমগ্র-জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে।

কাহিনী ব্যাখ্যায় : ছাকু সরকার দোহার : মোহাম্মদ

২

সাদু পালন কর, সাদু দয়া কর, জবত পুরন্ত কন্যার বছরের বারো... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বছরের দুই।
মা-বাপে পালন করে বুকের পরে থুই... ঐ
যবত শাবাল কন্যা বছরের তিন
নবীন সাধুর ধলা ঘোড়া আমির সাধুর জিন... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বছরের চাইর
পান ছিরিয়া কন্যা গুয়া সারি সারি সাধু পালন কর... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বছরের পাঁচ
হাইস করি লাগার কন্যা কালি তারা বাঁশ
কালি তারার বাঁশে জান ঘন ছাড়ে হোল
আস্তে আস্তে ফুলি উঠে নবীন সাধুর কোল-সাদু পালন কর... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বছরের ছয়
বন্ধু-বান্ধবের সাথে নানা কথা কয় সাধু পালন কর... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বছরের সাত
হাঁড়ি পাতিল লোই কোইন্যা রাইনতো গেছে ভাত সাধু পালন কর... ঐ
ভাত রাঁধিয়া কন্যা চাইর দিগে চায়
আহারে দুঃখিনির ভাত কেবা জানি খায়
সাধু পালনরে সাধু ধৈর্য ধর যবত শাবাল কন্যার বছর বারো।
যবত শাবাল কন্যার বছরের আট

www.pathagar.com

মা বাপে গড়াই দিল সোনার ওনা খাট-সাধু... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বছরের নয়
তাঁতির বাড়ি দিল বানা ষোল আর সতেরয় সাধু... ঐ
তাঁতির বাড়ি দিয়া বানা না ছোড়ালে কড়ি
সেই হইতে তাঁতির হোলায় না ছাড়িল বাড়ি সাধু... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বছরের দশ
আস্তে আস্তে বাড়ে কন্যার বিয়ার বয়স, সাধু পালন কর ... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বছরের এগারো
আস্তে আস্তে করে বিয়ার যোগাররে সাধু পালন কর ... ঐ
যবত শাবাল কন্যার বার বছর হয়
গেরামবাসী সকলে বিয়া দিতে কয় সাধু ধৈর্য ধর ... ঐ
বিয়ার কতা শুনিরে কন্যায় বার মাসী গায়
কার কাছে বিয়া দিয়া বিপদ ঘটায়রে সাধু ধৈর্য ধর সাধু দয়া কর
যবত শাবাল কন্যা বছর বার সাদু পালন কর ... ঐ[২৯]

শাবাল কন্যার গান-এর পালাটি সংগ্রহ করা হয়েছে লোককবি সফি উল্ল্যাহর কাছ থেকে (পিতা : আমিন উল্ল্যাহ, আমিন উদ্দিন গাজীর বাড়ি, পূর্ব সৈয়দপুর, লক্ষীপুর)। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল শাবাল কন্যার ১২ বছরের বর্ণনা। তার ভাষ্য অনুযায়ী এ-গান শুনেছেন ও শিখেছেন বাড়ির এক আত্মীয়ের (দোয়ালিয়া বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী) কাছ থেকে। মহিলা সৌখিন গায়ক ছিলেন। বাড়ি বাড়ি বিশেষত বিয়ের আসরে ঐ মহিলা দল নিয়ে গান গাইতেন। ঐ বাড়ির আবদুস সালাম (পিতা : মুজাফ্‌ফর মিয়া), মোছাম্মদ (পিতা : মুছা মিয়া) যারা ছিল প্রখ্যাত গজলকার, কবিয়াল, লোককবি নেছার সরকারের দোহারী। তাদের মতে ১৬ বা ২০ বছরের কাহিনি ছিল শাবাল কন্যার গানে। তারা শৈশবে ঐ গান বিভিন্ন বিয়ের আসরে গেয়ে বেড়িয়েছেন। বর্তমানে তাদের বয়স ৭০-৭৫ বছর। ঐ বাড়ির আবুল কাশেমের মতে ২০ বছরের পালা।

অবশেষে সাখাওয়াত সরকারের কাছ থেকে অনেক কসরতের পর পালার ভিন্নতর পাঠ উদ্ধার করা হলো।

শুরু হলো দুই কবির পর্যালোচনা, কাহিনিটা আসলে কী? এটা কি পুথি না পালা, না গীতিকা? এর মূল কাহিনি-ই বা কী? দুজনে একমত হলেন, এ গীতিকা বা পালায় রাজ-নন্দিনী হলো নায়িকা। সে রাজার মেয়ে। সম্ভবত গোপীচাঁদের (কিচ্ছা) মেয়ে।

চিত্রকল্প : 'ভবরাজা গোপীচাঁদরে'। কবির উদ্বৃত এ সুর লহরী থেকে অনুমতি হয় যে নন্দিনী গুপিচাঁদের মেয়ে। আর নায়ক তাইচ্ছা বা তাঁতির ছেলে। সে রাজবাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

www.pathagar.com

চিত্রকল্প : সেই হইতে তাইচ্ছার হোলা না ছাড়িল বাড়ি। এখানে হয়তো নায়ককে কঠোর পরিক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে।

চিত্রকল্প : সাধু পালন কর রে, সাধু ধৈর্য ধর যবৎ পুরন্ত কন্যার বছর বারোরে সাধু পালন কর। এ পালন কর বা ধের্য ধর কি কঠোর ব্রত? কোনো শর্ত পূরণ বা তপস্যা?

কবি জানালেন, এটা তাঁর ৫০-৬০ বছর আগের শোনা গান। তবে লিখিত পুথি, পুস্তকের নাকি অলিখিত মৌখিকভাবে অতীত হতে লোকমুখে চলে আসছে? তাঁর অভিমত এটা লিখিত কোনো গ্রন্থের নয়, মেয়েরা বা মহিলা গায়কেরা এ গান বাড়িতে গেয়ে শোনাতেন। তাঁর ছোট বেলায় বিভিন্ন বাড়িতে মহিলাদের কণ্ঠে এ গান শুনেছেন। কোনো আসরে এ গান তিনি পাননি। তাঁর মতে হয়তো নায়ক, নায়িকা উভয়ের বারো বছরের বর্ণনা এ পালায় থাকতে পারে।

আবার এও হতে পারে, কোনো সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারের মেয়ে নন্দিনী আর অনুল্লেখ্য বা উহ্য নায়ক রাখাল বা রাখপাল। জমিদার বা কৌলিন্য পরিবারের মেয়ে নন্দিনীর সাথে রাখাল বালকের প্রণয় কাহিনিও হতে পারে।

সাকি উল্লার নিকট থেকে পাওয়া ও অপরাপর দোহারিদের থেকে পাওয়া পালায় দেখা যায়, 'রাজনন্দিনী আমি রাখপাল বোলাইবোরে, বন্ধু বোলাইবো কোনো লাজে...এরপর বিভিন্ন বয়েসে নন্দিনীর অবস্থা, অবস্থান (মন ও মননের) আচরণ, কর্ম ও বয়ঃক্রম অনুযায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ পাওয়া যায় এ পালায়।

শাবাল কন্যার গানের ভাষাগত ও বর্ণনা বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, এর কাল প্রাচীন (যাদের কাছে পাওয়া গেছে তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তাদেরও ছোটবেলার শোনা। তাদের বর্তমান বয়স ৭০-এর কাছাকাছি, সাখাওয়াত সরকার কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন)। এর ভাষা লক্ষ্মীপুরের আঞ্চলিক।

এক বছর বয়ঃক্রমে বাচ্চাদের গলায় মাদন করি বা কড়ি দেওয়ার রেওয়াজ লক্ষ্মীপুরে (সাবেক নোয়াখালীতে) ছিল। অথবা গলায়, কাঁধে কালো কালির ফোঁটা দেয়ার রেওয়াজ ছিল। দুই বছর বয়সে মা-বাপে বুকের উপরে রেখে সন্তানদের লালন পালন করত। তিন বছর বয়সে, বাচ্চাদের মুখে সামান্য মাছ খুঁটে দেয়ার রেওয়াজ ছিল আর গুইল্লা টেংরা লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে (দক্ষিণের চরাঞ্চলে) প্রচুর পাওয়া যেত–যা নদী অববাহিকার মাছ এবং খুবই সুস্বাদু। পুনঃ ডুইল্লা শাড়ি হিনতে কন্যার মনে লাগে ঘিন- এ ডুইল্লা শাড়ি লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে মহিলাদের এক সময়ের আভিজাত্যের স্মারক ছিল। তিন বছর বয়সের কন্যা সন্তানদের শাড়ি পরিয়ে বধূরূপে কল্পনার রেওয়াজ ছিল। চার বছর বয়সে পাশা খেলার বর্ণনা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এ বয়সে লক্ষ্মীপুরের শিশুরা অদ্যাবধি বিভিন্ন গুটির খেলা খেলে থাকে। হয়তো পাশা খেলা প্রচলিত উক্ত সময়ে অথবা কোনো না কোনো গুটি সারিবেঁধে বসে খেলার অনুষঙ্গ এটি। পাঁচ বছর বয়সে এ জেলার শিশুরা পাশাপশি বাড়িতে বাগ-বাগানে ঘুরে বেড়ানো গ্রামাঞ্চলে এখনো কিছুটা রেওয়াজ বিদ্যমান। আর এ বয়সে বাঁশের করুল (নবীন চারা) ছিঁড়ে এনে খেলা করার প্রয়াস এখনো লক্ষ করা যায়। প্রায় বাড়িতে এখানো বাঁশ ঝাড় বিদ্যমান।

www.pathagar.com

ছয় বছর বয়সের শিশুকন্যারা সন্ধ্যার সময় শোবার বিছানা করার ফরমায়েশ এখনো প্রচলিত এ জেলায় লোকজীবনে।

সাত বছর বয়সে উঠানে 'ঝোলাভাত' রান্না করে খাওয়ার রেওয়াজ আজো লোকজীবনে পুরোপুরি বিদ্যমান। শুকনো লাকড়ি খুঁজে সংগ্রহ করা ডালপালা, বিভিন্ন গাছের কচি পাতা, লতা, ফুল, মূল, কুঁড়ি, শিকড় কাল্পনিক মাংস, পোলাও, কোর্মা, ডিম, মাছ, পিঠা, ভাত রান্না করে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। আট বছরের শিশুদের জন্য আলাদা খাট বা চৌকির প্রচলন প্রাসঙ্গিক।

নয় বছর বয়ঃক্রমে নৌকায় চড়ে বর্ষাকালে সয়লাব পানিতে সাঁতার কাটা, ঘুরে বেড়ানোর জন্য অদম্য আকর্ষণ কেউ রোধ করতে পারত না। বিশেষত যে সময় পালা রচিত ও গীত হয়েছে সে সময়ে এ অঞ্চলে বর্ষায় পানিতে মাঠ, ঘাট, নদী, নালা, বিল, ঘরবাড়ি ডুবে থাকত। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যেতে বর্ষায় একমাত্র অবলম্বন ছিল কলার ভেলা, তালের কোঁদা, কোষা, ডিঙ্গি, নাইওরি বিভিন্ন জাতীয় নৌকা। ৮-৯ বছরের ছেলেমেয়েরা চড়তে ভয় পেত সে অনুষঙ্গ এখানে বর্তমান। লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার উত্তরাঞ্চলে এখনো বেশ তালের কোঁদা বর্ষায় দেখা যায় যা যাতায়াতের অবলম্বন। বিল থেকে ধান আনা, গরুর ঘাস কাটার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

দশ বছর বয়সের কিশোরীদের প্রতি মানুষের বিশেষ আকর্ষণ বা মনোযোগ হেতু কিশোরীকে অপরিপক্ক বা অপ্রাপ্ত বয়স (প্রকারান্তরে রাখাল বন্ধুকে) কাঁচা লেবুর সাথে উপমিত করা হয়েছে।

বারো বছর বয়সে নন্দিনিকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করা হয়েছে (স্বামীর ঘরে পাঠানো হয়েছে) যা অতীতে এ অঞ্চলে কন্যা সন্তানদের ক্ষেত্রে শতভাগ প্রযোজ্য ছিল।

টিকা : সাবাল-সাবালক অর্থে, শাবাল। রাজ নন্দিনি-রাজার মেয়ে। কোইন্যা-কন্যা, রাখপাল/রাকপাল-রাখাল। বোলাইবো-বোলব, বলব। মাদন কোড়ি-একজাতীয় কড়ি। রিয়া- একজাতীয় মালা। হরে/উরপে-পরে, উপরে। বৈয়ে-বসে। গুইল্লা টেংরা, ডুইল্লা শাড়ি (আঞ্চলিক শব্দ) হিঁদতে= পিঁদতে। মাইয়া-মেয়ে, কন্যা। নোয়া-নতুন। ঘাঁড়া-বাড়ির দরজা, দাওয়া।

হরান-পরান, অইছে-হৈছে, হয়েছে। দারুয়া- দাড়ি-লাকড়ি। ছড়াই-চড়ে। ভাত, চালন-তরকারি। রাঁধি-রান্না করে। বানাই দিছে- বানিয়ে, তৈরি করে। হাতানো-পাতানো। লেমু-লেবু।

বিকল্প : ১, ২ পাঠ উভয়েই একই রকম।

৩-তিন শব্দের পরে জিন শব্দগত ছন্দমিল রয়েছে কিন্তু ঐ পদের অর্থগত মিল খুঁজে পাওয়া ভার বিশেষত পালার মূল কাহিনির বা সূত্র পাওয়া না গেলে এ পদের অর্থ বের করা দুরুহ হবে বৈকি!

বারো বছর বয়সে পান ছিঁড়ে কারো মুখে দেওয়া বা নিজের মুখে দেওয়া গুয়া বা সুপারি সারি সারি সাজিয়ে বা গুছিয়ে রাখার চিত্র লক্ষ্মীপুরে আজো শতভাগ বিদ্যমান।

www.pathagar.com

সুপারি জেলার অন্যতম ঐতিহ্যের বাহক। পানের বরজ কমে গেলেও রায়পুর, কমলনগর, রামগতিতে এখনো চোখে পড়ার মতো বরজ রয়েছে। পান খাওয়া আজো প্রতি পরিবারে বিদ্যামান।

৫- উভয় পাঠে বাঁশের প্রসঙ্গ রয়েছে।

৬- বয়ঃক্রমে ছেলেমেয়েরা সমবয়সীদের সাথে গল্পগুজবে মত্ত থাকে ও মনের কথা বলে থাকে।

৭-৮ সাদৃশ্য রয়েছে।

৯- নয়ের সাথে ১৭ ছন্দমিল রয়েছে। কিন্তু তাঁতির বাড়ি দিল বানা ষোল আর সতেরয় সাখাওয়াত সরকারের মতে এ ষোলো আর সতেরো হলো টাকার পরিমাণ বা কড়ির পরিমাণ। ষোলো বা সতেরো টাকা শাড়ির বায়না দিয়েছে নায়ক তাঁতির ছেলে নন্দিনির শাড়ির জন্য আর কড়ি বা টাকার অভাবে তা ছোড়াতে পারলো না প্রকারান্তরে, সেই হতে তাইচ্ছার হোলায় না ছাড়িল বাড়ি মানে নন্দিনির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। নয়-দশ বছর বয়সের মেয়েদের শাড়ি পরা অপরিহার্য ছিল।

১০- দশ বছরে নন্দিনি সাবালক হতে চলেছে।

১১- এ বয়সে কন্যার মা-বাবা মেয়ের বিবাহের বন্দোবস্ত, করে থাকত।

১২-বারো বছর বয়সে মেয়েকে অবশ্যই বিয়ে দিতে হতো গ্রামবাসী এ বয়সে পরম লালিত কন্যা বিয়ের আলাপ বা কথা শুনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত কল্পনা করে শংকিত হতো-যা বারমাসি (বিচিত্র শোকগাঁথা, মিলন, বিরহ-বাংলা বার মাসের বৈচিত্র্য রূপকে মানব মনের প্রতিফলন প্রকৃতিতে) গানে বিধৃত হতো। ছাবাল কন্যা বাবা-মার আসন্ন বিচ্ছেদে বারোমাসি গেয়ে সান্ত্বনা খোঁজে প্রকৃতির মাঝে।

পাঠ রূপান্তর বৈসাদৃশ্য : কথক সাফি উল্লার কাছ থেকে পাওয়া পালায় দেখা যায় নায়ক উহ্য বা রাখাল ছেলে। পালা পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় নন্দিনী রাজপরিবারের বা অভিজাত পরিবারের মেয়ে। রাখাল তার প্রণয়ী বা প্রেমিক। কিন্তু আভিজাত্যের কারণে নন্দিনী রাখাল ছেলেকে বন্ধু বা স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। বারো বছরে তার বিয়ে হয়ে গেলে অবলীলায় সে স্বামীর সংসারে চলে যায় রাখাল বন্ধুর জন্য তার কোনো আক্ষেপ বা বিরহবোধও দেখা যায় না শুধুমাত্র দশ বছরের বর্ণনায় একটা আর্তি ফুটে ওঠে।

ছিঁড়ি ও নারে কাঁচা লেমু খহিতে লাগবো কষ-বে বন্ধু বোলাইবো কোন লাজে। এ ছাড়া পুরো পালায় নন্দিনীর নানাবিধ বর্ণনা। এ রাখাল গ্রাম্য রাখালও হতে পারে, হতে পারে নন্দিনীদের পরিবারের রাখাল। রাজনন্দিনী, রাজার মেয়ে, নায়িকা হিসাবে আলাদা নাম নেই। পক্ষান্তরে ছাকু সরকারের কাছে পাওয়া পালায় দেখা যায় নায়িকা ছাবাল কন্যা এখানে রাজনন্দীর কোনো অনুষঙ্গ নেই। আবার কথক সাফিউল্লার পালায়ও শাবাল কোইন্যার বর্ণনা।

www.pathagar.com

ছাকু সরকারের পালায় দেখা যায় নায়ক তাঁতির ছেলে, নায়িকা শাবাল কন্যার পৈতৃক পরিচয় পাওয়া যায় না। এ পালায় নায়িকাকে কঠোর ব্রত পালন, ধৈর্য ধারণ করার ও অপেক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে শাবাল কন্যার বারো বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। নায়ককে সাদু আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাদু হয়তো সওদাগর হতে পারে। যখন শাবাল কন্যার বছরের তিন : নবীন সাদুর ধলা ঘোড়া আমির সাদুর জিন। ছাবাল কন্যা বারো বছর বয়সে উপনীত হলে গ্রামবাসী কানাকানি, করতে থাকে ছাবাল কন্যার বিবাহের ব্যাপারে তা উপলব্ধি করে শাবাল কন্যা বার স্বামী : পালার কোথাও নায়কের জন্য নায়িকার অনুরাগ, বিরাগ, আক্ষেপ কিছু বই উল্লেখ নেই। বলাবাহুল্য কথক সাফিউল্লার পাল্লার নায়ককে বা প্রণয়াকে উপেক্ষা করার প্রয়াস লক্ষণীয় যদিও প্রণয়াসক্ত।

রাজ নন্দিনী, আমি রাখাল বোলাইব্যেরে বন্ধু বোলাইবো কোন লাজে।

সে ক্ষেত্রে নায়ককে শুধু নায়িকার যৌবন প্রাপ্তি বা বারো বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে, ধৈর্য ধারণ করতে, কঠোর তপস্যা বা ব্রত পালনের কথা বলা আছে। 'সাদু পালন কর, সাদু ধৈর্য ধর জবত শাবাল কন্যার বছরের বারো।'

সর্বোপরি উভয় পালাতে শাবাল কন্যার বারের বর্ণনা প্রায় একই রকম, তবে চিত্রকল্পে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে ৩, ৪, ৬, ৯, ১০, ১২-তে।

উভয় পালার ভাষা লক্ষ্মীপুরের আঞ্চলিক ভাষা তা প্রশ্নাতীত। যেমন : যবত-যে পর্যন্ত, ধলা-সাদা (ধলাঘোড়া-সাদা ঘোড়া), গুয়া-সুপারি, কালিতারা বাঁশ, কয়- কহে, হাঁড়ি- পাতিল লোই, কোইন্যা- কন্যা, রাইনতো- রান্না করতে, তাঁতির হোলা- তাঁতির ছেলে, হোল্লা-পোলা, ছেলে, গেরাম- গ্রাম।

৩

রাজ নন্দিনী আমি রাখপাল বোলাই বোরে
বন্ধু বোলাইবো কোন লাজে (২)
যখন শাবাল কন্যার বছরের এক হারে যখন... এক
ডান কাঁধে তার মাদন কড়ি বাঁ কাঁধে তার রেখরে বন্ধু -(২)
ডান কাঁধে তার মাদন কড়ি, বাঁ কাঁধে কার রিয়া
এমন সুন্দরী কোইন্যা কে-বা করে বিয়ারে, বন্ধু... ঐ
যখন... দুই
মায়ে-বাপে পালন করে বুকের (হরে) উরপে থুইওরে... ঐ
যখন... চাইর
পাশা খেলাইতো বৌ হয়ে মাইয়া সাইরও সাইরবে... ঐ
যখন... পাঁচ।
বন্ধুর বাড়ি দেখে আইলাম নোয়া করুল বাঁশরে (পাঠ - ১)
ঘাঁড়ার আগাত রুয়ে আইলাম... (পাঠ- ২)

www.pathagar.com

নোয়া করুল বাঁশও নয়রে সাদা সাদা ফুল
রাইতে-রাইতে পুরা হইলো হরান বন্ধুর কোলরে (পাঠ- ১)
... কোলরে (পাঠ- ২)
যখন বছরের ছয়
বিছানা বিছাইতে মাইয়ার মনে লাগে ভয়রে... ঐ
যখন... বছরের সাত
তৈয়ার অইছে দারুয়া দাড়ি ছড়াই দিছে ভাতরে ... ঐ
ভাত ছালন রাঁধি কইন্যা চাইরঅ দিগে চায়
চাইনিরে হরান বন্ধু ভাত খাইতে আয়রে ... ঐ
যখন... বছরের আট (২)
মায়ে-বাপে বানাই দিছে সোনারওনা খাটরে ... ঐ
যখন... বছর নয় (২)
নৌকা চড়িতে কন্যার মনে লাগে ভয়রে ... ঐ
সেই নৌকার মাঝে আছে হাতানো জলি
কুঁদাইয়া কুঁদাইয়া তোলে সেই নৌকার গুলিরে ... ঐ
যখন... বছরের দশ (২)
ছিঁড়িও নারে কাঁচা লেমু খাইতে লাগবো কষরে ... ঐ
যখন... বছরের এগার (২)
যখন... তিন
গুইল্লা টিংরা খাইতে কোইন্যার মুখে লাগে ঘিনরে (পাঠ- ১)
ডুইল্লা শাড়ি হিঁদতে কোইন্যার মন লাগে ঘিনরে (পাঠ- ২)
যখন... বার (২)
চইলে গেল স্বামীর ঘরে পাতিল সংসাররে... ঐ ।[৩০]
সংগ্রাহক মহব্বত উল্লাহ

ঢ. মাজারের গান (ধর্মসংগীত)

ফকির এমদাদ হুজুরের (রহ) পূণ্যাত্মার প্রতি উৎসর্গ
ও কালে
কালের কলে আকাশ ঘুরে, ঘুরে পৃথিবী । ঐ
আকাশ ঘুরলে চাঁদ, তারা, থাকে কি বাকি?
বল আল্লাহর নাম, বল রাসুলের নাম । ঐ

www.pathagar.com

যত পির মুরশিদ, ওস্তাদ গুরুর নাম।
তারা যত বড় দেখ, তা কি চন্দ্রের সমান।
আকাশ তো সকলে দেখে, খোদা দেখে কয়জনে। ঐ
যুগের এই যুগান্তকালে, মানুষ কথা বলে কলের তারে।
নিজের সারা নিজে সারে, কথা বলে সম সারে। ঐ
ও আপন মন, দেহের তারে, জিকির কর আল্লাহর তরে।
শত তারে বাঁধা, বাঁধলেন যিনি,
স্মরণ কর তারে দিবা রজনি। ঐ[৩১]

অমর প্রেম

ফকির গো, ও ফকির, মরমের কথা মরমে রাখিয়া,
বলে দাও কানে কানে।
তোমায় মাথায় রাখি না, ঝাকালে মাথা, যদি তুমি পড়ে যাও।
তোমায় নয়নে রাখি না, নয়নের জলে, যদি তুমি ঝরে যাও।
পশ্চিমের মেঘনায়, পূর্বের মেঘনায়, দুই মেঘনাতেই ঢেউ।
তোরাবগঞ্জের ভবিষ্যৎ খবর, রাখেনাতো কেউ।
আমি ধুপ অনলে পুড়িয়া, রাখতে চাই স্মৃতি।
তোমার যদি মনে চায়, আমায় করিও প্রিতি।
একই জায়গায় দুটি বন্দর, কি করে হয়, বলানাগো শুনি।
দেখা যদি দিব্য হয়, থাকে যেন জনশ্রুতি।
"নদীতে তরি, নগরে উড্ডয়ন তরি,রহম কর
মাবুদ আল্লাহ তোমার নাম সরী" ।[৩২]

ণ. উড়ি গান, বিয়ের গান

মদিনায় যাব কেমনে (২)
দিবানিশী এই ভাবনা আমারি মনে। ঐ
মদিনার ধূলাবালি, চোখে দাও না সুরমা বলী (২)
কইব কথা পরান খুলি নবরি সনে। ঐ
মদিনার পথে পথে, ঘুরছেন নবি দিনে রাতে
কাফেরেরা ক্ষেপছে তাতে ইসলামের সনে। ঐ
মদিনার পশু-পাখি, রসুল নামে ডাকি ডাকি
হইছে হয়রান থাকি থাকি, নবীর কারণে।ঐ
যদি বনের পাখি হইতাম, পলকে উড়িয়া যাইতাম (২)
কইতাম কতা নবির হইয়া বাতাসের কানে। ঐ[৩৩]

www.pathagar.com

তথ্য-উপাত্ত

বিয়ের গজল/গান

নাম, কর্ম ও গায়নরীতি	আসর বিবরণ	পরিবেশন কৌশল	প্রতিক্রিয়া
বিয়ের গান (গজল) দুই দলে (বরের পক্ষ ও কনের পক্ষ) পালা ক্রমে গাওয়া হয়। একদল বরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন ও প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পুনঃ প্রশ্ন জুড়ে দেন প্রতিপক্ষকে। অনুরূপভাবে কনে পক্ষও তাই করে থাকেন। উভয়পক্ষে একজন প্রধান শিল্পী, দুইজন সহকারী ও বাকি ৮-১০ জন পয়ারি বা দোহার থাকে।	কনের বাড়িতে বিয়ের গেট থাকে। সেখানে অপেক্ষা করে বরের আগমনের জন্য। বরের বাড়িতে বর তার মা-বাবাকে ছালাম করে পাল্কিতে উঠে লগ্ন থেকে শুরু হয় গজল এর টান। প্রথমে তাকবির দিয়ে (নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার) ধুলামিয়া কি- জয় (দুলার নাম) কনের নাম কি- ক্ষয়। এরপর গ্রাম নাম- জয়, কনের গ্রাম সাং কি- ক্ষয়। এরপর পুরো পথ গজল গাইতে গাইতে অতিক্রম করে চলে কনের বাড়ির দরজায় গেটে যাওয়া মাত্র কনেপক্ষরা প্রশ্ন জুড়ে দেয় গানে গানে। বরপক্ষ উত্তর দেয় গানে গানে। এখানে চলে এক আসর। বিয়ে পড়ানোর পর খাওয়া দাওয়া পর শুরু হয় মূল আসর। উভয় পক্ষই নিজেদের মাহাত্ম ও নিজেদের সরকারের মাহাত্মা উভয়ের পীর ফকিরের মাহাত্মা বর্ণনা করে। গানে গানে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হয় প্রতিপক্ষকে। প্রতিপক্ষও তদ্রূপ ক্রিয়া করে। এভাবে তামাম রাত ছেড়ে চলে গজলের আসর। গজল শুনতে পাঁচ দশ গ্রামের নারী-পুরুষ ভিড় জমাত।	মূল আসরে কখনো দলের প্রধান শিল্পী কখনো সহকারী দুজন ধূয়া ধরত দোহাররা ঘুরে ঘুরে ধূয়া ধরতো শিল্পীর গান শেষ হবার বা বয়ানের শেষ হবার পর সাথে সাথেই পয়ারিরা ধূয়া ধরত। শিল্পী কখনো নাচতো কখনো হেসে হেসে গান গাইতো। পয়ারিদের মধ্যে একজন বা দুজন কৌতুকাভিনেতাও থাকত যারা পায়ে ঘুঙ্গুর পরে নাচতো তড়পাতো ও প্রতিপক্ষকে নানা কসরত দেখিয়ে আসর সরগরম করত ও শ্রোতাদের আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে তুলত। শিল্পীরা অনেক সময় মেয়েদের সাজ পরতো নাচতো-গাইতো। অনেকে হাতে বালা, গলায় কাঁটা ও মাথায় শোলার টুপি রঙ্গিন বা সাদা টুপি পরিধান করত।	আসরে হার-জিতের ব্যাপার থাকত। কোন পক্ষ প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে বা এড়িয়ে গেলে ব্যাঙ্গাত্মক, রসাত্মক শ্লোক, ব্যাজস্তুতি ব্যবহার করত যারা মানুষের মন ভরাতে পারতেন তাদেরকে শ্রোতারা হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাতেন/উৎসাহ দিতেন, হাত তুলে দলকে সমর্থন জানাতেন। এমনকি অনেকেই এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, একশ টাকাও উপহার দিতেন। কেউ কেউ (পক্ষীয় লোকেরা) প্রধান শিল্পীকে টাকার মালাও পরিয়ে দিতেন।

www.pathagar.com

বিয়ের গজল/পয়ারিযোগে
গানের কলি ও প্রথম চরণ শ্রুতি
২৬/০৯/০১১ইং
দ্বীনের নবী আমার গরীব ছিল- নবী -ঐ
সংগীত : লোকসংগীত (বাউলগান), সদর
তারিখ : ০৯/০৭/০১১ ইংরেজি
স্থান : কুশাখালী লক্ষ্মীপুর, কাঠালী পোলের গোড়া, কালা দরবেশের আস্তানা
সময় : সন্ধ্যা ০৬ টা। এখানে লোকগানের আসর বসে প্রায়ই।
গানের ধরন : বাউল, ভাণ্ডারি, শ্যামা-কাউয়ালি।
প্রধান শিল্পী : মহিউদ্দিন দুলাল

সহশিল্পী : কালা দরবেশ, কাস্টম দেলওয়ার, আবুল কালাম, আবুল, মামুন, রশিদ ভাণ্ডারী, ফারুক, বাবুল, দুলাল, মতিন ভাণ্ডারী, জামাল ও আরো অনেকে।

দুলাল হুজুর হারমোনিয়াম, দোতারা (৮+১০ যন্ত্রে পারদর্শী)
আবুল কালাম- যন্ত্র : ঢুগী, করতাল
কালা দরবেশ- যন্ত্র : একতারা
কাস্টম দেলওয়ার- যন্ত্র : বাঁশি
জামাল উদ্দিন : ঢোল, দোতারা

শিল্পী আবুল কালামকে পেয়েছি তার বাড়িতে ব্যাপক কথা ও আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিন সংগীত বিষয়ক কাজে এ আখড়ায় আমার যাতায়াত রয়েছে। আখড়ায় পৌঁছি ০৮ টায়। কালা দরবেশ বয়সের ভারে ন্যুজ। তবু ভাণ্ডারির ভক্ত। একতারা বাজিয়ে বাউল সংগীত, ভাণ্ডারি, মারফতি গান করেন। এদের সংগীত গুরু দুলাল হুজুর রাত ২ টায় বাড়ি ফিরি। আসর শুরু হয় ১০ টায়। প্রথমেই দুলাল হুজুর ঢোলের বোলও দুরূদ শরীফ, অতঃপর কাউয়ালি শ্যামা, বাউল গান। আমরা দোহার। বাঁশি-কাস্টম দেলওয়ার, দোতারা জামাল, ঢুগি-আবুল কালাম, জুড়ি দুলাল, বাকিরা দোহারি। একসময় কালা দরবেশ একতারা নিয়ে শুরু করলেন প্রখ্যাত কবিয়াল সুনীল শীলের মরমী গান। আপন মনে মাওলা জপ নিজের ঈমান ঠিক করি, দোনালা বন্দুকে শিকার করে শিকারি।

(ক) নামকরণ গানরীতি	(খ) আসর বিবরণ	স্থান/আখড়া	কাগায়ক	সময়
বাউল সংগীত- হেলে-দুলে, অঙ্গ-ভঙ্গি ও নিবিড় চিত্তে	শিল্পীরা ও বেশ কিছু সংখ্যক সমজদার ২০-২৫ জন। প্রত্যেকেই গৃহ-সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রকৃতির মানুষ	কালা দরবেশের বাড়ি ও আস্তানা।	লোক বা বাউল শিল্পীরা। এর গায়ক হলেও ১০০% লোক শ্রমজীবী মানুষ। ১। দুলাল হুজুর মাদ্রাসার	রাত ১০-১১ টার দিকে

www.pathagar.com

পরিবেশন	সংগীত প্রাণ। প্রধান শিল্পী মহিউদ্দিন দুলাল হুজুর। বাকি শিল্পীরা সহযোগী। কয়েটা মোমবাতি ও আগর বাতি জ্বলছে। মাঝে মধ্যে রং চা, পান, সিদ্ধি, সিগারেট আল দুলাল হুজুরের বাউল ও মারেফতি বয়ান। কাস্টম দেলওয়ার ও আবুল কালাম খেইন উঠে দাঁড়িয়ে যান ও জযবা তোলেন কখনো হৈ হৈ কখনো হেই, হেইও ইল্লালা জিকির। শিল্পী কখনো ঢোল, কখনো হারমোনিয়াম, কখনো দোতারা টেনে সুর তোলেন।	কাঠালী পোলের গোড়া, কুশাখালী, সদর, লক্ষ্মীপুর।	শিক্ষক ২। কাস্টম দেলওয়ার অব. কাস্টম কর্মকর্তা ৩। আবুল কালাম কাঠমিস্ত্রী (মৃতার) ৪। জামাল ইট ভাটার শ্রমিক ৫। আবুল দোকানি ৬। দুলাল কাঠমিস্ত্রী ৭। মামুন কাঠমিস্ত্রী ৮। ফারুক দোকানদার ৯। বাবুল কৃষিজীবি ১০। কালা দরবেশ কৃষিজীবি প্রতি বৃহস্পতিবার এ আখড়ায় এরা একত্র হয় ও আসরে বসে। কখনো কখনো ব্যত্যয় হয়। সামাজিক বাধা/বিধি মাঝেমধ্যে আসে। মৌলবাদীরা মাঝে মধ্যে জঞ্জাল বাধায়।	

পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবি।

বাদ্যযন্ত্র : হারমোনিয়াম, ঢোল, দোতারা, একতারা, ঢুগী, বাঁশি, করতাল/জুড়ি/কখনো খঞ্জনি। পৃষ্ঠপোষক : নিজেরা নিজেরা। তবে দুলাল হুজুর কমলনগর থেকে আসেন। উনি দরবেশের আস্তানায়ই আসরের সময় থাকেন। সাইকেলে কমলনগর (৭-৮ কি. মি.) দূরত্ব) থেকে আসেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া দরবেশ সাহেব করান।

কবিগান সরকারি পালাগান, সদর

১০ (খ) পালাগান : (কবিগান সরকারি)

পালাগান বলতে দুধরনের ।

এক : বিয়ের আসরে গীত হইত। বরপক্ষ ও কনেপক্ষ পালাক্রমে গানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন করত ও প্রতিপক্ষের উত্তর দিত। নাম : বিয়ের গজল।

দুই : পালা গানের আসর হতো এখনো প্রচলিত আছে লক্ষ্মীপুর জেলার বিভিন্ন জনপদে। সাধারণত শরিয়তি ও মারেফতি দুদল দুদাঁড়া বা বিষয় নিত ও পরস্পরকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিত নিজের বিষয়ে প্রতিপক্ষ তার যথাযথ উত্তর দিতে বাধ্য থাকত। উত্তর না

www.pathagar.com

দিতে পারলে হেনস্থা করে ছাড়ত প্রতিপক্ষ। এতে খিস্তি, খেউড় ব্যবহৃত হত। এ জাতীয় পালাগানে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিষয় আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

পোশাক : পায়জামা, পাঞ্জাবি

বাদ্যযন্ত্র : ঢোল, বাঁশি, জুড়ি, হারমোনিয়াম, ঘুঙ্গুর।

তিন : সরকারি

এতে দুদল থাকে প্রতিযোগী। নির্ধারিত দাঁড়া বিষয় থাকে। দাঁড়া বা বিষয়ান্তরে যাবার সুযোগ নেই। নিজের দাঁড় সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করে অপরপক্ষকে হেনস্থা বা নাজেহাল কটাক্ষ করা হয়। এতেও অপরাপর পালাগানের মতো এক থেকে তিনজন গায়ক ও ১০-১২ জন দোহার বা পয়ারী থাকে বাদ্যও তারাই বাজায় ও ধুয়া ধরে। বিষয় : ধনী-গরীব, মুসাফির, ফকির, তুরিকত- হাকিকত।

চার : কবিগান, কবিগান ও পালাগানের অন্তর্ভুক্ত। অপর তিন ধারার মধ্যে এ ধারার পার্থক্য এর বহুমাত্রিকতা। সরকারি ও বিয়ের গজল গানে শিল্পী বা গায়কের স্বাধীনতা সীমিত। কবিগানে কবিয়াল বা শিল্পী নির্ধারিত দাঁড়ার বাইরে গিয়ে খিস্তি-খেউড়। টপ্পা বা চটকি কথার রসাল দিয়ে থাকেন। এতে কবি তথা আঞ্চলিক শ্রাব্য-অশ্রাব্য বুলি বা গালির যথেষ্ট প্রয়োগ করে থাকেন। দর্শক বা শ্রোতারা কবিয়ালের সাথে একাত্ম হয়ে যান ও হেসে কুটি কুটি হয়ে থাকেন। কবি গানের অন্যতম দাঁড়া সোনা-লোহার পালা

জেলে : চাষার পালা

রাজা : প্রজার পালা

ধনী : গরিবের পালা

ভাগ্য : বুদ্ধির পালা ইত্যাদি।

পোশাক : পাজামা, পাঞ্জাবি, কখনো লুঙ্গি, কখনো বাউল পোশাকি

বাদ্যযন্ত্র : ঢোল, করতাল, বাঁশি, খুঞ্জুরা, মাদল

পালা সংগ্রহ :

তথ্যদাতা : ছাকু সরকার, নেছার সরকার, মোহাম্মদ, নূর মোহাম্মদ, আবুল কালাম মেস্তরী (রমাপুর)।

ত. রস-সংগীত

নির্বাচনে নিজের প্রার্থীর গুণকীর্তন ও অপর প্রার্থীকে তুলোধুনো করার একটি নমুনা (প্রথমে একজন বা দুতিন জন গান বলে যাবে এবং শেষ হবার সাথে সাথে ক্যাম্পাসরত শত-শত লোক খুব খোশ মেজাজে গেয়ে চলবে।)

আল্লা বল, সামনে চল ওরে আমার ভোটার ভাই।

সমস্বরে... ঐ

www.pathagar.com

আহারে ভোটার ভাইহও এক দল।
সমস্বরে,
এই যোগ্য লোকরে ভোট না দিলে হবে রসাতল
(সমস্বরে) আহারে...
প্রার্থীর মধ্যে সবার সেরা আঁঙ্গ সবার মোখলেস ভাই
সমস্বরে...
এমন লোককে ভোট না দিলে শেষে কৈরবেন হায়রে হায়
(সমস্বরে) আহারে...
আরো একবার মেম্বার ছিল আলী আম্মদ হাডারী
সমস্বরে...
দুগা বোর দুধ খায় কন্টলের চিনি দি
(সমস্বরে) আহারে...
যত আছে রক্ত চোষা, যেমন আসামের মোশা
সমস্বরে...
এ রক্ত মাংস করবে শেষ উপাই বুদ্ধি নাই
(সমস্বরে) আহারে... ।

দ. সাইর (হাইঞ্চা বাদাম)

গোছা (ধরিও তালে তালে)
বট কোয়ালে বাসা করে রসি ঘরের চালে
গোছা...
যোয়ানেরাও হোই (সমস্বরে)
মায়ে বলে ছোড ছোড বাপে দেয় না বিয়া
আর কত কাল রাখব যৈবন আঁচল বাঁধিয়া
হায়রে বুকেতে বাঁধিয়া যোয়ানেরাও...
মায়ে বাপে দিছে বিয়া বুড়িয়া জামাই চাইয়া
সোনার যৈবন শেষ করিলাম
বুড়িয়ার হাকনা চুল বাছিয়া আরেও...
মায়ে বলে হুলবান হুলবান
বাপে বলে ঝি
এক্কুই রাইতে হাতকান কাপড় কেননে ভিজাইলি
জোয়ানেরাও হোই (সমস্বরে)
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তার তারা
যে নারীর সোয়ামী নাই ও তার আহার নিদ্রা হারা... যোয়ানেরাও হোই... গোছা

www.pathagar.com

বিয়ার তোনো ঠিয়া ভালা দুষ্ট লোকে কয়
রসি ঘর কিলগুতা খান ভালা জিনিস নয়
আরে জোয়ানেরাও হোই।[৩৪]
সংগ্রহ– গাজী ছালাম।

সংগৃহীত গান

রুয়া লাগে তের বুড়ি (কুড়ি) চানি বেশুয়ার গো হিসাব কৈয়লে বুঝতে পারবে কত
মিলের ঘর গো
ছানি বিছাই শোয়াইবো কত মিলের ঘর গো ঘর।
কেউ না পাশে আর রহিবো (২) যে যার কাজে চলি যাইবো
পয় ছয় বন্দের ঘর
পাখি উড়িয়া গেলে সবাই হবে পর
রুয়া লগে তির বুড়ি ছানি বেশুমার। ঐ

শিল্পীর ব্যাখ্যা : এইটা বসবাসের ঘর না
এইটা অইলো আঙ্গ যাবৎ জিন্দেগীর ঘর
টিকা : ঘর, কবর, রুয়া, বাঁশের ফালি,
ছানি= চাউনি, আচ্ছাদন। কলার বরগ বা পাতা
তারিখ : ১০-০২-০১২
সময় : সকাল ০৯টা

www.pathagar.com

(ক) নাম : মোহাম্মদ লোকমান

(খ) পিতা : আবুল খায়ের

(গ) মাতা : লুৎফর নাহার

(ঘ) ঠিকানা : গ্রাম : তিতার কান্দি (আনার বাড়ি) ডাকঘর : পাক রায়পুর, সদর, লক্ষ্মীপুর। সাবেক গ্রাম : দিঘলী, সদর

(ঙ) পেশা : জেলে এবং রিক্সা চালক।

(চ) বয়স : ৬৫

(ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৩য় শ্রেণি।

(জ) সাংস্কৃতির শাখা : পালাগান-বিয়ের গজল।

(ঝ) পিতা-মাতার পেশা : কৃষি।

স্থান : পথমধ্যে দাসের হাট, লক্ষ্মীপুর।

(ঞ) আবাস-জনপথের বিবরণ : পাতার ঘর। হোগলাপাতা ও কৃষি জনপদ। বাড়িঘর : পাতার ঘর, বেড়া, টিনের ঘর, দালান-অনুন্নত জনপদ।

(ট) পরিবারের লোকসংখ্যা : মোট ০৫ (পাঁচ) জন।

(ঠ) স্ত্রী : গৃহস্থালী, ধাড়ি, বটুনি শিল্পী

ছেলেরা : ০৩ ছেলে ইটভাটায় কাজ করে ও কৃষি শ্রমিক।

(ড) আয় : ২০০-২৫০ টাকা

(ঢ) দৈনিক আয় অনির্ধারিত : ১৫০-২০০ টাকা।

(ণ) সঞ্চয় : থাকে না-ঋণী

(ত) ভূমিহীন, সম্পদ বাড়ির সামান্য ভিটেবাড়ি কিছু হাঁস-মুরগি পালন করেন।

(দ) অভিভাবক ওস্তাদ : নেছার সরকার।

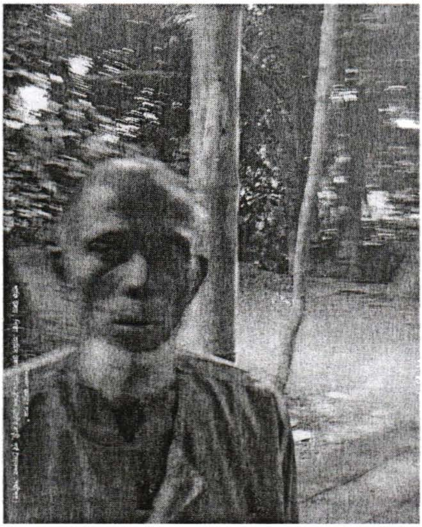

www.pathagar.com

(২) ক. কিশোর বয়সে, সমকালীন সংস্কৃতির প্রভাবে, আবেগের তাড়নায়, বিয়ের গজল গানের বিভিন্ন বাড়িতে আসরে শুরু করেন।

খ. প্রেরণা ওস্তাদ ও সহপাঠিদের ভাললাগার অনুভূতি থেকে সংগীত জগতে আগমন। ওস্তাদের সাথে ঘরে ঘরে জেলার বিভিন্ন জনপদের বাড়িতে আসরে গেয়ে বেড়িয়েছেন। স্মৃতি : অনেক মধুর স্মৃতি রয়েছে শিল্পীর জীবনে। তন্মধ্যে তিতার কান্দি পঁচার বাড়িতে, ভবানীগঞ্জ জেলে বাড়িতে, চৌপল্লী বিপক্ষ দলের সাথে ঝাড় পাছাড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুখস্মৃতি।

থ. আসরের গান

আরতি

বিন্দদের শুভ সংবাদ পাইয়াগো আরতি করে ব্রজ মাইয়া
ওগো ব্রজেন্দ্র নন্দন এল নাচিয়া নাচিয়া গো।
শ্যাম কষ্ট তরু মূলে রাধা কানু এক আসনে ও
চন্দন অষ্ট সখী ওর মুনজরী একত্র হইয়া গো।
ঐ নয়ন বারী বরিশনে তাকে চরণ ধোয়াই যে,
ওগো কেশে চরণ মুচাইব আনন্দিত হইয়াগো।
জাতি যুতি ফুল মালতি নানা ফুলের মালা গাথি।
ওগো যুগল গলে দাওগো মালা ঝুলাইয়েগো
ধুপদীপ জ্বালাইয়ে গরিব অঙ্গ গন্ধ দিয়ে ওগো
অর্থ সখী নিত্য করে যুগল রূপে হেরিয়াগো পাইয়াগো। ঐ[৩৫]

রাধিকা

www.pathagar.com

নিমন গান

ও মোর কালা, কালারে তোর বাঁশি কি জাদু জানেরে।
যাদুজানে, মন্ত্র জানে জানে আরো হিয়া
ওরে তোর বাঁশিতে জাদু করল গ্রামের বধূয়ারে
আয়ন ঘোষের স্ত্রী রাধিকা জানে সর্বলোকে
ওরে তোর বাঁশীতে কেমনে মোর জানে মোর নামটি বাঁধাবে।
অষ্ট আঙ্গল বাঁশের বাঁশিণব রঙ্গের ছেদ
ওতোর বাঁশিতে কেমন জানে কলঙ্কিনী রাধারে।
গিজাইয়া পাড়াইয়া বাঁশি তুইল্লা থুইলে ডালে।
নিলুয়ার বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলেরে।
পরা দুয়ার মিলন হল তোর।[৩৬]

দ. কীর্তন

শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণ সেবাশ্রম মন্দির
স্থান : বটতলী, বর্ধন বাড়ি, উপজেলা ও জেলা : লক্ষ্মীপুর।
২০ প্রহরব্যাপী মহানামযজ্ঞ ও মহোৎসব
তারিখ : ২১ কার্তিক ১৪১৮ বাংলা, ০৮ নভেম্বর, ২০১১ ইংরেজি।

অনুষ্ঠানমালা

(ক) ২১ কার্তিক মঙ্গলবার ৮ নভেম্বর বিকাল ৩ টায় বেদবানী পাঠ, সন্ধ্যায় গঙ্গা আবাহন, উৎসব অধিবাস, নামযজ্ঞ আরম্ভ, রাত্রে শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণ পূজা

(খ) ২২ কার্তিক অহোরাত্র নাম যজ্ঞ, রাত্রে শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণ পূজা

(গ) ২৩ কার্তিক অহোরাত্রে নামযজ্ঞ, মধ্যাহ্নে পূজা, মহাপ্রসাদ বিতরণ, রাত্রে পূজা।

(ঘ) ২৪ কার্তিক প্রাতে নামযজ্ঞ সমাপন, মন্দির পরিক্রমা ও নগর কীর্তন।

কীর্তনীদল

০১. শ্রী কৃষ্ণ ভক্ত সম্প্রদায়, খুলনা
০২. শ্রী অমৃত বাণী সম্প্রদায়, নেত্রকোনা
০৩. শ্রী গৌর নিতাই সম্প্রদায়, ভোলা
০৪. শ্রী গোবিন্দ্র মন্দির সম্প্রদায়, ফরিদপুর

www.pathagar.com

০৫. শ্রী রাম মোহন সম্প্রদায়, বাগেরহাট

০৬. শ্রী রাম সংঘ সম্প্রদায়, চাঁদপুর

মন্দির ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত। ৬ষ্ঠ মহোন্ত মহারাজ, অশোকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তারিখ : ১০-১১-০১১ ইংরেজি

সময় : রাত্র ০৭ টা

সত্য নারায়ণ পূজা

ছয় বছর যাবৎ বৃহদাকারে পূজা হয়। এর আগে সাদামাটা আকারে উদযাপিত হতো। নাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তিন বছর পূর্বে। বারোয়ারি বলা চলে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সহাযোগিতা করে।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : বীজন বর্ধন

পূর্ব ও বর্তমান পার্থক্য : অনেকটা আধুনিকায়ন হয়েছে।

আধুনিকায়নের স্বরূপ : অত্যাধুনিক নাট মন্দির, যাত্রী নিবাস, অঙ্গসজ্জা, আঙ্গিক, কীর্তনীয় দল, সাউন্ড বাক্স, বৈদ্যুতিক বাতি। আগে হ্যাজাক লাইটের আলো ছিল, মাইক ছিল সাধারণ।

তথ্যদাতা :

নাম : বাপ্পী দে

পিতা : সুনীল দে

মাতা : জ্যোতি রাণি দে

গ্রাম : বটতলী (বাজার)

শিক্ষা : এইচ এস সি

বয়স : ২৪ বছর

পেশা : ব্যবসায় (সিডি, কম্পিউটার দোকান, বটতলী বাজার)

ভক্ত; দর্শক, শ্রোতা

নাম : শ্রী তপন চন্দ্র দে

পিতা : প্রয়াত শ্রী মাখন চন্দ্র দে

গ্রাম : মীরের পাড়া, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

অনুরূপ তথ্য প্রদান করেন। তবে তিনি শিরনী/প্রসাদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ব্যাখ্যা দিলেন, শিরনি মুসলিম সংস্কৃতির শব্দ আর প্রসাদ হিন্দু সংস্কৃতির শব্দ। এ মন্দিরে শিরনি-প্রসাদ বিতরণ করা হয় যা মুসলিম ও হিন্দু উভয়ে ভক্ষণ করে থাকেন।

www.pathagar.com

পুরোহিত :

নাম : ভগবান চন্দ্র আচার্য

পিতা : বিজয় কৃষ্ণ আচার্য

মাতা : চারুবালা আচার্য

গ্রাম ও ডাক : বিজয় নগর, লক্ষ্মীপুর।

চার বছর যাবৎ পুরহিত্যের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এ মন্দির, পূজা-পার্বণ, কীর্তন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। না রাজনৈতিক না সামাজিক, সাম্প্রদায়িক। এখানে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ নেই। উভয় সম্প্রদায়ের লোক মন্দিরের যত্ন নেয় ও পূজা-পার্বণে সমান অংশগ্রহণ করে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি বিরাজমান। সার্বিক ব্যবস্থাপনা : সেবাশ্রম মন্দির কমিটি।

তথ্যনির্দেশ

১. কবিয়াল হারান শীল।

২. কবিয়াল হারান শীল ও তার দল। প্রতিপক্ষ : নেছার সরকার, মুনা সরকার, লাল্লা সরকার ও তাদের দল। দিঘলি বাজার, সদর,লক্ষ্মীপুর।

৩. জনৈক সরকার (চরচামিতা), বটতলী আসর।

৪. সংগ্রাহক : মহববত উল্যাহ্, প্রাপ্তি : দোহার-পয়ারীঃ মোহাম্মদ, পিতা : মুচামিয়া, বাড়ি : আমির উদ্দিন গাজী বাড়ি, গ্রাম : পূর্ব সৈয়দপুর, ডাকঘর : রচপাচরা, সদর লক্ষ্মীপুর।

৫. সংগ্রাহক : প্রয়াত করীম উল্য, পিতা : বাড়ি : বকসীবাড়ি, পূর্ব সৈয়দপুর, লক্ষ্মীপুর। পয়ারী : মোহাম্মদ, পিতা : মুছামিয়া, গ্রাম : পূর্ব সৈয়েদপুর, লক্ষ্মীপুর।

৬. সংগ্রহ : মহব্ব উল্যাহ।

৭. মুনা সরকার ও তার দল।

৮. মুনা সরকার, খাগুড়িয়া, লক্ষ্মীপুর।

৯. মুনা সরকার, খাগুড়িয়া, লক্ষ্মীপুর।

১০. লোক কবি সাখাওয়াত উল্লাহ, ছাকু সরকার।

১১. লোক কবি সাখওয়াত উল্লাহ, ছাকু সরকার।

১২. লোক কবি সাখাওয়াত উল্লাহ, ছাকু সরকার।

১৩. লোক কবি সাখাওয়াত উল্লাহ, ছাকু সরকার।

১৪. লোক কবি সাখাওয়াত উল্লাহ, ছাকু সরকার।

১৫. লোক কবি সাখাওয়াত উল্লাহ, ছাকু সরকার।

১৬. বাউল শিল্পী জমসের আহম্মদ, গ্রাম : চরপাগলা, ডাকঘর : তোরাবগঞ্জ।

১৭. বাউল শিল্পী জমসের আহম্মদ, গ্রাম : চরপাগলা, ডাকঘর : তোরাবগঞ্জ।

১৮. লোক কবি সাখাওয়াত উল্লাহ, ছাকু সরকার।

১৯. সংগ্রহ : সরকার আবদুল হাসেম, হাঁড়িয়া, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর।

www.pathagar.com

২০. সংগ্রহ : বাউল আবুল কালাম, পিতা : মতা সরকার, সং : রমাপুর, কুশাখালী-লক্ষ্মীপুর।

২১. সংগ্রহ : নাম : ইসমাইল (৫৬) পিতা : শরিয়ত উল্যা মিয়া, বক্স আলীর বাড়ি, পূর্ব সৈয়দপুর, লক্ষ্মীপুর।

২২. সংগ্রহ : নাম : ইসমাইল (৫৬) পিতা : শরিয়ত উল্যা মিয়া, বক্স আলীর বাড়ি, পূর্ব সৈয়দপুর, লক্ষ্মীপুর।

২৩. সংগ্রহ : বাউল আবুল কালাম, গ্রাম : রমাপুর, কুশাখালী, সদর লক্ষ্মীপুর।

২৪. গীতিকার : মতা সরকার, সংগ্রহ : বাউল কালাম, প্রয়াত পিতা। রমাপুর, কুশাখালী-লক্ষ্মীপুর।

২৫. সংগ্রহ : নিমাই সূত্রধর।

২৬. কবি সাখাওয়াত হোসেন, ছাকু সরকার। সংগ্রহঃ মহব্বত উল্যাহ্। বাড়ে-নিমাই থেকে সংগৃহীত।

২৭. নূর মোহাম্মদ, পিতা : মোহাম্মদ আবদুর রব, মাতা : আয়েশা বেগম। বি এস সির বাড়ি (দাশের-হাট বাজারের পাশে), ডাকঘর : রুপাচরা , গ্রাম : গোবিন্দ্রপুর, লক্ষ্মীপুর সদর। সংগ্রাহক : মহব্বত উল্যাহ। তারিখ-৩-৯-২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ।

২৮. মোহাম্মদ ও সাপু উল্যা, পূর্ব সৈয়দপুর, লক্ষ্মীপুর।

২৯. লোককবি : সাখাওয়াত উল্যা, ছাকু সরকার। সংগ্রাহক : মহব্বত উল্লাহ, ১৪-১১-২০১১ খ্রিস্টাব্দ।

৩০. সংগ্রহক : সাফিউল্লা, সৈয়দপুর, চরশাই। তথ্যদাতা : আমির উদ্দিন গাজী (সদর, লক্ষ্মীপুর), মোহাম্মদ (পিতা : আমিন উল্যা, বয়স : ৬৫ বছর, দোহার : নেছার সরকারের। বি. দ্র. এছাড়া সংগ্রহক এ সংগীত শুনেছেন ঐ গ্রামে, ঐ বাড়ির মোহাম্মদ, ছালাম, আবুল কাশেমের কাছে। মোহাম্মদ এর মতে ষোলো বছরের বর্ণনা, আবুল কাশেমের মতে বিশ বছরের বর্ণনা।

৩১. আলহাজ্ব মাস্টার মো. নুরুল আমিন চৌধুরী, চরপাগলা, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর।

৩২. আলহাজ্ব মাস্টার মো. নুরুল আমিন চৌধুরী, চরপাগলা, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর।

৩৩. কবিয়াল নাছির সরকার, সদর।

৩৪. তারিখ : ১৯-১০-২০১১ খ্রিস্টাব্দ, নাম : গাজী আবদুছ ছালাম, বয়স : ৭০ বছর, পিতা : গাজী মুজাফ্ফর মিয়া, মাতা : সফুরা খাতুন, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, সংস্কৃতির শাখা : বিয়ের গজলকার (পয়ারী-দোহার), দল : নেছার সরকারের দল, প্রধান গায়ক : নেছার সরকার, অন্যান্য সদস্য : গাইজ্জা (গাজী) শাহ আলম, আবদুছ ছালাম (বসুর হাট) মেস্তরী, আবুল কালাম মেস্তরী, আবদুল হাই আরে অনেকে সাইর। হাইঞা বাদাম।

৩৫. নাম : ফুকু রাণি দাস, মনরঞ্জন দাস, বাড়ি কুরিবাড়ি, গ্রাম : পশ্চিম শেকপুর, ডাকঘর : বাঞ্চানগর-কাউলী ভাঙা, রামগঞ্জ। তারিখ : ১৯-১০-২০১২ খ্রিস্টাব্দ ।

৩৬. শিল্পীর নাম : দিপালী বণিক, (৫৬) স্বামী : দুলাল বণিক, স্থান : শ্রীপুর, ডাকঘর : রামগঞ্জ, তারিখ : ১৪-১০-২০১২।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

সংগীত ভালোবাসে না এমন মানুষ বোধ করি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। সংগীতের মাধুর্য মানুষের মনকে আন্দোলিত করে তোলে। সংগীতের এই যে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা তার পেছনে রয়েছে বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ অবদান। কারণ, বাদ্যযন্ত্র-সহকারে গান গাওয়া না হলে গান এতো জনপ্রিয় হতো না। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সুরের মাধুর্যকে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। শুধু সংগীতেই নয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় নৃত্যের ক্ষেত্রেও। আবার পূজা-পার্বণ, উৎসব, শোভাযাত্রা, মিছিল, শবযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও বাদ্যযন্ত্র একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয়, জীবন-জীবিকা বা পেশার সাথেও বাদ্যযন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সাপ খেলা, বানর খেলা প্রভৃতিতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। আবার ফেরিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েই তাদের অস্তিত্বকে জানান দেয়। সুতরাং বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহার যে আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা অস্বীকার করবার কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশে যেসব বাদ্যযন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই লোকজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য থেকে আনা কিছু বাদ্যযন্ত্র একেবারে অপ্রতুল নয়। যে সব বাদ্যযন্ত্র বংশপরম্পরায় ব্যবহার হয়ে আসছে বা যেগুলোর গঠন প্রণালী এ দেশীয় বা সাধারণ মানুষ খুব সহজেই তৈরি এবং ব্যবহার করতে পারে সেগুলোকেই আমরা লোকবাদ্যযন্ত্র বলতে চাই। এগুলো তৈরির উপকরণও একেবারে লোকজ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা। লাউয়ের খোল, বাঁশ, কাঠ, নারকেলের মালা, গরু-ছাগলের চামড়া, মাটির হাঁড়ি প্রভৃতি দিয়েই এসব লোকবাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হয়।

লক্ষ্মীপুর জেলায় প্রাপ্ত লোকবাদ্যযন্ত্রের সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকবাদ্যযন্ত্রের তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এই জেলায় প্রাপ্ত লোকবাদ্যযন্ত্রগুলো হলো—

১. মৃদঙ্গ

মৃদঙ্গের শাস্ত্রীয় নাম শ্রীখোল। প্রচলিত নাম মৃদঙ্গ। লক্ষ্মীপুর জেলায় মৃদঙ্গ লোকবাদ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। কীর্তন, সনাতন হীরা, সনাতন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার ব্যাপক। দেখা যায় যে-কোন ধরনের লোক সংগীত আসরে মৃদঙ্গ একটি অন্যতম বাদ্যযন্ত্র। স্থানীয়ভাবে মাদল নামে প্রচলিত। যাত্রায় মাদল বাজানো হয়।

www.pathagar.com

২. ঢোল

ঢোল এমন একটি লোক বাদ্য লক্ষ্মীপুর জেলায় যার ব্যবহার ব্যাপক। পূজা অনুষ্ঠান, কীর্তন, মারফতি, কবিগান, জারি আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার হয়। বৈশাখের প্রথম দিন বিভিন্ন বাড়ি, দোকানে শুভ সূচনা করার উদ্দেশ্যে সনাতন ধর্মাবিলম্বীরা ঢোল বাজিয়ে থাকে। স্থানীয় ভাষায় যাদের মালি বলা হয়, এরা ঢোল বাজায়। বিনিময়ে মালিকরা সামর্থানুযায়ী কিছু টাকা পয়সা দেয়।

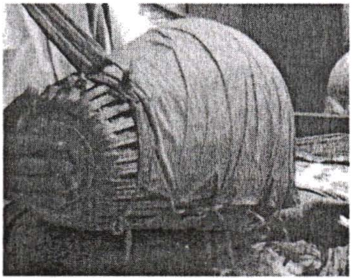

ঢোল

৩. ঢাক

ঢোলের পাশাপাশি ঢাক বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বাজানো হয়। কালি পূজা, দুর্গা পূজা, শিব পূজা, বিয়ের অনুষ্ঠান, লোক সংগীত অনুষ্ঠানে ঢাক বাজানো হয়ে থাকে। ঢাক অনেকটা ঢোলের মতো। তবে এক পাশে দু হাতের কাঠি দিয়ে বাজানো হয়।

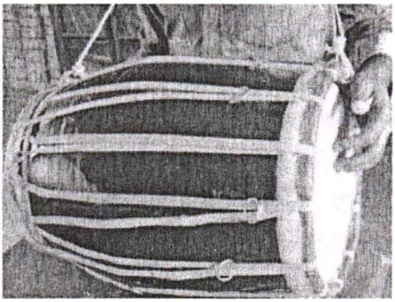

ঢাক

৪. দোতরা

লোকবাদ্য হিসেবে অধিক পরিচিত যন্ত্র। লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন কীর্তন, কবিগান, জারি, ভাটিয়ালি, পালা অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার হয়। এটি বহনে সহজ বলে এবং কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই একটি সুরের যাদু ছড়ায় বলে লোকশিল্পীরা এটি বেশি ব্যবহার করেন। এছাড়া গ্রামের হাট-বাজারের তাবিজ বিক্রেতা, সাপুড়িয়া, লোক জমানোর উদ্দেশ্যে দোতরা বাজিয়ে গান করে। ফলে প্রচুর লোক সমাগম হয়।

www.pathagar.com

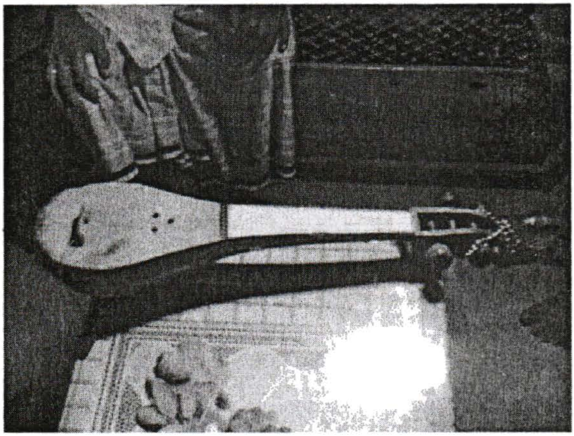

দোতারা

৫. জুড়ি

জুড়ি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনুসাঙ্গিক (করতাল) যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যাত্রাপালায়, কবিগান, কীর্তন, শ্মশানযাত্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানে জুড়ি, তবলা, ঢোলের পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়। জুড়ি সাধারণত দুই রকমের- কাসার জুড়ি, খঞ্জুরা (কাঠের জুড়ি)। কাঠের জুড়ি ভাণ্ডারি, মারফতি গানে বেশি ব্যবহৃত হয়।

৬. তবলা

তবলাকেও একমাত্র লোকবাদ্যযন্ত্র বলা যায় না। কিন্তু জেলার লোকসংগীত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তবলার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। যেমন : গজল, মারফতি, মুর্শিদি, আঞ্চলিক গান, জারি গান, পূজার অনুষ্ঠানে তবলার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

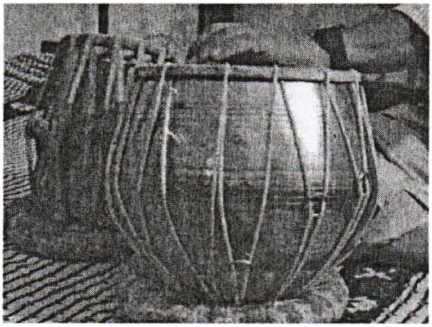

তবলা

www.pathagar.com

৭. বাঁশি

গ্রামের কোনো নির্জন কোণে এখনও রাতের আঁধারে মায়া ছড়ানো বাঁশির সুর শোনা যায়। এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে রসিক বাঁশি বাদক পাওয়া যায় না। কীর্তন, পালা, যাত্রা, মারফতি, আঞ্চলিক ও পল্লী গানের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ব্যবহার হয়।

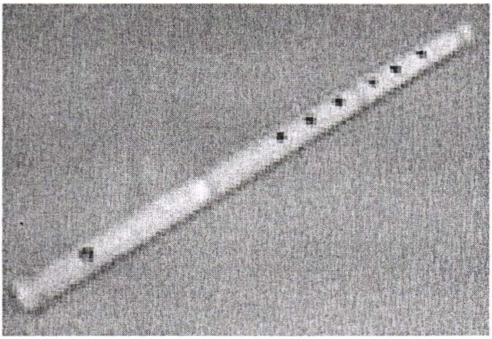

বাঁশি

৮. শিঙ্গা

স্থানীয় ভাষায় বেইজ্জা (বেদে) মহিলারা গ্রামীণ জনপদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাজিয়ে থাকে। এছাড়া লোকচিকিৎসার কাজে শিঙ্গা ব্যবহৃত হয়। মহিষের শিং দিয়ে শিঙ্গা তৈরি হয়। শিঙ্গা বাতের অসুখ, পেটের অসুখ, হাঁটুর অসুখ সারাতে ব্যবহৃত হয়।

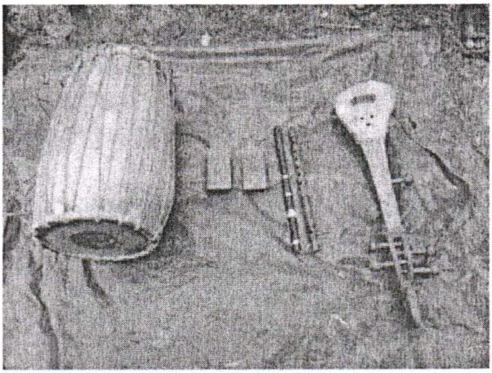

শিঙ্গা

৯. নাল

কবিগানের আসরে নাল বাজানো হয়। দেখতে ঢোলের মতো। তবে পেটটা ছোট, অপেক্ষাকৃত চিকন। ধাতব রড দিয়ে মোড়ানো। নাট-বল্টু দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী চাপ রাখা হয়।

www.pathagar.com

১০. পাতার বাঁশি

নারকেল পাতা দিয়ে প্যাঁচিয়ে লম্বা করে এক ধরনের বাঁশি বানানো হয়। এটি পাতার বাঁশি। এক মাথা চিকন থাকে। আরেক মাথা মোটা থাকে। চিকন মাথা বাজানো হয়। ভেঁপুর মতো বাজে। দুটি পাতা মুখে রেখে মাঝখানে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়। লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এর কদর দেখা যায়।

নাল

১১. শঙ্খ

প্রভাতের প্রার্থনা, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সঙ্খ বাজায়। প্রত্যেক হিন্দু পরিবার, মন্দিরে এর ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানে, বধূ বরণে উলুধ্বনির সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে বাজানো হয়।

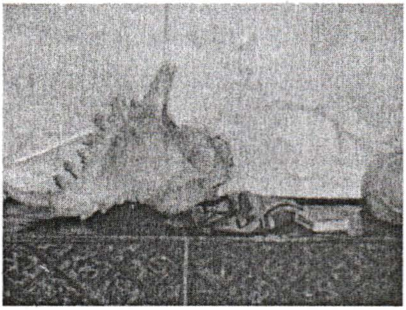

চিত্র ১ : শঙ্খ

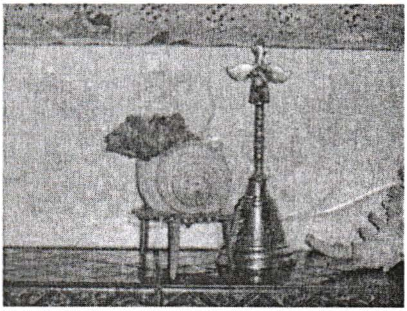

চিত্র ২ : শঙ্খ

১২. ঘণ্টা

প্রার্থনার সময় পুরোহিত ঘণ্টা বাজিয়ে পূজার মন্ত্র পাঠ করেন। এছাড়া গ্রামে গ্রামে শিশুদের খেলার সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিক্রিতে ফেরিওয়ালারা ঘণ্টা বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

www.pathagar.com

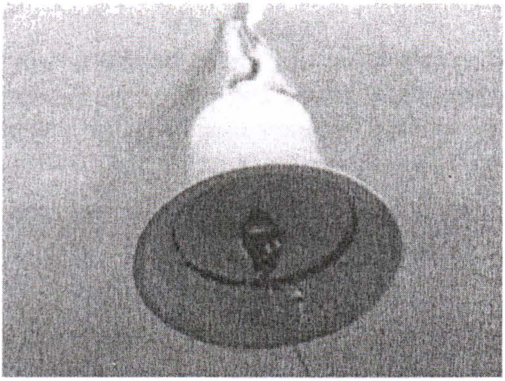

চিত্র : ঘন্টা

১৩. কাঁসা

পূজা ও কীর্তনে কাঁসার ব্যবহার উল্লেখ্যযোগ্য। কবি গানের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে কাঁসা বাজানো হয়।

১৪. ডুগডুগি

পানিতে পড়া স্বর্ণ উদ্ধারকারী দল, ফেরিওয়ালা, সাপের খেলা যারা দেখান তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৫. পাতিলের তলা কলসী

মারফতি গানের আসরে মাটির পাতিলের তলা বাজিয়ে সুর তোলায় সাহায্য করা হয়। কলসীর ঘড়া, পার্শ্বদিক, তলা কখনো হাতের আঙ্গুলে টোকা দিয়ে, কখনো হাতের তালু দিয়ে ঠুকে আড্ডায় রেওয়াজের সময় বাজানো হয়।

www.pathagar.com

লোকনাট্য

যাত্রা পালা : এ অঞ্চল বিশেষত লক্ষ্মীপুর জেলার পূর্ব ও দক্ষিণে চরাঞ্চলে এখনো প্রায় প্রতি বছর যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার রূপাচরা, পুকুরদিয়া, শান্তির হাট, ভবানীগঞ্জ, তেয়ারীগঞ্জ, তোরাবগঞ্জ (কমলনগর উপজেলা), রামগতির ব্যাপক চরাঞ্চলে শীতকালে যাত্রাপালা অভিনীত হয়। যদিও আঙ্গিকে ও উপস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। অতীতের অভিনীত যাত্রাপালার মধ্যে জনপ্রিয় ছিল : আপন দুলাল, অরুন বরুন, কিরন মালা, আলোমতি প্রেম কুমার, রূপবান, শ্যামারোখ বদিউজ্জামান, সাতভাই চম্পা ইত্যাদি। ইদানিংকার জনপ্রিয় : কমলার বনবাস, গুনাই বিবি, অরুন বরুন কিরণমালা, বেদের মেয়ে জোস্না, সাগর বাদশা।

এ যাত্রা পালা নিয়ে মৌলভীদের সাথে অসংখ্য সংঘর্ষ এ অঞ্চলে সংগঠিত হয়েছে। যার ইয়ত্তা নেই। সংঘর্ষের রক্তাক্ত অন্যতম হাতিয়ার উভয়পক্ষের দাও-ছেনী, কোচ, কিরিছ, বর্শা, মাদার কাঁটা, খেঁজুর কাঁটা, বেতের লিলা। নামকরা যাত্রাগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল সোনার বাংলা অপেরা, ননী গোপালের দল (রায়পুর)।

প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা অধ্যাপক সমীর মজুমদার (৫৯) ছাত্র জীবনে সাংস্কৃতিক অঙ্গলে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। যাত্রা সংগঠক হিসেবে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে চৌমুহনী কলেজে অধ্যয়নকালে লক্ষ্মীপুরের পূর্বাঞ্চলে প্রতি বছর কবিগান, যাত্রা পালা, পূজা-পার্বণ, কীর্তন, নাটক, মেলা প্রতিটি জনপদেই সাড়ম্বরে আয়োজিত হতো। তরুণ এ সংগঠক এতদবিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ অঞ্চলে প্রতিটি প্রাইমারি, হাইস্কুলে শীতের মৌসুমে নাটক, যাত্রাপালা প্রতি বছরই রেওয়াজ মাফিক অভিনিত হতো, তারই অনুসঙ্গে রুপাচর জুনিয়ার হাইস্কুল, দাশের হাট এতদ্‌বিষয়ে একধাপ এগিয়ে ছিল। গ্রাম্য খেলা হা-ডু-ডুর আসর ও বার্ষিক নাটক। যাত্রাপালার অন্যতম রূপকার ও সংগঠক ছিলেন এমন কয়েকজন, ছেরু মাঝি, আবদুর রহমান, লকিয়ত উল্যাহ মাস্টার, হাফেজ আহম্মদ মিয়া, নেছার মিয়া, অধ্যাপক সমীর মজুমদার প্রমুখ। এ সবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন শ্রী অটল সেন, বিনোদ বিহারী সেন, ছেরু মাঝি, আবদুর রহমান সওদাগর, গনি মাস্টার প্রমুখ। অধ্যাপক সমীর মজুমদার অভিনীত নাটক ও যাত্রাপালার মধ্যে অন্যতম হলো : আযাদ না কয়েদ, পল্লীশোষক, এক মুঠো ভাত দে। যাত্রাভিনেতা হিসেবে অধ্যাপক সমীর মজুমদার নায়ক চরিত্রে অভিনয় করে আজো সে সময়ের দর্শকদের মনে ঠাঁই নিয়ে আছেন। তার বিপরীত চরিত্রে রায়পুরের প্রখ্যাত অভিনেত্রী 'ভারতী'র কথা আজো মানুষের মুখে মুখে।

প্রশ্ন : আপনিতো দীর্ঘদিন যাবৎ অধ্যাপনা করছেন। এক সময়ে কৃতি সংস্কৃতিকর্মী ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকও ছিলেন, যাত্রা পালায় অভিনয় করে বেশ খ্যাতি অর্জন

www.pathagar.com

করেছিলেন বলে লোকমুখে শোনা যায়-তা আপনি একজন অধ্যাপক হিসেবে অতীত জীবনকে কিভাবে (Feel) অনুভব করেন?

উত্তর : দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, তুমিতো অধ্যাপক মানুষ, তুমি অতীতকে যেভাবে ফিল কর আমি বা প্রতিটি মানুষের কাছেই অতীত শুধুমাত্র নয়। অতীত জীবন মানেই রোমাঞ্চকর কাহিনী। নস্টালজিয়ায় ভোগা।

প্রশ্ন : তারপরওতো সংবেদনশীল মানুষের অতীত বর্তমানের সমান্তরাল। সে হিসেবে অতীতের আপনার স্মরণীয় কিছু কীর্তি, ঘটনা বললে কৃতার্থ থাকব।

উত্তর : আমার শখ ছিল অভিনয় করার। ছাত্র-যৌবন বয়সে অনেক নাটক, যাত্রাপালায় অভিনয় করেছি, কীর্তন, নাটক করার জন্য প্রতিভাবান ছেলেদের খুঁজে খুঁজে বের করে আমি ও লকিয়ত উল্লাহ মাস্টার তালিম দিতাম। গ্রামে চাল, সুপারি সংগ্রহ করে পূজা নাটকের আয়োজন করতাম। তখনকার দিনে অভিনয়ের জন্য মেয়ে পাওয়া যেত না। স্কুলের সুন্দর, সুন্দর ছাত্রদেরকে তালিম-রিহার্সেল করিয়ে শাড়ি পরিয়ে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করাতাম।

প্রশ্ন : আপনার অভিনীত কয়েকটি নাটক, যাত্রাপালার নাম বলুন।

উত্তর : 'আযাদ না কয়েদ', 'পল্লী শোষক', 'আলোমতি প্রেম কুমার,' একমুঠো ভাত দে' উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন : তখনকার পরিবেশ ও প্রতিবন্ধকতার কথা কিছু বলুন।

উত্তর : তখনকার সময়ে (৬০-৭০ দশক) যুবক ছেলেরা যাত্রাপালা, নাটক, কবিগানের নামে পাগল ছিল। হিন্দু পরিবারে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কারণে গার্ডিয়ান ছেলেদেরকে কিছুটা হলেও আস্কারা বা সাপোর্ট দিতেন। কিন্তু মুসলিম ছেলেরা ওরে বাবা এগুলো করবে, প্রশ্নই উঠে না। তবুও গার্ডিয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে তারা এগুলো করত। এসব কারণে অনেক মুসলিম প্রতিভাবান ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দেয়া হয়েছে। সমাজে যে ছেলে এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল মুসলিম সমাজ তাদের পরিবারকে সামাজিকভাবে হেনস্থা করা হতো এমনকি সমাজবদ্ধ করেও দিতে দেখা গেছে।

প্রশ্ন : যাত্রা-নাটকের জন্য তো স্টেজের দরকার পড়ত-সেখানে আপনারা কিভাবে প্রস্তুত করতেন?

উত্তর : আমরা স্টেজ করতাম কোনো সৌখিন ব্যক্তির কাছ থেকে একটা চৌকি যাত্রার দিনের জন্য ধার নিতাম। না পেলে বড় চৌকির মতো টং তৈরি করে স্টেজ সাজাতাম। স্টেজের সামনে পর্দা বাজার থেকে ভাড়া নিয়ে আসতাম। স্কুল ঘরের সামনে মাঠে অথবা স্কুল ঘরের মাঝের বেড়াগুলো খুলে দর্শকদের জন্য বসার জায়গা করে দেয়া হতো। কিছু রসিক মহিলা রাত গভীর হলে চুরি করে নাটক দেখার জন্য আসত ঘরে খিল এঁটে সন্তর্পনে যাতে পুরুষরা টের না পায়। তাদের জন্য বাঁশের খুঁটি দিয়ে বিশেষ ঘের তৈরি করা থাকত। দর্শকেরা বসত বিছানো খড়ের উপর, কয়েকটা বেঞ্চ থাকত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও শিক্ষকদের জন্য

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পাত্র-পাত্রীদের ড্রেস-আপ কিভাবে করতেন?

উত্তর : বাজার থেকে রঙ, স্নো, পাউডার, জরি ইত্যকার জিনিস কিনে আনা হতো। পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র অনুযায়ী সাজানোর জন্য এক্সপার্ট নিয়োগ করা হতো। অনেকে এ কাজে টাকাও নিতেন না। ও ভুলে গেছি, মেয়েদের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সপ্তাহখানেক আগেই শাড়ির যোগাড় করা চাই। সেজন্য যারা নাটকে বা যাত্রায় অভিনয়ের সাথে বা কার্যক্রমের সাথে জড়িত তাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ দায়িত্ব ছিল শাড়ি জোগাড় করার। এজন্য যে যখন সুযোগ পেতো আগে থেকেই মায়ের, বোনের, বৌদির শাড়ি-গহনা, ব্লাউজ গোপনে সরিয়ে এনে নিজের হেফাজতে রাখত। আর যাদের দিদি বা বোন, বৌদি যাত্রা পছন্দ করত তারা গোপনে পরিচ্ছেদ দিয়ে সহযোগিতা করত। তবে, বায়না ধরত তাদেরকে যাত্রা দেখাতে হবে। মেয়েরা যাত্রার দু'এক দিন আগে ছলনা করে আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যেত। যাত্রার দিন রাত্রে বাড়ি ফেরার কথা বলে পূর্বযোগাযোগ অনুযায়ী যাত্রাপলায় চলে আসত।

প্রশ্ন : এ যাত্রাপালা-নাটক করতে গিয়ে কখনো কি কঠিন কোনও সমস্যায় পড়েছেন বা কোন ধরনের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন কি?

উত্তর : এখনকার সমাজ, পরিবেশ, সভ্যতার চেয়ে তখনকার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেকবার নাটক করতে পারিনি স্থানীয় মুরুব্বিরা একত্র হয়ে ইডা মেরেছিল (ঢিল ছোঁড়া) চারদিক থেকে। দর্শকরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গিয়েছিল।

একবারতো দাশেরহাট বাজারে রুপাচরা সফিকউল্যা হাইস্কুলে নাটক করাকে কেন্দ্র করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেখানে একপক্ষ ছিল স্কুলের পক্ষে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, তুখোড় ছাত্রনেতা, নাটক সংগঠক সাবেক জাসদনেতা মাস্টার মহিউদ্দিন; অন্যপক্ষ ছিল মৌলবাদিদের মুখপাত্র মাওলানা আবদুল্লাহ দরবেশ। মাওলানা আবদুল্লাহর নেতৃত্বে সাবেক নোয়াখালী জেলার উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা শিক্ষক, দুই-থেকে আড়াই হাজার মাদ্রাসার ছাত্র কাফেলা নিয়ে নাটকের দিন সন্ধ্যায় তারা জিহাদ ঘোষণা করে দাশের হাটে উপস্থিত। মাওলানা তাঁবু গাড়লেন দাশের হাট মাদ্রাসা ময়দানে। সেখানে খবর পাঠিয়ে মহিউদ্দিন মাস্টারকে খবর দিয়ে নেয়া হলো তাঁকে প্রকাশ্য জনসভায় মাওলানা ঘোষণা করলেন মেয়ে নিয়ে নাটক করা যাবে না। প্রসঙ্গত, ঐ নাটকে অভিনয়ের জন্য রায়পুর হতে তিনজন অভিনেত্রীকে আনা হয়েছিল। মহিউদ্দিন মাস্টার বললেন, স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্ররা স্কুলের আয়ের জন্য এ নাটকের আয়োজন করেছেন। তাছাড়া মেয়ের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ছেলেদেরকে শাড়ি পরিয়ে মেয়ে সাজানো হয়েছে। তিনি নাটক করতে অনড় অবস্থান গ্রহণ করলেন। মাওলানা জিহাদের ঘোষণা দিলেন। উভয়পক্ষে সাজ সাজ রব। দৈবাৎ এ অঞ্চলে তখন প্রাতঃস্মরণীয় ভোজ্জা লাঠিয়ালের প্রচণ্ড দাফট ছিল। তার নেতৃত্বে স্কুল ছাত্ররাও স্থানীয় দুতিনশ যুবক শেল, কোঁচ, রাকসা, দাও- ছেনী নিয়ে স্কুল মাঠে মহড়া শুরু করে দিলো। ভোজ্জার ভয়াবহ মাইর ডাকে মনে হয়েছিল আকাশ ভেঙে পড়বে। তার মুহূর্তের মাইর ডাকে পুরো জনপদ সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। মাদ্রাসার হুজুররা ও

www.pathagar.com

ছাত্ররা এ পরিস্থিতির আশঙ্কা করে নাই। অবশেষে মাওলানা আবদুল্লাহ স্থানীয় জনগণের সাপোর্ট না পেয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। যথাসময় রাত ১০:৩০ টায় শুরু হলো নাটক। এখানে উল্লেখ করার মতো মজার ঘটনা হল। যারা ঐ মাওলানার কাফেলায় অংশগ্রহণ করেছিল তারা অনেকেই বিশেষত কিছু মাদ্রাসার হুজুরও ছাত্র বাজারে আত্মগোপন করেছিল নাটক ও মেয়েদের দেখার জন্য। তারা অনেকেই শুশ্রুমণ্ডিত ছিল। বাজার থেকে রুমাল, মাফলার, গামছা কিনে (স্কুলের পিছনে সন্তর্পনে বেড়া ভেঙে) দাঁড়ি মুখ ঢেকে নায়িকা দেখতে লাগল। টের পেয়ে কর্তৃপক্ষ ও ছাত্ররা তাদেরকে খেদিয়ে দিলে দাঁড়িমুখ বাঁধা অবস্থায় সারা রাত যাত্রা দেখেছিল।

প্রশ্ন : তো এখনকার এ জনপদের সংস্কৃতি চর্চার কথা বলুন।

উত্তর : এখন খুব একটা দেশে যাওয়া হয় না। তোমার বৌদি রেলওয়েতে চাকরি করে, আমি এ কলেজে অধ্যাপনা করি। ছেলেমেয়ে পড়ালেখা করে। এখানকার অবস্থা তোমরা যারা এলাকায় আছো তারাই ভালো বলতে পারবা।

যাত্রাপালা

স্থান : শান্তির হাট, কুশাখালী, সদর, লক্ষ্মীপুর।

যাত্রাপালার নাম : কাজল রেখা (ভিখারীর ছেলে) ২য় রজনী

তারিখ : ০৮-১১-১১ইংরেজি

০২ দিনব্যাপি যাত্রাপালা।

উদ্যোক্তা : স্থানীয় লোকজন এ যাত্রার আয়োজন করে।

অন্যতম মন্নান মাস্টার, নুরুল আমিন মেম্বার, রহমান মেম্বার, আমান উল্যা আমান ও অন্যান্য।

www.pathagar.com

নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন আমিন উল্যাহ
নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন, আবদুজ্জাহের
সময় : ৯.২৫ মি. রাত্র।
যন্ত্রীদল : খোকন ব্যান্ড, চট্টগ্রাম।

অনুষ্ঠানের বিবরণ : যাত্রা দেখার জন্য সদর লক্ষ্মীপুর, কমলনগর উপজেলা, রামগতি উপজেলা ও নোয়াখালী সদরের হাজার হাজার দর্শকের সমাগম ঘটে। পুরো বাজার এলাকা জনারণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বিভিন্ন বয়সের দর্শক যাত্রা দেখতে আসে। এদের মধ্যে ছাত্র, যুবক ও পৌঢ় ছিল সংখ্যাধিক্য ২-৩ হাজারের মতো দর্শকের সমাগম ঘটে। হাইস্কুলের পুরো মাঠ জুড়ে বিশাল প্যান্ডেল করা হয়। যাত্রা উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন উপজেলা ও অঞ্চলে মাইকিং করা হয়। টিকেটের ব্যবস্থা নেয়া হয় ৫০ ও ১০০ টাকা প্রতি টিকিট। রাত্র ১১টার দিকে যাত্রার মূলপর্ব শুরু হয়। প্রথমদিকে স্টেজ মাইকের ক্রটির কারণে মূলপর্ব অনুষ্ঠানের কিছুটা বিলম্ব হয়। স্টেজের এক পাশে মহিলা আসন সংরক্ষিত ছিল। যেখানে শ-পাঁচেক মহিলা দর্শক যাত্রা উপভোগ করে। রাত শেষের দিকে ছাত্র-যুবকরা বায়না ধরে ব্যান্ডগান শুনতে ও হিন্দি গানের আবদার জুড়ে দেয়। এতে যাত্রার কিছুটা সৌন্দর্য হানি ঘটে। শেষে আয়োজক কমিটি বাধ্য হয়ে ব্যান্ড সংগীতের পরিবেশনা করেন। এতে দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পরে কিছুটা গান, কিছুটা নাচ ও কিছুটা পালা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা সুচারুরূপে সমাপ্ত হয়।

দর্শক-শ্রোতা প্রতিক্রিয়া : জনৈক আবদুল মন্নান ভূঁইয়া, টুমচর, সদর, নোয়াখালী হতে আগত (দূরত্ব ১৭-১৮ কি. মি.)

মন্তব্য : নায়ক ঠিক আছে। নায়িকা আরও কম বয়স্ক ও একটু সুশ্রী হলে ভালো হতো। অপরাপর চরিত্র ভালোই অভিনয় করেছে। রামগতি হতে আগত (দুরত্ব ২০-২৫ কি. মি.) দুই যুবক একই মন্তব্য করলেন। তারা মাইকের ক্রটির কথা বলল। আনুষাঙ্গিক তথা অঙ্গ-সজ্জা বেশ-ভূষা আরো ভালো করার প্রয়োজন ছিল মন্তব্য করল। তবে উভয়েই আয়োজক কমিটিকে সাধুবাদ জানালো ক্রমবিলুপ্ত এ যাত্রার আয়োজন করার জন্য। চা স্টলে (স্টেজের ভিতর) যে পাঁচ-সাতজন পেলাম চা খেতে বসেছে কিছুটা উছশৃঙ্খল জনতার উদ্দেশ্যে বলল, এ যুগের ছেলেরা যাত্রা বুঝে না। এরা শুধু ব্যান্ড সংগীত, টক্কাটক্কি, নাচানাচি করতেই অভ্যস্থ।

প্রসঙ্গত : উক্ত লোক যাত্রায় নায়িকার ভূমিকায়/চরিত্রে ছেলেকে নায়িকা সাজিয়ে অভিনয় করা হয়েছে।

চর ডাক্তার, আলেকজাণ্ডার

রায়বাড়ি-১১-০১-২০১২

নাম : জয়াশ্রী রাণি দাস, বয়স : ৩৭

স্বামী : সন্তরন চন্দ্র দাস, পেশা কৃষি, ২ ছেলে ১ মেয়ে, পেশা : যাত্রা পালার অভিনয়, কীর্তন ও নাটকে অভিনয়।
গোষ্ঠীর নাম : গোলাপ তৃণমূল গোষ্ঠী।
শিক্ষা : এসএসসি পাশ।

www.pathagar.com

জয়শ্রী রাণি দাস

অভিনয় করেছেন : রামগতি লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, বরিশাল, সন্দ্বীপ, হাতিয়ার-বিভিন্ন যাত্রাপালা মঞ্চে।

যাত্রাপালার নাম : গুনাই বিবি, রহিম রূপবান, আপন দুলাল, কমলার বনবাস, নিমাই সন্ন্যাসি, আলোমতি প্রেমকুমার। সাগর ভাসা, অরুন শান্তি, ভিখারির ছেলে। এটি একটা পূর্ণাঙ্গ যাত্রাদল (যন্ত্রীসহ)

গোষ্ঠী প্রধান : মোস্তফা কমান্ডার।

আর্থিক সুবিধা : প্রতিটা পালায় ১,০০০ থেকে ১৫০০-টাকা। যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক খরচ ব্যতীত।

ভানু রাণি দাস

www.pathagar.com

শীতকাল : কীর্তনও করে দলের সাথে।
অনুপ্রেরণা : নিজেরা করি সংস্থা (NGO)
মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ।
ব্র্যাক কর্তৃক প্রশিক্ষণ।
দলের অপরাপর সদস্য : রবীন শাহা, শুফক, লতিকারাণি দাস, পূর্ণিমা ও অন্যান্য
সরকারের কাছে প্রত্যাশা : যাত্রা দেখতে এ দেশের মানুষ আগ্রহী এ ব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা। ব্যবস্থাপনা ও পৃষ্ঠ পোষকতা করা।

শিল্পীর একান্ত ইচ্ছা এ শিল্পের সাথে আজীবন জড়িত থাকা ও এ শিল্পের মাধ্যমে বেঁচে থাকা।

যাত্রাপালা : নাটক অভিনেত্রী
১২-০১-২০১২ ইং
স্থান : চর ডাক্তার
আলেকজান্ডার, রামগতি, লক্ষীপুর।
শিল্পীর নাম : ভানু রাণি দাস। বয়স ৪৫ বছর।
পেশা : গৃহিণী (যাত্রাভিনয়)
স্বামী : রাসীক হাওলাদার (কাঠ মিস্ত্রী)
নাট্যশিল্পী হিসেবে অভিনয় ১০ বছরে যাবৎ করে আসছেন।
শিল্পী 'সাগর ভাসা' যাত্রাপালায় মাধ্যমে এ জগতে বিচরণ।
দলের নাম : সবুজ শিল্পী গোষ্ঠী।
দলপতি : প্রাণ গোবিন্দ। অন্যান্য সদস্য : অঞ্জন, প্রাণ গোবিন্দ, হামিদ আক্তার, টুলু রাণি দাস।

অভিনয় যাত্রাপালা : সাগর ভাসা, নিমাই সন্ন্যাসী, কমলার বনবাস।
গুনাই বিবি, আলোমতি প্রেমকুমার, অরুন শান্তি, শোষক।
স্থান : লক্ষ্মীপুর, হাতিয়া ভোলা, বরিশাল, সন্ধীপের বিভিন্ন পালায়।
শিল্পী প্রধান : মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন।
ব্র্যাক কর্তৃক পরিবেশন ডকুমেন্টারী, নাটক, যক্ষার, উপর ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। 'হুশিয়ার' নাটকেও অভিনয় করেছেন।
অনুপ্রেরণা : স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি ও প্রাণ গোবিন্দ (দলপতি)।
অভিনয় করতে সাংসারিক পরিবারিক, সামাজিক কোনো অসুবিধা এযাবৎ হয়নি।
শিল্পীর একান্ত অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া :

এ অভিনয় আমার ভালো লাগে ও আনন্দ পাই। আমার একান্ত ইচ্ছা যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন আনন্দের সাথে যাত্রা-নাটকের সাথে থাকতে চাই। যাতে নিজেও আনন্দ পাওয়া যায়, শ্রোতাদেরকেও আনন্দ দেওয়া যায়। আমর পূর্ব পুরুষরাও এ সংগীত, যাত্রাপালা, নাটকের সাথে জড়িত ছিলেন। এ শিল্প আমার রক্তে প্রবাহিত। আমার বাবাও বিখ্যাত বাদ্যকার (ঢুলী) ছিল যাত্রায় অভিনয় করতেন। যন্ত্র বাজাতেন।

www.pathagar.com

স্মৃতিচারণ : আমার প্রয়াত স্বর্গীয় পিতা যাত্রাদল নিয়ে যাত্রা শেষে ভোলা হতে ফেরার সময় সলিল সমাধি ঘটে। তাঁর মৃতদেহ খুঁজেও পাওয়া যায়নি। (৩০-৩৫ বছর পূর্বে) এ ঘটনার পর এ অঞ্চলে যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। বি. দ্র. যাত্রার উন্নতি ও অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কর্মসূচির দরকার।

তথ্যনির্দেশ

১. ০৫-০৮-০১১ ইং লক্ষ্মীপুর সদর। সময় : বিকেল ০২ টা। নাম : অধ্যাপক সমীর মজুমদার (৫৯)। পিতা : মাখন লাল মজুমদার। গ্রাম : রামপুর, জেলা, উপজেলা : লক্ষ্মীপুর। পেশা : অধ্যাপনা।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. নবান্ন

নতুন ধান এলে প্রথমেই নবান্ন উৎসবে মেতে উঠত চড়ুই, বাবুই, কোয়েল। এখন কালে-ভদ্রে চক্ষু গোচর হয়। প্রতিটি পরিবারই নতুন ধান এলে উৎসবে মেতে উঠত নানা আঙ্গিকে। কৃষক যত্রতত্র গল্প-গুজব করে তাঁর ঐতিহ্যগত নতুন ধানের গর্বে নিজেকে ঐশ্বর্যবান প্রচার করতেন। শাওন-ভাদ্র মাসে সাধারণত খোন্দের প্রথমে আসা এ ধানকে 'আগাধান' বলা হয়। এ ধানের মধ্যে পড়ত ইরা বা হাডিয়া ধান। পাখি তাড়ানোর জন্য এই ধানক্ষেতের মধ্যে নানা প্রযুক্তি-পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। যেমন : টিনের ঘন্টা, ফাটা বাঁশের বিশেষ যন্ত্র, জামা-কাপড় টাঙ্গিয়ে বা মাটির পাতিলে চুন-কালি মেখে কাকতাড়ুয়া ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করতেন। কখনো-কখনো ঢিল মেরে, হাত-চাপড়িয়ে ভীত পাখিদের তাড়ানো হয়। কৃষকরা ধান কাটার দিন নতুন গামছা পরিধান করতেন, ছেলে মেয়েদের নতুন জামা কিনে দিতেন, ছেলেদের রঙিন টুপি মাথায় পরিয়ে দিতেন। ধান থেকে চাল করার পর নতুন ধানের ভাত-খাওয়া ও খাওয়ানোর জন্য প্রথমেই মৌলবি, পির মাসায়েক, তারপর নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দাওয়াত করতেন। এ নিয়ে কৃষক বাড়িতে ধুমধাম পড়ে যেত। অতিথিদের পানি-খড়ম দিয়ে হাত-পা ধোয়াতেন। ডাবের পানি দিয়ে প্রথমেই মেহমানদারি শুরু। নতুন চালের পোলাও, সাদা ভাত, রাতা মোরগের মাংস, কলাই, মুশুরি অথবা মুগডাল, রুই বা কাতল মাছ, ডিম-দুধ/দধি ইত্যাদি মুখরোচক খাবার পরিবেশন করা হতো। খাবার শেষে পানতো অপরিহার্য অঙ্গ অদ্যাবধি। মৌলবিকে সম্মানীও যথারীতি দেয়া হতো। এ নবান্ন উৎসব এ অঞ্চলে এখনো প্রচলিত আছে। খাওয়া-দাওয়ার পূর্বে বা শেষে মিলাদ শরিফ পড়ানোর রেওয়াজ প্রচলিত মুসলিম সমাজে। অধুনা ইরি ধানের ব্যাপকতায় ও ফসলাদির মৌসুমী বিবর্তনে এ উৎসব বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

২. নববর্ষ

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনকে এ জেলায় 'পরবের দিন' অভিহিত করা হয়ে থাকে। ঐ দিন নাকি আমের 'বিই' খায়। লোক-বিশ্বাস ঐ দিনের 'পরবের' আগের বা 'বিই' যাওয়ার আগে কচি আম খেলে নানা দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধি হয়। রক্ত আমাশয় বা এ জাতীয় রোগে ভোগে এ পর্বের আগে আম খেলে। এ দিন হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভাষায় 'লাবড়া' মুসলমানদের ভাষায় 'পাঁচন' তৈরি করা হয় নানা উপাচারের সমাহারে।

পহেলা বৈশাখে নানা জাতের কচু-ঘেচু, ফল-মূল, ডগা, লতা-পাতার শিকড় ইত্যাদি যেমনঃ নানা জাতের কচুর ডগা ও মূল, কুমড়ার ডগা, কুমড়া, কাঁচ কলা, ঢেঁকি শাক, পুইশাক, থানকুনি, শিয়াল মূত্রা, গঞ্জবাজালী পাতা, হলুদ, মরিচ, লবণ দিয়ে মহা

www.pathagar.com

ধুমধামে রান্না করা হয়। প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করে, ডেকে নিয়ে খাওয়ানো হয়। নারকেলের চিড়া, মুড়ি, কলা, সন্দেশ, ঘরে ঘরে খাওয়া হয়। অন্যতম প্রস্তুতিবার ও আকর্ষণীয় খাবার পান্তা ভাত মরিচ পোড়া, ইলিশ ভাজা, গুঁড়া মাছের পাতড়া, মুগডাল, টাকি বা কৈ মাছের কাঁচা মরিচের ভত্তা, নানা ধরনের পিঠা পুলি। এ জেলার বৈশাখি উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ নানা ধরনের গ্রীষ্মকালীন ফলের সমারোহ। জেলার সর্বত্র নববর্ষের 'বৈশাখি' গ্রাম্যমেলা, বিভিন্ন জনপদে হা-ডু-ডু খেলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নানামুখী আয়োজনে এই দিনে মুখরিত হয়ে থাকে এ জেলার গ্রাম্য জনপদ। কবিগান, জারি, সারির আয়োজন করা হয় কোথাও কোথাও।

৩. রথযাত্রা

আদিকাল থেকে লক্ষ্মীপুর শ্যামসুন্দুর জিউ আখড়া, দালাল বাজার মহাপ্রভুর মন্দির, রায়পুর মদন মোহন আখড়া ও জগন্নাথ দেবের মন্দির, রামগতির বুড়াকর্তার আশ্রম ও রামগঞ্জের সোনাপুর হরিসভা মন্দিরে জেলার প্রধান প্রধান রথযাত্রা অনুষ্ঠান ও মেলা উদ্‌যাপিত হয়। তখন মন্দির ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় এলাকায় এলাকায় রথ বানিয়ে রথ যাত্রা করা হতো। সাধারণত কিশোর যুবকরা বিপুল উদ্দীপনার সাথে এ কাজ করতেন। স্থানীয় হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতে তৈরি রথযাত্রা টেনে টেনে শিশু, কিশোর ও যুবকগণ আনন্দ করত।

লক্ষ্মীপুর জেলার রথযাত্রার দৃশ্য

রথ টেনে নিয়ে কোনো বাড়িতে গেলে বাড়ির নারী, পুরুষ, শিশুরাও এই আনন্দ উৎসবে যোগ দিতেন। উঠানে কাদা মাটিতে বাড়ির লোকজন কলা, নারকেলও ফল-ফলাদি ফেলতেন। সাথে সাথে হৈহুল্লোড় করে কাদার মধ্যে কার আগে কে নিবে তার জন্য

www.pathagar.com

কাড়াকাড়ি লেগে যেত। এতে খুব আনন্দ হয়। পরে সব বাড়ির কলা, নারকেল অন্যান্য ফল-ফলাদি একসাথ করে প্রসাদ বানাতো।

আমরা রথ তৈরির পর এতে জগন্নাথ, বলরাম ও সভদ্রার ছবি দিতাম। প্রসাদ খাওয়া ও বিতরণ রাতে হতো। মহিলারা প্রসাদ তৈরি করতেন। ভাদ্র মাসে হতো, স্কুল বন্ধ থাকত।

রথ চাকা-সাইকেলের বেয়ারিং বা মাটির চাকা (কুমাররা তৈরি করতেন, এগুলো জেলেদের জালে ব্যবহার করে), কাঠ, বাঁশ, কাপড় বা রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরি করা হতো। রথ দোতলা বানানো হতো। তেরিজ করে মাঠের মতো। কোনোটা ৩-৪ ফিট কোনোটা ৪-৫ ফিট উঁচু। দড়ি লাগিয়ে টানার সময় কাঁসা, শঙ্খ ধ্বনি বাজানো হতো। মুকুন্দ স্যারের বাসায় বেশি আনন্দ হতো।

লক্ষ্মীপুর শহরের কালী বাড়ি, সামসেরাবাদ, ঘোষ পাড়া, মাস্টার পাড়া, শাখারি পাড়া, বেশি রথ তৈরি হতো। এখন পাড়ায় পাড়ায় হয় না। তখন আখড়া থেকেও বড় রথটানা হতো । শতশত ভক্ত শহর প্রদক্ষিণ করে পুনরায় আখড়ায় ফিরে আসত। আবার ৭ দিন পর উল্টো রথটানা হতো।

লক্ষ্মীপুর জেলার উল্টো রথটানার দৃশ্যা

বর্তমানে আখড়া থেকে টেনে নিয়ে 'রাম ঠাকুরের আশ্রম' শাখারি পাড়ায় রাখা হয়। ৭-৯ দিন পর ফেরত রথটানা হয়। আখড়া ও রাম ঠাকুরের আশ্রমে এ দুদিন মেলা বসে।

রামগতির চর ডাক্তার গ্রামে বুড়াকর্তার আশ্রম। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা । আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা ছোটবেলায় দেখছি রথযাত্রা। খুব আনন্দ হয়। সেদিন এখানে অনেক মানুষ হয়। মেলা হয়। অনেক দোকান বসে। হরেক রকম দোকান। দূর থেকেও নারী, পুরুষ, শিশু আসে। আগে রথটানা হতো

www.pathagar.com

অনেক দূর পর্যন্ত। এখন আশ্রমের গেইট পর্যন্ত টানি। রাস্তা খারাপ, রথের উচ্চতায় গেইট নাই। গেইটে রথ এনে শ্রী জগন্নাথ দেবের প্রতিমা বের করে। কোনো বাড়িতে রেখে আসা হয়। যারা আগে থেকে তাদের বাড়িতে নেয়ার তাগিদ দেয়। তাদের থেকে একটি বাড়ি ঠিক করা হয়। সে বাড়িতে ঠাকুর যত্ন করে রাখা হয়। ৭ দিন পর উল্টো রথ হয়। সেদিন ঠাকুর ফেরত নেয়া হয়। এ দিন ঠাকুরকে ভোগ দেয়া হয়। ভোগ দেয়ার পর শত শত মানুষ প্রসাদ নেন। ভোগ বলতে নিরামিষ, সবাই পেট ভরে প্রসাদ হিসেবে খায়।

রামগতির চর ডাক্তারে আরেকটি আশ্রমে রথযাত্রা হয়। শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর আশ্রম। এ ছাড়া এ অঞ্চলের আলেকজান্ডার মহাপ্রভুর মন্দির, চর সেকান্তর ভবানী মহাজন বাড়ির দুর্গা মন্দির, করুণা নগরে অসিত মহাজন বাড়ির দুর্গা মন্দির ও মনহরি সরকার বাড়ির মন্দিরে রথযাত্রা ও মেলা হয়।

৪. ওরস

লক্ষ্মীপুর জেলায় বিভিন্ন সময় বহুপীর-মাশায়েখ এবং পুরোহিত-সন্ন্যাসী এসেছেন। এখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন এবং স্ব স্ব ধর্ম প্রচার করেছেন। পরবর্তীকালে তাদের সমাধিকে ঘিরে মাজার, আশ্রম গড়ে উঠেছে এবং বার্ষিক ওরস, তিরোধান উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, জাতীয় উৎসব এবং সামজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দেওয়ান শাহ্ মাজার

দেওয়ান শাহ মাজার

www.pathagar.com

হযরত দেওয়ান শাহ্ (র.) মাজার প্রায় পাঁচশ বৎসর পূর্বে এই স্থানে অবস্থিত ছিল। দেওয়ান শাহ্ (র.) চট্টগ্রাম বারো আউলিয়ার একজন। তিনি এই পথে যাতায়াত করতেন। এইখানে বিশ্রাম নিতেন। এই কথা জৈনপুর পির সাহেব কেবলা মোরাকাবায় জানাইয়াছেন যা এর পূর্বে কে যেন এই দেওয়ান শাহ্ মাজার বানাইয়াছে তা আমাদের এই জায়গার কেউ সঠিকভাবে বলতে পারবে না। এই মাজারের পাশে একটি বড় দিঘি আছে। একটি মসজিদ আছে, একটি মহিলা দাখিল মাদ্রাসা আছে। পূর্বের লোকজন থেকে শুনেছি এই দিঘিতে চিকল ছিল। আমার দাদা বলেছে আমার ছোট ভাইকে চিকলে নিয়ে গেছে। পরে আমার দাদা মাজার জেয়ারত করে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাইলে তাকে ঘাটে ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে। পূর্বের লোকজন বলেছে এই দিঘিতে পিতলের থালাবাসন ছিল তাহা মানুষে ব্যবহার করত। তা চুরি করার কারণে পরে আর উঠে নাই। এই দিঘিতে অনেক উদম ছিল। দরগার সময় তাহা ডুবে যেত। পরে পুনরায় আবার উঠত। দিঘির পূর্বপাড়ে একটি বড় কড়ই গাছ ছিল। তাহা বিক্রি করার পর ঐ ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি হয়েছে। সে ব্যবসায়ী ব্যক্তি এক সময় মাজারে এসে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করত। সে ব্যবসায়ী পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানেও যদি কেউ অন্যায় করে তাদের ক্ষতি হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। এই মাজার প্রাঙ্গণ বাংলা মাঘ মাসের প্রথম তারিখ থেকে তিন দিনব্যাপি মেলা মিলে। অনেক ব্যবসায়ী এইখানে ব্যবসা করার জন্য আসে।

লোকশ্রুতি এই দিঘির পানি প্রায় ৩০-৩৫ বৎসর পূর্বে উতরাই উত্তর পাড় দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়াছে আমাদের ফোরকানিয়ার কোনো ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষতি হয়নি। শুধু কেবল মসজিদের টিনের চাল, টিন, কোরআন শরিফ। ধাড়ি দেওপাড়া পাঁচপাড়া পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। পরে আমরা তা সংগ্রহ করে এনেছি।

কথিত আছে ৩৬০ আওলিয়ার মধ্যে একজন। ইয়েমেন থেকে পায়ে দলে ভারত হয়ে আসেন।

আবিষ্কার : হাজী আবদুল হালিম দৈবযোগে স্বপ্নে এ মাজার সংক্রান্ত তথ্য অবগত হন। এরও পূর্বে ঝাড়-জঙ্গলে পূর্বে এখানে একটা মাজার দূর অতীত থেকে অস্তিত্বমান। দূর অতীতে (লোকশ্রুতি) হিন্দুরা কবরের পির নিয়ত করে দুধ ঢেলে দিত। মানত করে গরু ছেড়ে দিত বলে জানা যায়। মোম, আগর দেয়-জ্বালায়-লোকশ্রুতিতে, জাইল্লারা দিঘিতে মাছ ধরতে এসে হুজুরের অনুমতি না নেয়াতে জালে মাছের পরিবর্তে সমস্ত কচ্ছপ ধরা পড়ে। পরে মাজারে এসে মাছ ছেড়ে কান্নাকাটি করে ও ক্ষমা চেয়ে নেয়। পরবর্তীকালে১' হুজুরের অনুমতি নিয়ে মাছ ধরে কয়েক মণ মাছ পাওয়া যায়। জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক মৃতকল্প গাভীর জন্য মাজারে নিয়ত করলে (ঈশ্বর আমার গাভীটা বাঁচলে বাছুর রেখে গাভীটা মাজারে দেব) তার গাভীও রক্ষা পায় বাছুর আসে। সে ঐ গাভীটা মাজারে সোপর্দ করে।

প্রবাদ-প্রচলন : দরগার বাইছালি (প্রতারণা করে অর্থ আয়) জনশ্রুতি আছে, একবার এক প্রতারক দল মেলার সময় 'ছ' হারিয়া বাউয়া ব্যাঙ আমদানি করে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তা প্রদর্শন করে। টিকেট চার আনা (৬০-এর দশক) করে প্রদর্শনের জন্য

www.pathagar.com

নেয়া হয়। প্রত্যেকে এসে দেখে হাসিতে ফেটে পড়ে। মূল রহস্য কাউকে বলে না। যেহেতু এটা দেখতে তার চারআনা খরচ হয়েছে। আসলে তারা এক বিদঘুটে বুড়োকে এনে (গায়ের রঙ সম্পূর্ণ কালো, কুৎসিত) তাকে উলঙ্গ করে উপর করে রাখা হয় পোদ উত্ত করে। দুই টিকা ও সারাগায়ে সাদা চুনের ফোট ও পাতিলের তলির কালি দিয়া ফোঁটা ফোঁটা দাগ দিয়ে ব্যাঙের আকৃতি দেয়া হয়েছে। সে থেকে এ প্রবাদের উৎপত্তি। এ অঞ্চল (৮-১০ কি. মি.-এর মধ্যে) এখনো এ প্রবাদ প্রতারণার অর্থে ব্যবহৃত হয় লোক-সমাজে।

কিঅ সুরমা দিবি, ভাতে-ভাতে চোক থাকবোনি।

কথিত আছে জনৈক কৃষক দরগার মেলায় রওয়ানা দিয়ে তার ছোট মেয়ে মেলা হতে তার জন্য সুরমা আনার বায়না দেয়। কৃষক নিতান্ত গরিব। ঐ সময়ে এক, দুআনা খরচ করার সামর্থ্য ছিল না বেচারার তাই খেদোক্তি করে ভাতে-ভাতে চোক থাকবোনি- সুরমা কিসে দেবে মেয়েটা। মানে ভাতের যোগাড় নাই, সুরমা চোখে দেয়া বাহুল্যমাত্র দরিদ্র পরিবারে। এ প্রবাদ এখনো লোক সমাজে ব্যাপক প্রচলিত রয়েছে।

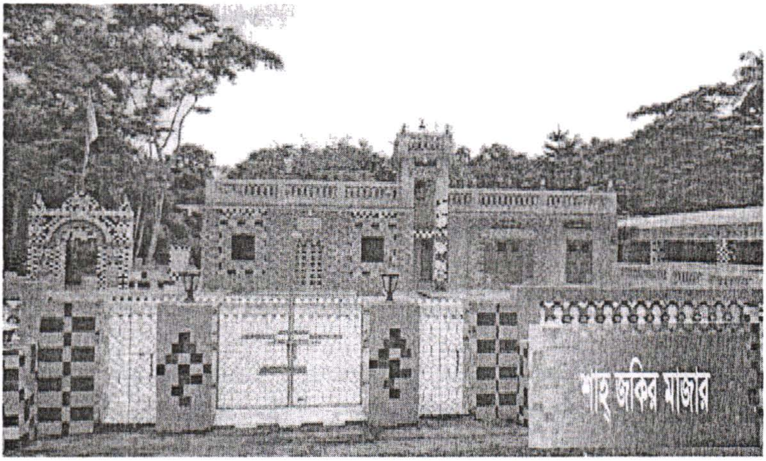

লালমিয়া দরবেশের মাজার

লক্ষ্মীপুর সদরের দিঘলির ছৈয়াল পাড়ায় অবস্থিত প্রখ্যাত কিংবদন্তিদরবেশ 'লাল মিয়া'র দরবেশের মাজার। যিনি জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি দরবেশ রূপে মানুষের মাঝে বিরাজ করতেন। তাঁর অসংখ্য অলৌকিক ক্ষমতা-মোজেযা এখনো এ অঞ্চলের মানুষের মুখেমুখে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এ তথ্য সংগ্রহের জন্য অকূস্থলে ২৫-৩০ জনকে মাজারের অনতিদূরে আড্ডায় পাওয়া গেল। যাদের মধ্যে ১০-১৫ জন জীবিত অবস্থায় দরবেশ সাহেবকে দেখেছেন ও তার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত আছেন।

www.pathagar.com

লোকশ্রুতি : লালমিয়া দরবেশ জীবিতকালে চলার পথে হঠাৎই 'উক' শব্দ ব্যবহার করতেন। এ এলাকার অনেকের মতে, গভীর রাতে মাজারের নিকটবর্তী হলে, বা পার্শ্ববর্তী বাড়ি বা ঘরের লোকেরা এখনো 'উক' শব্দ শুনতে পান। অকুস্থলে উপস্থিত জনৈক আলী আহমদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হলো।

দরবেশ সাহেবকে কবরে শোয়ানোর সময় হঠাৎ দুপাশ থেকে জোয়ারের আকারে পানি আসে এবং ঐ পানির জোয়ার নাকি দরবেশ সাহেবকে তুলে নিয়ে যায় তাঁর লাশ মাটিতে রাখতে দেয়নি। বিনা লাশে দরবেশ সাহেবের কবর দেয়া হয়। মৃত্যুর কয়েক বছর পর উনি স্বপ্নে লোকজনকে দেখা দিয়ে বলেন, 'তোরা আমার যত্ন-আতি নেস না কা মাজারের খেদমত করচ না কা' এ খবর জানার পর উনার ওয়ারিশগণরা মৌলভি মাহমুদুল্লাহ সাহেবকে দাওয়াত করে এনে ঘটনার বিবরণ দেন। মৌলভি সাহেব মিলাদ পড়িয়ে, দোয়া-দুরূদ পড়ে জনতাকে আদেশ দেন, এখানে আল্লাহর ওলি আছেন। এখানে একটা পাঞ্জেগানা নামাজ ঘরের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে উনার সৌজন্যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়, মাজার সংলগ্ন জায়গায়।

একবার নাকি 'ভুলুয়ার নদী' নায়ে করে পার করে দিতে জেলে-মাঝিকে অনুরোধ করলে তাঁরা হুজুরকে নায়ে তুলে নেয়নি। কিন্তু বরিশাল বা ভোলা থেকে নৌকা নিয়ে এসে নদীরপাড়ে বা ঘাটে নাও ভেড়ানোর আগেই দেখেন, লাল মিয়া দরবেশ নদীর এপাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন অবলীলায়।

তাঁর মা মারা গেলে, তাঁর কথা (নিরুদ্দেশ) সবাই বলাবলি করতে থাকে। জনশ্রুতিতে আছে ঐ দিন তিনি যশোরে ছিলেন। কিন্তু মায়ের জানাজার কয়েক মুহূর্তে আগে হঠাৎ সবার কানে অকুস্থলের নিকটবর্তী স্থানে 'উক' শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হুজুর যথাসময়ে মায়ের জানাজায় উপস্থিত হয় জানাজায় শরিক হন। ইত্যকার বহু লোকশ্রুতি এখনো লোকমুখে প্রচলিত যা সংগ্রহের দাবি রাখে।

এমদাদ হুজুরের মাজার

চর পাগলা এমদাদিয়া দায়রা শরীফের অবস্থান কমলনগর, লক্ষ্মীপুর

এ মহান সাধক পুরুষের নানা কীর্তি গাঁথা এখনো এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যায়। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এ সাধক বন্ধুর পরিবেশে নানা অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন যা বিস্তৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। সে সময়কার মানুষ এখন আর নাই বললেই চলে। তবুও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এখনো কিছু তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায় তেমনি দুএক জনকে খুঁজে বের করে তথ্য নেয়ার প্রয়াস নিয়েছি। নদী ভাঙার পর চলে যান শহর কসবায়। এখানে মায়ের মৃত্যুর পর চলে যান চট্টগ্রাম ষোলশহর। ওখানে বদ্দার বাড়ির সাব রেজিস্টার সাহেবের কাছে ছয় বছর অতিবাহিত করেন। সেখান থেকে সাব-রেজিস্টার সাহেব উনাকে ফটিকছড়ির মাইজ ভাণ্ডারিতে গোলাম রহমানের হাতে তুলে দেন। সেখানে ছয় বছর পির কেবলার খেদমতে অতিবাহিত

www.pathagar.com

করেন। তাঁর পিতা নানা দিকে খোঁজ খবর নিয়ে ভাণ্ডার শরীফ হতে তাঁকে নিয়ে আসেন ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি দুই মেয়ে এক ছেলে সন্তানের জন্ম দেন। মেয়ে ফাতেমা, ছালেমা, ছেলে জামশের আহামেদ। শহর কসবা ভূলুয়া নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেলে চর পাগলার ফাজিল বেপারি এলাকায় কলেরা, হানাইয়ার, বিচক ইত্যকার মহামারীর প্রকোপ থেকে মানুষকে বাঁচানো জন্য এমদাদ হুজুর (র.) নৌকাযোগে এখানে নিয়ে আসেন ও আধাকানি সম্পত্তি দান করেন। দরবেশ সাহেবকে বাড়ি ও আস্তানা করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ফাজিল বেপারি উক্ত জমিন দান করেন। এখানেই তার দরগাহ ও দায়রা। এখানে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় ওরস।

৫. পৌষ-পার্বণ

মূলত পৌষ-মাঘ এ দুমাস গ্রামবাংলার সর্বত্রই পিঠা-পুলির অন্যতম মৌসুম। ঘরে-ঘরে রাত-দিন পিঠা তৈরি ও খাওয়ার ধুমধাম থাকে। পৌষ মাস গ্রাম-বাংলার ফসলি মাস। এ মাসকে লক্ষ্মীপুরের বছরের প্রথম মাস বা প্রারম্ভ মাস ধরে ফসল বোনা বা চাষাবাদের শুরু হয়। তাই পৌষ মাসকে নববর্ষের যাত্রা শুবু ধরে নিয়ে পৌষ-পার্বণ উদ্‌যাপনের রীতি প্রচলিত আছে। পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে গৃহস্থ বাড়িতে পিঠা-পায়েস, শিরনি, পোলাও-কোর্মার আয়োজন করা হয়। কিষাণ বধূকে নতুন শাড়ি কিনে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এ দিন তার অন্যরকম কদর থাকে। চাষের ক্ষেতে যাওয়ার সময় বা নতুন ফসল বোনার সময় কিছু কিছু উপাচার পালনে তাকে সর্বদা তৎপর থাকতে হয়। সকালে চিতল পিঠা তৈরি কিষাণীর প্রথম কাজ। এ পিঠা তৈরির পর রান্না করেও খাওয়া হয়। তারপর শিরনি ও নানা জাতীয় পিঠা, সোনা-রুপার ধোয়া পানি ঘরের ভিটাতে ও জমিনে ছিটানোর রেওয়াজ প্রচলিত যাতে ঘরে লক্ষ্মী আসে ও চাষাবাদে উন্নতি হয়। ছেলেমেয়েদের আটকড়ি খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে। সম্পন্ন পরিবারে সবার জন্য নতুন জামা-কাপড় বা সৌখিন জিনিসপত্র কেনার প্রচলনও লক্ষণীয়। হিন্দু পরিবারে মিঠা-মণ্ড, সন্দেশ, কলা-মুড়ি, চিড়ার প্রচলন অত্যধিক। এ পার্বণ নিয়ে নানা প্রবাদ, প্রবচন, লোক কথা, উপকথা, কিংবদন্তিঃ প্রচলিত আছে যা উদ্ধার করা খুবই দুরূহ ও ব্যাপক গবেষণা সাপেক্ষ। তবে সময়, যুগ, উৎপাদন ব্যবস্থা, জলবায়ুর পরিবর্তন, জীবন-জীবিকার ক্রমবিবর্তনে এ পার্বণের ও এ মাসের জৌলুস স্তিমিত হয়ে আসছে। চাষাবাদ ও খাদ্যশস্য, রবি শস্য বছরের সর্বাধিক ফসল এ মাসেই চাষাবাদ করা হয়। এ পার্বণ নিয়ে কবি সুফিয়া কামালের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি প্রাতঃস্মরণীয়। 'পৌষ পার্বণের পিঠা খেতে বসে খুশিতে ভীষণ খেয়ে আরো লাভিয়াছি অমৃতের স্বাদ মায়ের বকুনী পেয়ে।" হিন্দু সম্প্রদায়ের রীতিতে এই পার্বণে লক্ষ্মীকে আবাহন করে পূজা ও নানা উপাচার করা হয়ে থাকে। এক সময় ভৈরবী সুরে 'আগমনী' সংগীত ও সুরের মূর্চনা ফুটে উঠত লক্ষ্মীপুরের হিন্দু বাড়ি ও পরিবারে। আজ তা অতীতের আর্তি হয়ে বিদগ্ধ হৃদয়ে বেদনার ঝড় তোলে। প্রত্যুষে লুলু বা উলুধ্বনি শোনা যায় না আর।

www.pathagar.com

পার্বণিক রাতে তারাবাজি ঝলকে দিগন্ত হয় না পুলকিত। বাজির মধ্যে বড়দের বিকট আওয়াজের কূঁদা আর শোনা যাবে না কখনো। মাটি প্রকম্পিত নানা বাজি আজ আর ফুটে না। হাটে-বাজারে ও বাড়িতে অল্পবয়সী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ছেলেরা এ রাতে এক অপার আনন্দে পথে ঘাটে মাঠে, বাড়ির দরজায়, উঠানে, পরের ঘরের পিঁড়ায়, বাজারের অলিতে-গলিতে, শখ করে বন্ধুর গায়ে-পিঠে, পথচারের পায়ে আঘাত করে আর বাজি (শলাকা যুক্ত বাজি) ফুটাবে না বুঝি কোনো দিন।

তথ্যনির্দেশ

১. মানিক সরকার, পিতা : আবদুল হাকিম, বয়স : ৬১, পেশা : কুটির শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্থান : ছৈয়াল পাড়া, দিঘলি, সদর লক্ষ্মীপুর ; তারিখ : ২৪-৯-১১, সময় : ২.৫০ মি.।
২. শৈবাল সাহা, এডভোকেট, সভাপতি : পূজা উদ্‌যাপন কমিটি, বয়স : ৫৮ বছর।
৩. শংকর মজুমদার, সম্পাদক : পূজা উদ্‌যাপন কমিটি, বয়স : ৫৬ বছর।
৪. স্বপন দেব নাথ, বয়স : ৫৬ বছর।
৫. স্বপন চন্দ্র নাথ, লক্ষ্মীপুর শ্যামসুন্দর জিউ আখড়া, বয়স : ৪২ বছর, তারিখ : ১০.৭. ২০১২
৬. অঞ্জন, সংগীত শিল্পী, তবলা বাদক, চর ডাক্তার, রামগতি, বয়স : ৩৫ বছর।
৭. শামসল হক, পিতা : মোস্তফা মিয়া, গ্রাম : রামচন্দ্রপুর (মাজার নিকটবর্তী), বয়স : ৫০, পেশা : ব্যবসা (দোকানদার), শিক্ষা : স্বল্পশিক্ষিত, রামচন্দ্রপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর।
৮. শাহাদাৎ হোসেন মিলন, খাদেম (মাজার), পিতা : আবদুল পলান মৃত, গ্রাম : বসুদুহিতা, ডাক : করইতলা (ভায়া কেরামতগঞ্জ), সদর, লক্ষ্মীপুর, বয়স : ৪৮ বছর, পেশা : চাকরি (মাদ্রাসা শিক্ষক), মাজারকেন্দ্রীক মাদ্রাসা, মাজারের খেদমত : পুরুষানুক্রমে।
৯. মানিক সরকার, পিতা : মৃত আবদুল হাকিম, বয়স : ৬১ বছর।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. লক্ষ্মীপূজা

বহু প্রাচীন সৈয়দপুর চংদার দিঘির পাড় শ্মশানে অসংখ্য মোমবাতি প্রজ্বলিত করে লক্ষীপূজা উদ্‌যাপন করা হয়। খোকনশীল তাঁর স্বর্গীয় পিতা প্রকাশচন্দ্র শীলের পবিত্র আত্মার প্রতি পূজা দিতে এলে তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, প্রতি বছর লক্ষ্মীপূজার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রয়াত স্বজনদের (যাদেরকে এখানে শেষকৃত্য করা হয়) বিদেহ আত্মার উদ্দেশে এখানে এসে পূজা দিয়ে থাকে। প্রতি বছর একবারই লক্ষ্মীপূজা হয়। শ্মশানে মোমবাতি দিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়।

লক্ষ্মীপূজা

সৈয়দপুরও রামপুর সংলগ্ন ৪টি হিন্দু বাড়িতে ঘুরে দেখা গেল, প্রতিটি বাড়িতে ঘরে ঘরে সাড়ম্বরে লক্ষ্মীদেবীর ঘট স্থাপন করে লক্ষ্মীপূজার এক মহোৎসব চলছে। সব বাড়িতে অসংখ্য মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরে উঠোনে দাওয়ায় বাগানে, দরজায় আলোকসজ্জিত করা হয়েছে–এক আলোয় দিপালি উৎসব। পুরো বাড়ি মোমবাতির আলোতে উদ্ভাসিত। বাড়ির দরজায় দাওয়ায়, উঠানে, ঘরে ঘরে সর্বত্রই মোম জ্বালানো হয়েছে। একঘরে পূজারত ঠাকুর। লক্ষ্মীদেবীর আসন সাজিয়ে পূজারি পূজো দিচ্ছেও মন্ত্রজপ করে চলেছে। আসনে সুসজ্জিত দেবীর পট সম্মুখে রক্ষিত দেবীর ঘট যাতে পুষ্প সজ্জিত। পুরো ফ্লোরে থরে থরে রক্ষিত ফলার অন্তত ২০-২৫ প্রকারের। পার্শ্বের

www.pathagar.com

ঘরে সুশীলের স্ত্রী লক্ষ্মীর সম্মুখে পাঁচালি পাঠ করছে। পাশের বাড়িতে শুক্লা লক্ষ্মীর পট ও ঘটের সামনে বসে পূজো দিচ্ছেও লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করছেন। এ বাড়িটিও মোমবাতির দিপালি উৎসবে মেতেছে যেন। পাশের রুহুনী কবিরাজের বাড়িতেও ঘরে ঘরে একই চিত্র পাওযা গেল। এ বাড়িতে একটি মন্দির রয়েছে সেখানে রাত্রে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে কীর্তনের আসর বসবে। প্রতিটি বাড়িতে আতশবাজির দৃশ্য ও শব্দ লোকজীবনে লক্ষ্মীপূজার মাত্রাকে করছে অতিশায়িত। পার্শ্বের গ্রাম কল্যাণপুর থেকেও বাতাসে ভেসে আসছে লক্ষ্মীপূজার উলুধ্বনি ও আতশবাজির বিকট শব্দ ও রাতকে করে তুলেছে সুষমায়িত।

লগ্ন, উপকরণ : চিত্রপট (লক্ষীদেবীর, ঘট হরতকি। উপদান : ঘটের পির স্থাপিত পুষ্প, শাপলা, বেলপাতা মন্ত্র-শ্রোত (নমস্থে সর্বদেব বাইনিং, দারশি, হরিপ্রিয় যাহা গাড়ি।

লক্ষ্মীপূজা (লক্ষব্রত)

তথ্যদাতা : শিখা, পিতা : সুবাস, মাতা : বাসনা, বাড়ি : লাবণী ডাক্তারের বাড়ি, ডাকঘর : রূপাচরা, সদর, লক্ষ্মীপুর। গ্রাম : খাজুরতলী, লেমুয়া।

২. ব্রত পার্বণ (ব্রতের ভাত)

স্থান : কল্যাণপুর (কুশাখালী, দাসের হাট)
তারিখ : ১৭-১০-২০১১ ইং
সময় : বিকেল ০৫
যোগিন্দ্র পালের বাড়ি
তথ্যদাতা
নাম : পূরবী পাল
পিতা : যোগিন্দ্রপাল
শিক্ষা : এসএসসি
বয়স : ৩৮ বছর
ঠিকানা : গ্রাম : কল্যাণপুর, ডাক : রূপচরা, সদর, লক্ষ্মীপুর।
পেশা : চাকরি

কথিত আছে, 'হিন্দুরা আশ্বিনে রাঁধে, কার্তিকে খায়।' মূলত এ পার্বণ হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার ও সংস্কৃতির একটা অনুষঙ্গ। সুপ্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধি অন্যান্য পার্বণের ন্যায় এ পার্বণও যথাযোগ্য মর্যাদার ও গুরুত্বের সাথে প্রচলিত হয়ে আসছে। এ পার্বণ নিয়ে এদেশে মুসলিম সমাজে অনেক গান-গল্প লোক সমাজে বহমান। হিন্দু সমাজের মধ্যেও এ নিয়ে অনেক প্রবাদ, প্রচলন, পৌরাণিক ও লোককাহিনী বিরাজমান।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, হিন্দু ধর্মাবলম্বিরা আশ্বিন মাসের (পুঞ্জি, তিথি, নক্ষত্র, দিবস) শেষ দিবসে এ উপলক্ষে 'উপবাস-ব্রত' পালন করে এবং উক্ত দিবসের যে কোনো লগ্নে বা সন্ধ্যার পর ব্রতের ভাত রান্না করে। কার্তিক মাসের ১ম দিবসে পূজা-

www.pathagar.com

অর্চনা দিয়ে ঐ ভাত খাওয়া হয় এবং পুরো কার্তিক মাস সাঁঝ-সকালে ঘরে ঘরে জোয়ার-বাদ্য (উলুধ্বনি) করা হয়। এটা শাস্ত্রের বিধান।

বর্ণনা : আশ্বিন মাসের শেষ দিবসে উপবাস-ব্রত পালন করা হয় ও ঐ দিন ব্রতের-ভাত রান্না করা হয়। রান্না হলে পরে জোয়ার-বাদ্য দিয়ে পূজা দিতে হয়। পূজার সময় পাঁচালি পড়ে পড়ে পূজা দিতে হয়। তৎপর বিশেষ পদ্ধতিতে আচমন করে ভাতের পাতিলের উপর কলাপাতার ঢাকনা দিয়ে (প্রয়োজনীয় উপাদান সংযোগে) উপকরণাদি যথাস্থানে রেখে কলার পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পরদিন অর্থাৎ কার্তিক মাসের প্রথম দিবসে ঐ ব্রতের ভাত খাওয়া হয়।

উপকরণ : নতুন পাতিল, চাল, জল, জল ভর্তি গ্লাস, হরমূল (পাট খড়ি), পাট, কলাপাত, ধনে-দূর্বা, তুলসীপাতা, ফুল, চাউলের গুঁড়ি, আমসরৎ (আমপাতা-থোকনাসহ ৫-৭টি চিনি-গুড়, ফল-ফলাদি (কলা, পেঁপে, নারকেল, ডাব, তালের ঠুঁসা, গাভীর দুধ, ইত্যাদি। (চাউল-আতপ চাউল)।

পদ্ধতি : প্রথমে নতুন পাতিলে জল ও চাল দিয়ে রান্না চড়াতে হয়। ভাত রান্নার পর পূজা দিতে হয়। তারপর রান্না করা ভাতের উপর উপকরণগুলো ছিটিয়ে দেয়া হয়। পূজা দেয়ার পর কলাপাতার ঢাকনা দিয়ে রাখতে হয়। পরদিন সকাল বেলা উলুধ্বনি দিয়ে পাতিলের মুখ খুলে পরিবেশন করা ও খাওয়া হয়। একই বলে, 'আশ্বিনে রাঁধে, কার্তিকে খায়। (ব্রতের ভাত)

প্রবাদ, প্রচলন : আশ্বিনে রাঁধে ভাত কার্তিকে খায়
যেই বর চায়, হেই বর হায়।

তথ্যদাতা : পূরবী পাল, পিতা : যোগীন্দ্রপাল, এসএসসি, বয়স : ৩৮ বছর, কল্যাণপুর, ডাক : রূপচরা, সদর, লক্ষ্মীপুর, পেশা : চাকরি, তারিখ : ১৭.১০.২০১১, সময় : বিকেল ৫টা।

৩. লোকশ্রুতি

একবার নাকি বাড়িতে মেহমান এসেছে। হুজুরের স্ত্রী উনাকে বাজার থেকে মাছ কিনে আনার জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন। উনার কাছে মাছ কেনার টাকা ছিল না। উনি একজন ভক্তকে বললেন পুকুরে জাল বাওয়ার জন্য। কিন্তু পুকুরে তেমন মাছ ছিল না। মেহমানের মেহমানদারীর অনুপযোগী। তবুও হুজুর বলেছেন আদেশ পালন করতে হয়। যেইমাত্র ভক্ত পুকুরে জাল খেয়া দিয়েছেন প্রথম খেয়াতেই এক মস্তবড় কাতল মাছ উঠে এসেছে। সকলেই যেমনি খুশি তেমনি তাজব বনে গেলেন। ঐ পুকুরে কাতল মাছ পাওয়ার কোনো সূত্রই ছিল না।

দায়রার সামনের বাড়িতে একবার কলেরা লেগেছিল। কয়েকজন মারাও গেছে। খবর পেয়ে হুজুর ঐ বাড়িতে গেলেন ও একটা কালো ছাগল মানত দিতে বললেন। ঐ ছাগলটা পাঁতরে বিলে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসতে বললেন এবং নিজে দোয়া দুরূদ পড়ে জিকির করতে লাগলেন। পাঁতর থেকে ছাগলটা সোজা পশ্চিমমুখী হয়ে হুজুরের

www.pathagar.com

আস্তানার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। হুজুর জিকির শেষে বাড়িতে এসে ঐ ছাগলটা জবাই করে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। পরদিন থেকে ঐ বাড়ির সবাই সুস্থ হয়ে উঠল এবং আর কেউ নাকি মারা যায়নি।

এক দিনের ঘটনা বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। হুজুরের স্ত্রী হুজুরকে চাল আনার জন্য তাগাদা দিলেন। হুজুর বললেন, তুমি পাতিলে পানি গরম কর। অগত্যা বেচারি উনুনে পাতিল চড়িয়ে পানি গরম করতে লাগলেন। পানি ফোটা শুরু করলে দেখা গেল কোথা হতে তিনজন ভক্ত মুরিদ হুজুরের জন্য চাল, ডাল, তরকারি নিয়ে এসে উপস্থিত। ঐ চাল, ডালে হুজুরের কয়েক দিনের খানার বন্দোবস্থ হল।

কলেরা, বসন্ত, চিচক হলে ভাজা পোড়া খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। হুজুর কোনো বাড়িতে (রোগাক্রান্ত) গেলে প্রথমেই চাল দিয়ে কড়ি ভেজে, ডাল ভেজে খেতেন ও সাগরেদদের খাওয়াতেন। উনার হাতে একটা আশা ছিল। আক্রান্ত বাড়িতে দলবল নিয়ে সারারাত জিকির করতেন ও ঝোপ-ঝাড়ে অসম্ভব পেটাতেন। একবার রামগতিতে নাকি ভীষণ কলেরা দেখা দিয়েছে। হুজুর দলবল নিয়ে গিয়ে সারা রাত বাড়িতে জিকির আজগার করেন। সকাল বেলা রোগাক্রান্ত এক বাড়ির এক কোণা দিয়ে চিচক তাড়াতে তাড়াতে বেরিয়ে এলেন। পরদিন থেকে ঐ অঞ্চলে নাকি আর ঐ রোগ দেখা যায়নি।

এক গভীর নিশীতে তার দায়রার একটু দূরে তিনজন লোককে হুজুর দেখতে পান। একটা তিন রাস্তার মাথায় তারা বসে আছে। একজন লেংলা, একজন অন্ধ, একজন বোবা। হুজুর তাদেরকে এখানে আসা ও একত্র হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে পাপে এলাকা ঢেকে গেছে। আল্লাহর হুকুমে তারা এখানে এসেছে। হুজুর চোখ বন্ধ করে বড় খতমের দোয়া পড়ে তাদেরকে বেদম মার দিলেন। ঝড়ের বেগে তিনজন তিনদিকে ভেগে গেল। তারপর থেকে নাকি ঐ বছর আর কোথাও ঐ রোগের আলামত দেখা যায়নি। এমনতর লোকশ্রুতি ও মোজেযা বৃত্তান্ত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

তথ্যদাতা : ডা. গিয়াস উদ্দিন, সফিক উল্লা মেম্বার, মতিন টেইলর। এরা সবাই চর পাগলার অধিবাসি।

তথ্য-উপাত্ত

২০ শে আশ্বিন – খোশরোজ শরীফ

১৬ মাঘ – বার্ষিক মাহফিল (ওরস)

১৭ জ্যৈষ্ঠ – ওফাত দিবস

এলাকার দরিদ্র মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতায় দায়রা পরিচালিত হয়। পাশে ছোট একটা পুকুর, ঘাট বা ঘাটলা নাই। ওরসে হাজার হাজার নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করে। অঞ্চলে যেন এক মহোৎসব। মানত করে দায়রা থেকে অনেকে মনস্কামনা পূর্ণ বা রোগ মুক্তির জন্য মাজার জেয়ারত করে ও দোয়া প্রার্থনা করে। ওরসের সময় শ্যামা, কাওয়ালী, জিকির আজগার হয়। ঢোল-বাদ্য হয়। সকালে তবরুক বিতরণ করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকেও অনেক ভক্ত আশেকানেরা ওরসে শামিল হয়। সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। মাজারের একটি এন্তেজামিয়া কমিটি আছে যার সভাপতি ডা. গিয়াস উদ্দিন সত্তরোর্ধ।

www.pathagar.com

৪. ওরস-মাজার, সদর

তারিখ : ১৮-০৮-০১১ইংরেজি
নাম : অলি মুন্সির ওরস (মাজার)
স্থান : চরচামিতা
সময় : বিকেল ০৪ টা

তথ্য প্রদানকারী :
নাম : জহিরুল হক
পিতা : মমতাজুল হক
মাতা : আলেয়া বেগম
বয়স : ৬৬ বছর
ঠিকানা : সাং- হাসানপুর, ডাক : মীরপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর।
পড়ালেখা : অষ্টম শ্রেণি
সংস্কৃতির শাখা : ওরস-মাজারের তত্ত্বাবধান ও পীরানীর তরিকার শিষ্য।
মাজার-ওরসের নাম : অলি মুন্সির ওরস
সময়কাল : ফাল্গুন মাসের চৌদ্দ তারিখ।
মাজারের কাল নির্ণয় : পূর্ব-পুরুষদের নিকট হতে শ্রুত দুই শতাধিক বছর পূর্বের।

ইতিকথা

মাজারের পূর্ব পাশে বিশাল দিঘি রয়েছে। দিঘির প্রাসঙ্গিক বহু কল্পকাহিনি ও কিংবদন্তি রয়েছে । মাজারেরও নানা অলৌকিক কাহিনী বা মোজেযা রয়েছে।

ওরসের বিবরণ

সুদীর্ঘকাল থেকে এ মাজারে বাৎসরিক ওরস মাহফিল নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে। পুরো এলাকার মানুষের নিকট এ মাজার মহা পবিত্র স্থান। এখানে বিশাল একটা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাজারের খাদেম যথারীতি ফাল্গুন মাসের ১৪ (চৌদ্দ) তারিখ এখানে ওরস মাহফিল মহাধূমধামে অনুষ্ঠিত করেন। ওরশের সময় মাজার ধোয়ামোচা করে সজ্জিতকরণ করা হয়। ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণির মানুষ এ মাজারে মুক্ত হস্তে দান করে। এ দিঘির পানি পবিত্র জ্ঞান করে বহু মানুষ নানা রোগ-শোক নিরাময়ের জন্য পান করে থাকে। মাজারকে কেন্দ্র করে এখানে একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে। আট-দশ বর্গমাইলের মানুষের নিকট ওরসের সময় সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। ঐ সময় এ অঞ্চলের মানুষ দেশের যে অঞ্চলে বাস করুক বা চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য করুক না কেন ওরসের সময় অকুস্থলে এসে পৌছঁবেই। পরিবারের প্রতিটি সদস্য এ অঞ্চলের ঐ রাতে সদলবলে ওরস মাহফিলে এসে মাজার জেয়ারত করবে ও অনুষ্ঠানে সারা রাত গোজরান করবে। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরদের এমন স্বতঃস্ফূর্ত মিলনমেলা সচরাচর দেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না। সবাইর মন পুত-পবিত্র থাকে। এ মাজারে জানা অতীতেও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে এমন কারো জানা নেই। ওরস মাহফিলের

www.pathagar.com

সময় মাজারের সামনে বিশাল সামিয়ানা টানানো হয়। রাত দশটার দিকে শুরু হয় জিকির-আজগার, শ্যামা, কাউয়ালি, পিরস্তুতি, ঢাক, ঢোল, নাকাড়ার ঝংকার ও জিকিরের স্বরে বোলে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়। ৮-১০ দল পালাক্রমে সংগিত পরিবেশন করে। এ মাজার ও ওরস এর সংস্কৃতির বিরোধিতা করার কোনো লোক খুঁজে পাওয়া ভার। শেষ রাতে মোনাজাতের পর তবরুক বিতরণ করা হয়। একটা বিশাল অংশ গোল হয়ে বসে ও হাজার-হাজার মানুষ মাইলের অধিক পথ-পথের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে তবরুক সংগ্রহ করে ও বাড়িতে নিয়ে যায়। তথ্যমতে, গত বছর লক্ষাধিক টাকা দিয়ে দুটো মহিষ ও কয়েকটা গরু এনে কোরবানি করা হয় ।

এ গ্রামের মানুষগুলো যত ব্যস্ততায়ই দিন কাটাক না কেন রাতের অবসর সময়টা তারা লোক উৎসব গান, নাচ বিভিন্ন বিনোদন করে কাটায়। এখানটায় একটি ঐতিহ্যবাহী মাজার আছে যার ভক্ত এখানকার লোকেরা। এই ওরস হয় 'অলি মুন্সি' মাজারে। এই মাজারের ভক্তরা সব সময় মোম, আতর বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকে। ভক্তরা সব সময় মাজারে জিকির, গান, গজল করে। দিঘিতে এসে গোসল করে কেউ যদি কোনো পাপ কাজে লিপ্ত থাকে এই পানিতে গোসল করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অনেক ভক্ত অনেক জায়গা থেকে এসে টাকা দেয়, কেউ কেউ হাঁস, মুরগি, গরু কিংবা ছাগল দান করে থাকে এই মাজারে। আসলে এই দিঘির একটি ঐতিহ্যবাহী ঘটনা আছে। লোকশ্রুতি অনুযায়ী এই দিঘি নাকি মানুষের তৈরি নয়, এটা একটা অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে খনন হয়। এক রাতের মধ্যে এ দিঘিটি হয়। সকালে এসে সবাই দেখতে পায় এই দিঘি। প্রায় ২ কানি জায়গা জুড়ে। হাজারো পর্যটক ঢাকা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখতে আসে। জানা যায়, এই দিঘির পেছনে আসল কাহিনী হচ্ছে, 'অলি মুন্সি' হুজুরের। তখনকার আমলে কারো প্রয়োজন হলে এই দিঘির মাঝখান থেকে পিতলের অনেক তৈজসপত্র উঠে আসত। লোকেরা ব্যবহার করে ধুয়েমুছে দিয়ে দিলে আবার ডুবে যেত। একদিন কে যেন একটা লবণের বাটি রেখে দেয়। এর পর থেকে আর দেখা যায়নি।

কথিত আছে, এই পিরেরা তিন ভাই। তাদের একেক জনের মাজার একেক জায়গায় গড়ে উঠেছে। এক রাতে সবার অজান্তেই মাজারটি উঠে আসে। এর কারণ কেউ বলতে পারে না। হঠাৎ এ মাজার কোথা থেকে উদয় হয় বা উঠে আসে। একদিন নাকি কোনো এক ব্যক্তিকে স্বপ্নের মাঝে হুজুর দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর দুই বাড়ির লোক (পার্শ্ববর্তী ভূঁইঞা বাড়ি ও পাটোয়ারী বাড়ি) মিলে এই কবর-মাজারের সেবা করতে শুরু করে।

৫. দরবেশ হুজুরের মাজার-কুশাখালীর হুজুর (রহ), সদর

বার্ষিক মাহফিলের (তিন দিনব্যাপী) ১ম দিন

মাহফিল আরম্ভ : সন্ধ্যার পর

১৬-০২-২০১২ ইং
৪ মাঘ ১৪১৮ বাংলা

www.pathagar.com

বৃহস্পতিবার
সময় দুপুর- ০২ টা
স্থান : রামপুর, ডাকঘর : পাকরামপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর।

নারকেল গাছের প্রথম ডাব বা নারকেল, পেঁপে গাছের প্রথম পেঁপেটা, কাঠাল গাছের প্রথম কাঠালটা, লাউ-কুমড়াসহ বিভিন্ন ফলজ গাছের প্রথম ফলটা মানত করা হয় দরবেশ হুজুরের মাজারের উদ্দেশ্যে। গাভী গরুর প্রথম দিনের দুধ হুজুরের বাড়ির নিয়তে আনা হয়। উঁনার সুযোগ্য তিন পুত্র সন্তানের একজন ছিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম সাহেব এমবিবিএস, (প্রয়াত) অন্য দুই সুযোগ্য পুত্র আধ্যাত্মিক পুরুষ হযরত মাওলানা নুরুল হুদা (বড় হুজুর) ও হযরত মাওলানা নুরুল আমিন (ছোট হুজুর) কেবলা। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে জটিল মাসালা উনারা সমাধান দেন। লক্ষ্মীপুর-নোয়াখালীর ধর্মবিশারদদের অন্যতম পুরুষ এ দুই সহোদর মহান সাধকের যোগ্য উত্তরসূরী। দুজনেই মাজার ও মাহফিলের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদেরও রয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনা ও অলৌকিক মোজেযা যা তাঁদেরকে জেন্দাপিরের মঞ্জিলে পৌঁছে দিয়েছে। ফাল্গুন মাসের ৪র্থ দিন থেকে শুরু হয়ে তিন দিনব্যাপী পবিত্র ওয়াজ মাহফিল হয়ে থাকে। এ মাজারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মসজিদ, হেফ্‌জখানা, মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা, মাসের প্রথম চাঁদে জিগির আজগার, তালিম, প্রতি বৃহস্পতিবার তালিম, জিগির আজগার।

মাজার শরীফ : অত্যন্ত সাদামাটা মাটির আসন। কোনো অলংকরণ নেই। শুধু চারধারে সামান্য ইটের গাঁথুনী-বেষ্টনী।

মাহফিলে বসার জন্য ধাড়ি, খড়, বটুনি, বিছানা (শীতলপাটি) ব্যবহার করা হয়। উপরে বিশাল সামিয়ানা টানানো হয় যেখানে একসাথে মঞ্চের সামনে কয়েক লক্ষ মানুষ বসতে পারে ও ওয়াজ শ্রবণ করতে পারে সামনাসামনি।

প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় ট্রাস্ট্রির মাধ্যমে। স্বেচ্ছায় মানত-অনুদান দিয়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। মাহফিলও অনুরূপভাবে ফি বছর চলে আসছে। সমসাময়িক কালে লাখ লাখ মানুষ জমায়েত হয় মাহফিলে। দেশবরেণ্য আলেমগণ ওয়াজ নছিহত করে থাকেন।

৬. প্রবাদ-প্রবচন, লোকশ্রুতি, লোক-বিশ্বাস

প্রবাদ : প্রবাদ আছে দরবেশ হুজুরের কাছে নাকি জ্বিনেরা হাজিরা দিত। এখনো ছোট হুজুর কেবলা (রহ.) (মাজার হেফাযত ও তদারকী) সাথে নাকি জ্বিনেরা কথা বলে।

লোকবিশ্বাস : ছোট হুজুর বিভিন্ন তদবির দিয়ে থাকেন বিভিন্ন রোগ-শোক প্রশমনের জন্য, মনস্কামনা (পুত অর্থে) পূরণের জন্য। তাবিজ, কবজ, পানিপড়া, তেলপড়া, ইত্যাদির জন্য লোকেরা হুজুরের শরণাপন্ন হন।

লোকশ্রুতি : একবার মাহফিলের সময় খাদ্যের টান পড়ে আছে। বড় হুজুরের শরণাপন্ন হয়ে জানালেন কর্মকর্তারা, তখন হুজুর বললেন তোমরা পানি দিয়ে পাতিল

www.pathagar.com

পাক ছড়াও আমি দু'রাকাত নামাজ পড়ে আসি। একথা বলে হুজুর অজু করে দু'রাকাত নামজ আদায় করে সেজদায় কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। সেজদা থেকে উঠে এসে বললেন, বিসমিল্লাহ পড়ে পাতিলের ঢাকনা তোল। একি! বিভিন্ন পাতিলে টগবগ করে মাংস আলু ফুটছে, ভাত সেদ্ধ হয়ে আছে। সবাইতো হতবাক! এ পবিত্র তবরক দিয়ে বাকি লোকদের খাওয়ানো হয়।

তথ্য সংগ্রহ : কবির : ৪২ (বরন্দাজ বাড়ি, আবু কালাম : ৬৫, বকসীবাড়ি, সৈয়দপুর)

কথিত আছে, দরবেশ হুজুরের বাড়িতে রাত্রে নাকি এক শিয়াল এসে মুরগির খোয়াড় ফাঁক করে যেইমাত্র মুরগি ধরতে হাঁ করে রয়েছে অমনি অচল হয়ে হা করে সারারাত দাঁড়িয়ে রয়েছে নড়াচড়া করতে পারেনি। হুজুর সকালে এ খবর অবগত হয়ে খোয়াড়ের নিকট গিয়ে শেয়ালকে বললেন, যা, চলে, যা তোকে মাফ করে দিলাম। অমনি নাকি শেয়াল দৌড়ে পালালো।

একলোক হুজুরের কলার ছড়া চুরি করতে এসে নাকি ঐ অবস্থায় সারারাত দাঁড়িয়ে রইলো। সকালে হুজুর খবর পেয়ে অকুস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করল। এমনি অসংখ্য লোকশ্রুতি, প্রবাদ প্রবচন এ জনপদে (সদর, কমলনগর, রায়পুরে, লক্ষ্মীপুরে) প্রচলিত আছে যা এ মাজার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

৭. জন্মাষ্টমী

লক্ষ্মীপুর শহরের শ্রী শ্রী শ্যাম সুন্দর জিউ আখড়ায় প্রতি বছর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে শ্রী কৃষ্ণের জন্ম তিথি অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার নারী-পুরুষ এখানে সমবেত হয়। সারারাত চলে কীর্তন ও নামযজ্ঞ এবং দিনের বেলায় র‍্যালি ও হোলি খেলা। রামগতি পৌর এলাকার চরসীতা গ্রামে রাধিকা প্রসন্ন দাসের বাড়িতে অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৮. বিয়ে

অনাদিকাল থেকে ধনী-গরিব সম্প্রদায় ভেদে সাধ্যমত এ অঞ্চলে বিয়ের উৎসব পালিত হয়। বিয়ে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের সমাবেশ ঘটে। কোথাও কলা গাছ ও পাতা-লতার কোথাও রঙিন কাপড়, কাগজের ফুল, আলো প্রক্ষেপণের দ্বারা গেট তৈরি হয়। বাড়ি ঘর কিংবা বিয়ের প্যান্ডেল কোথাও রঙিন কাগজ কেটে কোথাও কাপড় দিয়ে তৈরি হয়। গ্রামীণ সমাজে মাইকে গান বাজে। শহরে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়। এক সময় বরের বাড়িতে কনে যেত পালকি কিংবা নৌকায় চড়ে। এখন যায় রিক্সা, মাইক্রোবাস ও প্রাইভেট গাড়ি করে। পালকি ও নৌকা সাজানো হতো রঙিন পাতলা কাগজ দিয়ে। এখন ফুল দিয়ে গাড়ি সাজানো হয়। বর ও বধুবরণ হয় ঘটা করে।

৯. জন্মদিন

সাম্প্রতিক লক্ষ্মীপুরের অবস্থাসম্পন্ন ও শহুরে লোকদের মাঝে ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্মদিন পালিত হয়। মোমবাতি, মুচিবাতি কিংবা বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে ঘর বাড়িতে

www.pathagar.com

আলোকসজ্জা করা হয়। পিঠা তৈরি, কেক কাটা ও সংগীত পরিবেশন জন্মদিনের প্রধান আকর্ষণ।

১০. অন্নপ্রাশন

প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে ছোট সোনামনিদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য ঘটা করে অন্নপ্রাশন আয়োজন করা হয়। ছেলে শিশুকে মাথায় মুকুট পরিয়ে বর বেশে এবং মেয়ে শিশুকে মাথায় চূড়া পরিয়ে কনে বেশে সাজানো হয়। কপালে চন্দনের ফোটা দেওয়া হয়। বাড়িতে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়। মন্দিরে পূজা শেষে অতিথিদের নিরামিষ ভোজ এবং মন্দিরে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয়। বাড়িগুলো বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো উৎসব মুখর হয়ে উঠে। শিশুর মামা এখানে মুখ্য ব্যক্তি। তিনি শিশুর মুখে অন্ন প্রসাদ তুলে দেন। ঐ সময় উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি চলতে থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. তথ্যদাতা : তপন সেন (বিশিষ্ট পণ্ডিত), পিতা : অটল সেন, কল্যাণপুর, লক্ষ্মীপুর।

২. শংকর মজুমদার, শারদীয় দুর্গা পূজার আয়োজক, শ্রী শ্রী শ্যাম সুন্দর জিউ আখড়া, থানা রোড, লক্ষ্মীপুর।

৩. স্থান : সৈয়দপুর চংদার দিঘির পাড় শ্মশান, ডাকঘর : রূপাচরা, সময় : সন্ধ্যা-৬, সদর, লক্ষ্মীপুর। ২৯-১০-১২ ইং নাম : খোকন চন্দ্র শীল- ৪০, পিতা : স্বগীয় প্রকাশ চন্দ্র শীল, শিক্ষা : ৫ শ্রেণি, পেশা : ক্ষৌরকর্ম, বাড়ি : লাবণী ডাক্তারের বাড়ি, গ্রাম : সৈয়দপুর, ডাকঘর : রূপাচরা, সদর, লক্ষ্মীপুর।

www.pathagar.com

লোকমেলা

১. বুড়া কর্তার মেলা

আশ্রম কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠান/স্থাপত্য, গৌর মন্দির, কালী, শীতলা বিদ্ধেশরী মন্দির, দুর্গা মন্দির। শিশু শিক্ষা স্কুল (হিন্দু ধর্মীয়), উৎসব, রথযাত্রা, ঝুলন, হ্রাস, সরস্বতি পূজা, দোল পূর্ণিমা, চৈত্র সংক্রান্তি, কালিয়া নাচ। গৈরা নাচ। আশ্রমের নিজস্ব কীর্তনীর দল আছে। সাপ্তাহিক হরিসভা বসে। মেলাকে কেন্দ্র করে একটা কীর্তনীয় দল গঠন হয়। নাম : বীণাপাণি। শ্রী আশ্রম সংঘ। মূলত : মেলার ব্যাপ্তি ১০ দিন/১ম চার দিনব্যাপী অষ্টপ্রহর কীর্তন চলে।

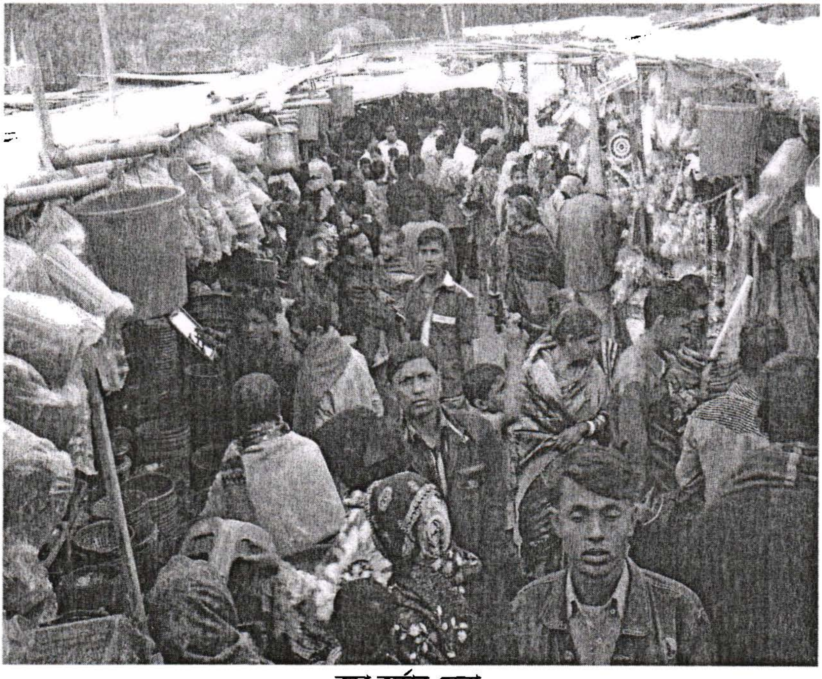

বুড়া কর্তার মেলা

প্রধানত যান : গৃহস্থালী জিনিসপত্র, আসবাবপত্র কেনা। একজন বলেছেন দেখার জন্য সুবিধামত হাস্থা অইলে ২-৩ দিন পর এসে কিনবেন। (হাস্থা = সস্তা)

www.pathagar.com

বিনোদন : যাত্রা, কীর্তন, ছড়িখেলা, সার্কাস, রাধাচক্কর, ভোলার ব্যবসায়ী ও বিনোদন, অংশগ্রহণ। অঞ্চলের মানুষ মেলাকে ফুর্তির কেন্দ্র হিসেবে দেখে।

তথ্যদাতা : পুরোহিত অমর চক্রবর্তী- ৬৩, পিতা : কৃষ্ণকমল বৈষ্ণ, গ্রাম : চর ডাক্তার, ডাক : আলেকজান্ডার, রামগতি। রামগতি, লক্ষ্মীপুর, মেলার ২য় দিন, মেলার উপলক্ষ : তিরোধান উৎসব, তারিখ : ৩১-০১-২০১২

২. খানকা মেলা

চৌপল্লী বাজারের পশ্চিম পাশে জৈনপুরী দরবেশের একটা খানকা অবস্থিত। প্রতি বছর এখানে মাহফিল ও জলসা হয়। বছর পাঁচেক আগ থেকে চৌপল্লী হাইস্কুল মাঠে তিন দিনব্যাপী বৈশাখি মেলা হয়। ঢাকা থেকে প্রতি বছর নামকরা শিল্পী এনে অনুষ্ঠান করা হয়। গ্রামীণ জীবনের নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেলায় বিক্রি করা হয়। কাঠের আসবাবপত্রের জন্য এর বিশেষ খ্যাতি আছে।

তথ্যদাতা : নুরুল ইসলাম (৫০), পিতা : দুলামিয়া, মৃধা বাড়ি, গ্রাম ও ডাক : চৌপল্লী, সদর, লক্ষ্মীপুর। পেশা : কৃষি, সংগীত ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনুরাগী।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

ক. চিরি খেলা-জক্করজানি

বর্ণনা : ৮-৭-৮-১০ জন হাত কড়া ধরে গোলাকার হয়ে দাঁড়ায়। কাগজে প্রত্যেকের নাম লিখে লটারি দেয়া হতো। প্রথমে যার নাম আসত সে হতো খেলোয়াড়। অন্যভাবেও খেলোয়াড় নির্বাচন করা হতো। একজন উপরের দিকে একট চাড়া বা কাঠি ছুঁড়ে দিত যার গায়ে এসে পড়ত অথবা যে ধরতে পারত সে হতো খেলোয়াড়। খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে গেলে বাকিরা হাতে-হাতে হাতকড়া তৈরি করে গোল হয়ে দাঁড়াত, খেলোয়াড় বৃত্তের ভেতরে অবস্থান নিত। এরপর খেলোয়াড় প্রতিটি হাতকড়ায় (জোড়) হাত দিয়ে ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে বুলি দিত : 'এই দুয়ার কাটাইয়া।' বাকি সবাই সমস্বরে বলত, ছেঁড়া দুয়ার মাটাইয়া।' এভাবে কিছু সময় কাটানোর পর খেলোয়াড় তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতো। এবার হাতকড়া বৃত্ত ভেঙে বের হয়ে যাওয়ার জন্য সে ডান হাতের কানি দিয়ে বোল দিতে দিতে শিকল কেটে বের হওয়ার চেষ্টা করত। বাকিরা শিকল শক্তভাবে ধরে রাখত যাতে ভেঙে দিয়ে খেলোয়াড় বের হওয়ার সুযোগ না পায়। শিকল ভাঙতে পারলে সে বের হয়ে যেত।

বোল : 'এক কোব, দুই কোব, কুড়াইলের কোব' বলে ডান হাতের কানি দিয়ে শিকলে দায়ের কোপের মতো কোপ মারত। এ সময় অল্প বয়সী শিশুরা ব্যথা পেয়ে কেঁদেও দিত। বুড়া-বুড়িরা এজন্য বকাবকিও করতে শুনা যেত। এভাবে শিকল ভাঙতে অসফল হলে প্রয়োগ করা হতো সর্বশেষ কৌশল যা খেলার মূল আকর্ষণ। এবার খেলোয়াড় মুক্ত হওয়ার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করত। বন্যায় পানি বাড়লে যেভাবে মানুষ উঁচে উঠে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে সে রকম এক প্রক্রিয়া এটি। খেলোয়াড় বোল দিত, 'এদ্দুরা হানি' বাকিরা সমস্বরে বলে উঠত 'জক্করজানি'। কয়েক বোলের পর চারদিকে খেলোয়াড় ঘুরে ঘুরে বোল দিত ও লাফ দিয়ে শিকলের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। সে পানির স্তর বাড়ার মতো (কাল্পনিক) লাফ দিয়ে আরো উপরে উঠে শিকল অতিক্রমের চেষ্টা করত। বাকিরা হাত-শিকল সে পরিমাণ উঠাত যাতে খেলোয়াড় লাফিয়ে শিকলের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। এভাবে বুলি ও খেলা চলতে থাকত কোনক্রমে খেলোয়াড় বেরিয়ে যেতে বা মুক্ত হতে না পারলে মরিয়া হয়ে শিকলের উপর দিয়ে লাফ দিত। সফল হলে সে মুক্ত আর ব্যর্থ হলে পুনঃ সে বৃত্ত বন্দি হয়ে পুনরায় খেলা শুরু করত। মুক্ত হওয়ার পর তার চোখ রুমাল দিয়ে বেঁধে দেয়া হতো। বাকিরা তাকে ঘিরে চারদিকে হট্টগোল হাসাহাসি করে খেলা জমাত। যাকে সে ধরে ফেলত বা ছুঁয়ে দিত সে হয়ে যেত বন্দী অর্থাৎ বৃত্তবন্দী খেলোয়াড়। পুনঃ শুরু হতো খেলা একই নিয়মে। খেলোয়াড় বৃত্ত হতে বেরিয়ে যাবার সময় টুক-কু-রু-টুক বলে লাফ দিত।

বি.দ্র. এ খেলার রেশ এখনো ক্রীড়ামান স্বল্পায়তনে।

www.pathagar.com

খ. হাঁস খেলা

এ খেলায় হাঁসের নির্ধারিত সংখ্যা থাকত না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বর্ষাকালে উঠানে ঝড়ো হয়ে এ খেলা খেলে থাকত। একটি বাড়িতে অধিক জোর ৮-১০-১২ শিশু থাকত। সাধারণত মুষলধারে বৃষ্টির সময় এ খেলা অনুষ্ঠিত হতো। একজন হতো খেলোয়াড় বা শিয়াল। বাকিরা সারিবদ্ধভাবে হাঁসের মতো বসত। খেলা শুরু হলে হাঁসের দল ঐ বসা অবস্থায় হাঁসের মতো ভঙ্গি করে আস্তে আস্তে সারিবদ্ধ হাঁসের মতো হাঁটতে বা এগুতে থাকত। এবার শিয়াল প্রথম হাঁসের কাছে গিয়ে প্রশ্ন জুড়ে দিত। হাঁসরে হাস কোনাই যাস? সমস্বরে হাঁসেরা বলতে থাকত : দরিয়ার থাই চরিয়া খাইতাম।

শিয়াল : ধরি নিয়াম
হাঁসেরা : ঠোঁট দিয়াম
শিয়াল : কুনগা নিতাম
হাঁসেরা : হিচে-র গা।

এভাবে শিয়াল বা খেলোয়াড় পেছনের হাঁসটা ধরে তুলে নিয়ে যেত। বাকিরা পূর্ববৎ এগুতে থাকত। এভাবে সমস্ত হাঁস উজাড় হবার পর ঐ শিয়াল হাঁস হয়ে দলে বসত। শেষ হাঁসটা শিয়াল বা খেলোয়াড় হয়ে পুনরায় খেলা শুরু হতো। এখনো গ্রামাঞ্চলে এ খেলার প্রচলন রয়েছে ।

গ. কেলাকোপা ভোঁ- ভোঁ

একজন দাঁড়িয়ে থাকত। অন্যজন তার দুপা দণ্ডায়মান খেলোয়াড়দের দুহাত দুই পাজরায় রেখে শক্ত করে ধরে রাখতো এবার খেলোয়াড় 'কেলা কোপা ভোঁ ভোঁ' শব্দ করে চতুর্দিকে হাত দিয়ে ঘুরতে থাকত ও চর্তুপাশে ছুটাছুটির পর তাদের ধরে ফেলতে চাইত। ঘূর্ণায়মান শিশুরা খেলোয়াড়ের মাথা ছুঁয়ে দৌড় দিত যেন তাকে খেলোয়াড় ধরতে না পারে। সে মাটিতে হাত ঠেস দিয়ে শূন্যে ঘুরত। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে মাটিতে মাথা ছোঁয়া গর্বের ব্যাপার। যতক্ষণ না সে কাউকে ছুঁতে বা ধরে ফেলতে পারত ততক্ষণ এভাবেই খেলা চলত। যাকে ছুঁয়ে বা ধরে ফেলত সে খেলোয়াড় হতো।

ঘ. ছড়িখেলা, লাঠিখেলা, রামগতি (আলেকজান্ডার) ছড়িয়াল মোস্তফা

তারিখ : ১০-০১-২০১২ ইং

ক) নাম : মোহাম্মদ মোস্তফা কমান্ডার স্ত্রী : পেয়ারা বেগম

খ) পিতার নাম : মৃত আনোয়ার আলী

www.pathagar.com

গ) মাতার নাম : মৃত মাইফুলের নেছা

ঘ) ঠিকানা : চর সেকান্দার, মোস্তফা কমান্ডারের বাড়ি, আলেকজান্ডার, রামগতি।

ঙ) পেশা ও প্রতিষ্ঠান : লোকায়ত ছড়িখেলা (দল প্রধান)

চ) বয়স : ৬৪ বছর

ছ) শিক্ষা : নবম শ্রেণি, চরসীতা তোরাব আলী উচ্চ বিদ্যালয়

জ) সাংস্কৃতিক শাখা : ছড়িখেলা, লাঠিয়ালী, লেঠেল।

ঝ) পৈতৃক পেশা : কৃষি।

* বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা।

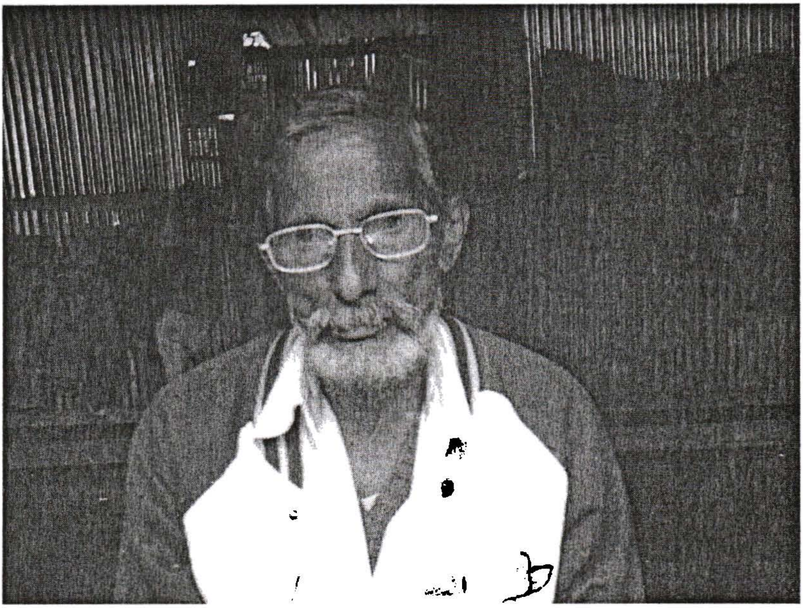

ছড়িয়াল মোস্তফা কমান্ডার

ঞ) আবাস জনপদের বিবরণ : বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে ক্রমে জনবসতি গড়ে উঠেছে। ৪০-৪৫ বছর পূর্বের ঊষর ধূলিময় অনুর্বর ভূমি এখন সবুজ ফসলে সমৃদ্ধ। এখন তিন ফসল জন্মে। আউস, পৌউস, ধূলোট বা রবিশস্য। রাস্তাঘাট কাঁচা। অনুন্নত জনপদ। হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নগণ্য। বাড়ি-ঘর মান্দাতা আমলের (ছন-খড়ের ঘর) কুঁড়ে ঘর, পাতার ঘর, কিছু টিনের ঘরও আছে সম্পূর্ণ পরিবারের। অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। এ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো ছোট ছোট পানের বরজ রয়েছে।

www.pathagar.com

ট) পরিবারের মোট লোকসংখ্যা : ৯ জন (৪ ছেলে, ৩ মেয়ে) নাতি-পুতি ২০-২২ জন।

ঠ) স্ত্রী : গৃহিণী, ২ ছেলে ইট ভাটায় কাজ করে ও ক্ষেত মজুর, ১ ছেলে বাজারে চাল বিক্রি করে, ১ ছেলে স্কুলে পড়ে।

ড) দৈনিক পারিবারিক আয় : নাই (স্বামী-স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে) = ০৪ জন

মাসে দুই হাজার টাকা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা। এছাড়া খেলা প্রদর্শন করে (অনিয়মিত) মাসে ২-৩ হাজার টাকা পেয়ে থাকেন।

ঢ) দৈনিক ব্যয় : ন্যূনতম ৩০০ টাকা

ণ) সঞ্চয় : থাকে না। বরং ঋণী হয়ে আছেন।

ত) ভূমি, সম্পদ, গবাদি পশু-পাখি : বসতবাড়ি ব্যতীত সামান্য ভূমি রয়েছে পৈতৃক ১০ শতাংশ। কিছু হাঁস-মুরগি পালন করেন।

থ) সংগঠন প্রতিষ্ঠান : চর সেকান্দর মোস্তফা কমান্ডার ছড়িয়াল দল। লোকনাট্য গোষ্ঠী (গোলাপ তৃণমূল, নাট্যগোষ্ঠী, আলেকজান্ডার) এ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের তিনি পুরোধা।

দ) ওস্তাদ : প্রখ্যাত ডাকসাইটে লাঠিয়াল সর্দার মাইজল মিয়া (ভোলা)

ঙ. লাঠি খেলা

লোকজ খেলার মধ্যে অন্যতম উপভোগ্য খেলা হলো লাঠি খেলা। লাঠি খেলা গ্রামের মানুষের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। জেলার ক্রিড়া সংস্থা মানুষের মনে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে এই খেলার আয়োজন করে থাকে।

www.pathagar.com

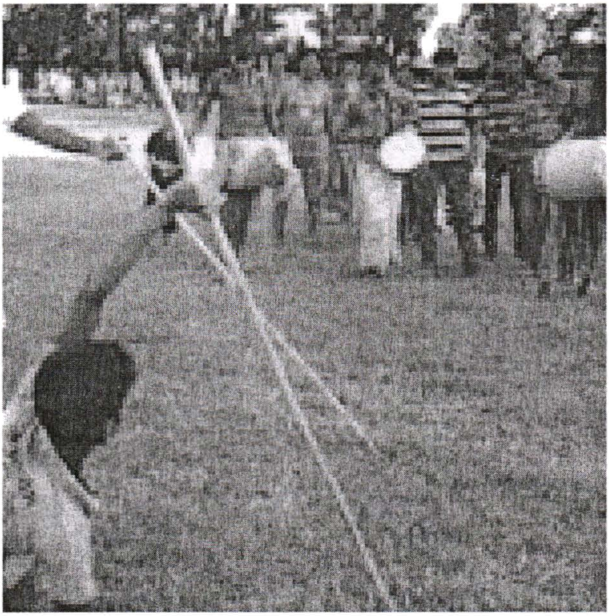

লাঠি খেলার দৃশ্য

২. ক) মোস্তফা ভাই যৌবন বয়সে ৬-৭ বছর লাঠিয়াল হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। রণক্ষেত্রে ওস্তাদের বিভৎস মৃত্যু দেখে শোকাবিভূত হয়ে এ পেশা ছেড়ে দেন। শুরু করেন জীবনের আরেক অধ্যায়ের অভিযাত্রা। লাঠিয়ালী জীবন ত্যাগ করে উক্ত বিষয়ের কলাকৌশল লাঠিয়াল প্রাণঘাতী বিদ্যার বাইরে ছড়ি খেলার প্রবর্তন করে নিজস্ব বাহিনী গঠন করেন। উক্ত দল গঠন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ রক্ষা করার মহৎ উদ্যোক্তা। যাতে জোতদার, লাঠিয়ালদের কবল থেকে সমাজ মুক্তি পায়। তার চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন এলো। তিনি ভাবলেন, মুষ্টিমেয় জোতদার থেকে কিছু টাকা নিয়ে সাধারণ গরিব মানুষের ঘর-বাড়ি, জোত জমি, চর দখল ও তাদের উপর নির্যাতন পীড়ন অন্যায় এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো উচিত। শুরু হলো মোস্তফা বাহিনীর সাথে জোতদারদের পাল্টা লড়াই। জনপদের কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় চাষি ভূষাদের দলভুক্ত করে অত্যাচারিতদের সাথে নিয়ে বিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন মোস্তফা কমান্ডার। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে মাঠে নামান। বিশাল অঞ্চল জুড়ে তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে জোতদার বিরোধী প্রতিরোধ বাহিনী। পাশাপাশি গণমানুষের বিনোদন লীলা যাত্রাপালা, লোকনাট্য, কবি সরকারি, পালাগান, নাচ এসব ক্ষেত্রে তাঁর দলের সদস্যরা ছিল পুরোভাগে। বাল্যবিবাহ রোধ (এ অঞ্চলের সামাজিক ব্যাধি) যৌতুক প্রথা বিরোধী আন্দোলনও শুরু করেন তিনি যা তাকে কিংবদন্তি পুরুষ মোস্তফা ভাই আখ্যা দিয়েছে।

www.pathagar.com

২. খ) প্রেরণা পেয়েছেন নকশাল আন্দোলন থেকে, আগ্রহ পেয়েছেন ভূমিহীন, নদীভাঙ্গা মানুষও চাষাবাদের, সংখ্যালঘুদের (হিন্দু সম্প্রদায়) কাছ থেকে এ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার। বিস্তার রামগতি, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর সদর। এ খেলা প্রদর্শিত হওয়ার পর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ডেকে করমর্দন করেন ও কোলাকুলি যা তাঁর স্মৃতিস্পটে চির ভাস্বর।

প্রয়োগক্ষেত্র : মোস্তফা কমান্ডারের প্রবর্তিত ছড়িখেলা (লাঠিয়ালীর লোক রূপান্তর) ইতোমধ্যে জেলার বাইরেও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন এনজিও সংস্থা জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবসগুলোতে, গ্রাম্য মেলায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এ খেলা বেশ জনপ্রিয় ও আদৃত হচ্ছে। জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে তাঁর দল অংশ গ্রহণ করে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা ও পরিবেশনা : শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, দৌলত খাঁ জেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষত স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ও লোক মেলা।

২. (গ) সংস্কৃতির কাজে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো : তিনি অনুষ্ঠানের কাজ করেন অনেকটা ক্রীস্টালের মতো। তিনি সরাসরি সংগঠনের কাজ করেন, তদারকি করেন, পরস্পরের সাথে দৈনন্দিন কর্ম সঞ্চালনের কাজ করেন। প্রতি নিয়তই সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সাথে জোঁকের মতো লেগে থাকেন। সব সময় সবাইকে উজ্জীবিত রাখেন। সংস্কৃতিসমূহ : লোকনাট্য, ছড়িয়াল, বাদক-গায়ক।

তার বিশেষ বা অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ভূমি দখল, চরদখল, বাড়ি, নদী, জমি দখল, খাল-বিল, হাট-বাজার দখলকারী ভয়ংকর প্রাণঘাতী লাঠিয়ালী বিদ্যাকে তিনি যুবকদের সংগঠিত করে সমাজের হিতকারী শক্তিতে রূপান্তরিত করে বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ খেলা বা ছড়ি খেলায় রূপদান করেছেন।

২. (ঘ) সহযোগী শিল্পীদের নাম ও ঠিকানা : কাজের বিবিরণ : এ মুহূর্তে তাঁর দলে ছড়িয়াল রয়েছে ১২ জন। যন্ত্রী ৫ জন। ঢাক-ঢোল, বাঁশি, ঘুঙ্গুর, জিপসী, করতাল।

খেলার বিবরণ : দল একটা বিশেষ অঙ্গ-সজ্জা থাকে। বাদ্যের তালে তালে, নাচের তালে তালে চলে চড়ি, লাঠিখেলা ও কসরত। খেলা প্রদর্শনের সময় ছড়িয়াল থাকে ৮ জন বা ১২ জন। যন্ত্রী ৫ জন।

চ. মার্বেল খেলা

গ্রাম বাংলার কিশোরদের কাছে খুবই জনপ্রিয় এই মার্বেল খেলা। মার্বেল ছিল গ্রামের দোকানগুলির অন্যতম পণ্যসামগ্রী। গ্রামের প্রতিটি দোকানে নানা রঙের, নানা আকারের মার্বেল পাওয়া যেত। বর্তমানেও এ খেলাটি লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

www.pathagar.com

মার্বেল খেলা আমাদের সকলের নিকট অতি পরিচিত খেলা। এ খেলা কিভাবে খেলতে হয় বা কত প্রকার তা আমরা অনেকেই জানি না। নিম্নে মার্বেল খেলার বিবরণ দেয়া হলো :

চাল দিয়ে গর্তে মার্বেল ফেলা : এ খেলায় বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় অংশ নিতে পারে। এ খেলার জন্য প্রয়োজন বেশ খানিকটা সমতল ভূমি। ভূমির মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট গর্ত খুঁড়তে হয়। খেলোয়াড়রা যে জায়গা থেকে মার্বেল চেলে গর্তে ফেলার চেষ্টা করবে সেখানে একটি আড়াআড়ি দাগ দিতে হয়। গর্ত থেকে ১২ থেকে ১৪ ফিট দূরে মাটিতে দাগ দেওয়া হয়। কম বয়সী খেলোয়াড়দের জন্য গর্ত থেকে দাগের দূরত্ব কমানো যেতে পারে। দাগের ৮ থেকে ১০ ফিট দূরে গর্তের সামনে আরেকটি দাগ দিতে হয়।

যেভাবে খেলা শুরু হয় : প্রথম চাল কে দেবে তা নির্ধারিত হয় এক ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে। সব খেলোয়াড় একই দূরত্ব থেকে একটি গর্তের দিকে মার্বেল ছোড়ে। যার মার্বেল গর্তের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে সেই প্রথম চাল দেবে এবং সব মার্বেল একসাথে নিয়ে গর্তের দিকে ছুড়ে মারবে। যেসব মার্বেল সরাসরি গর্তে পড়বে সেগুলোকে সে পাবে। বাকি মার্বেলগুলো কিভাবে জিতবে তা নির্ভর করে কিছু শর্ত ও খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের ওপর।

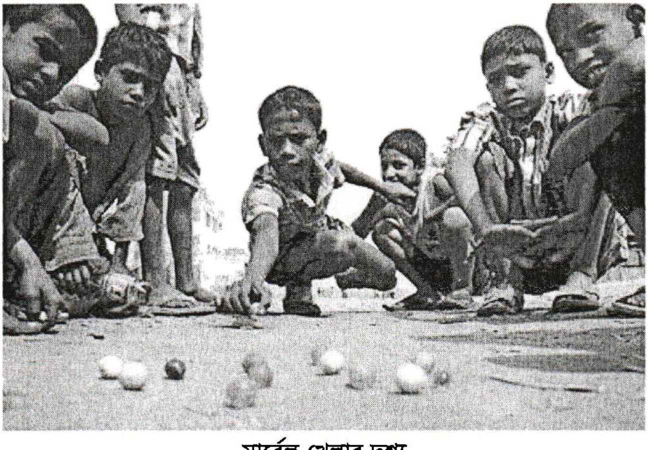

মার্বেল খেলার দৃশ্য

যদি খেলোয়াড় সব মার্বেলকে গর্তের সামনের দাগ অতিক্রম করাতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে খেলোয়াড় যে কয়টি মার্বেল গর্তে ফেলেছিল শুধুমাত্র সেই মার্বেলগুলো পাবে। কিন্তু যে কয়টি মার্বেল দাগ অতিক্রম করেনি তাকে ততগুলি মার্বেল ফাইন (জরিমানা) দিতে হবে। যদি সব মার্বেল দাগ অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে যে মার্বেলগুলো গর্তে পড়েছে খেলোয়াড় সেগুলোর মালিক হবে। চাল দেওয়ার দাগ থেকে একটি মার্বেল ছুড়ে অন্য মার্বেলকে লাগাতে পারলে সেই মার্বেলগুলো জিতে নেবে। ছুড়ে দেয়া মার্বেল যদি একাধিক মার্বেলকে আঘাত করে তা হলে সে কোনো মার্বেল জিততে পারবে না, বরং

www.pathagar.com

ফাইন (জরিমানা) দিতে হবে। একটি বাদে যে কয়টি মার্বেলকে তার ছুড়ে দেওয়া মার্বেল আঘাত করেছে তাকে সেই কয়টি মার্বেল ফাইন দিতে হবে। এরপর পরবর্তী খেলোয়াড় চাল দিবে।

হিট করে মার্বেল নেয়ার অনেকগুলো নিয়ম আছে। যেমন খেলোয়াড় নিজের পছন্দমতো মার্বেল আঘাত করে জিতে নিতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য মার্বেল, আঘাত পর পর যে কয়টি মার্বেলকে আঘাত করতে পারবে খেলোয়াড় সে কয়টি মার্বেলকে আঘাত করতে বলে। সে যদি নির্দিষ্ট মার্বেলকে আঘাত করতে পারে এবং তার ছুড়ে দেওয়া মার্বেল যদি অন্য মার্বেলকে আঘাত না করে তা হলে সে সবগুলো মার্বেলের মালিক হবে। যদি নির্দিষ্ট মার্বেলকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সে কোনো মার্বেল পাবে না। এরপর অন্য খেলোয়াড় চাল দেওয়ার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে সাধারণত দূরের বা কাছাকাছি অবস্থানরত মার্বেলের কোনো একটিকে আঘাত করতে বলা হয়।

ছ. ষাঁড়ের লড়াই

ষাঁড়ের লড়াই গ্রাম বাংলার একটি জনপ্রিয় উপভোগ্য অনুষ্ঠান। ষাড়ের লড়াইয়ের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বা নির্ধারিত তারিখ থাকে। 'ষাঁড়ের লড়াই' খেলাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা কোনো ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। হাটবারের দিনে গ্রামের কয়েকটি হাটে ঢোল বাজিয়ে ষাঁড়ের লড়াইয়ের দিন, তারিখ, সময় ও স্থানের নাম জানানো হয়। লড়াইয়ের দিন ষাঁড়ের মালিকগণ নিজ নিজ ষাঁড়ের গলায় রঙিন মালা পরিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে সমবেত হন। আবার কমিটির লোকজন নির্ধারণ করে কোন ষাঁড়ের সাথে কোন ষাঁড়ের লড়াই হবে। দুই ষাঁড়ের মধ্যে লড়াই শুরু হলে দর্শকগণ চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিতে থাকে এবং মনের উল্লাসে চিৎকার করে। লড়াইয়ে সে ষাঁড়টি পরাজিত হয় সে ষাঁড়টি দর্শকের ব্যূহ ভেদ করে দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। জয়লাভকারী ষাঁড়টিকে উপস্থিত জনতা করতালি দিয়ে ধন্যবাদ জানায় এবং মালিককে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

ষাঁড়ের লড়াই

www.pathagar.com

জ. নৌকা বাইচ

নৌকার বহুমাত্রিক ব্যবহার বাঙালির চিরায়ত। জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদ-নদী-খাল-বিল গাঙ্গের উপদ্বীপের বৈশিষ্ট্য। চণ্ডিমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দ রাম বঙ্গে তিনশ গজ লম্বা নৌকার উল্লেখ করেছেন।

লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের নৌকা বাইচ একটি সৌখিন এবং প্রাচীন খেলা। প্রতি বছর বর্ষাকালে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা ও রামগতি উপজেলায় নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন থানার সাথে এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। গ্রামের মানুষের নৌকা বাইচ হলো সবচেয়ে বড় বিনোদনের মাধ্যম। লক্ষ্মীপুর উপজেলার চেয়ারম্যান এম. এ তাহের প্রতিবছর বর্ণাঢ্য নৌকা বাইচের আয়োজন করে থাকেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা, পৌরসভার চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ এবং সবার সার্বিক সহযোগিতায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিবছর নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্মীপুর জেলার নৌকা বাইচের দৃশ্য

ঝ. গোল্লাছুট

তারিখ : ২৫-০১-২০১২ ইং

স্থান : সৈয়দপুর (চরশাই), সদর, লক্ষ্মীপুর।

সময় : বিকাল ০৪ টা

সাধারণত পড়ন্ত বিকেলে শিশু কিশোররা এ খেলা খেলে থাকে। সন্ধ্যা বা জ্যোৎস্না রাতেও এ খেলা জমে ওঠে পল্লীর মাঠে ঘাটে। লক্ষ্মীপুর জেলার সর্বত্রই এ খেলার প্রচলন রয়েছে। শীত মৌসুমেই এ খেলা হয়ে থাকে। তবে গ্রীষ্মের রাতের বেলায়ও এ খেলা খেলতে দেখা যায়। পৌষ-মাঘ মাসে ভর দুপুরেও শিশু কিশোররা এ খেলা খেলে থাকে।

www.pathagar.com

খেলার পদ্ধতি ও প্রকারভেদ : লক্ষ্মীপুর জেলায় দুপ্রকার গোল্লাছুট খেলার প্রচলন রয়েছে। এগুলো হলো— ১. ছুড়া গোল্লা, ২. বুল্লিয়ালা গোল্লা খেলা।

ছুড়া গোল্লা খেলা

বুল্লিয়ালা গোল্লা খেলা

১. ছুড়া গোল্লায় দুদল থাকে। একদল ঘোরুয়া ডোল, আরেকদল বারুয়া ডোল। সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০ এরকম হয়ে থাকে উপস্থিত খেলোয়াড়দের সংখ্যানুযায়ী। যদি একজন বেশি হয় বা জোড় পাওয়া না যায়

www.pathagar.com

তাকে শান্ত রাখার জন্য সান্ত্বনা দেয়ার জন্য খেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার ইচ্ছানুযায়ী সে হয় বারুয়া ডোল বা ঘোরুয়া ডোল। পুরো খেলায় যে ঘোরুয়া বা বারুয়া খেলোয়াড় থাকে। ঘোরুয়া ডোলে একজন বউ থাকে। মন্ত্রি রাণির মতো সে বৃত্তের মধ্যে বা ঘরের মধ্যে অবস্থান করে। ঘরের থেকে খানিকটা দূরে ক্ষেতের আইল হল নির্দিষ্ট স্থান যেখানে বারুয়া ডোল সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে বা তার কাছাকাছি অবস্থান নেয়। নিজেদের খেলোয়াড়দের মধ্যে শলাপরামর্শ শেষ করে।

উভয়ে মানসিক প্রস্তুতি নেয়। এরপর ঘোরুয়া ডোল জিজ্ঞেস করে 'রেডি নি'। বারুয়া ডোল 'রেডি' বললেই শুরু হয় ছোটাছুটি। বৃত্তের ছাবুরা ছুটতে থাকে আইল ছোঁয়ার জন্য। আর বারুয়া ডোল তাদের ছুঁতে চেষ্টা করে। আইল ছোঁয়ার আগে বারুয়া ডোল তাদের ছুঁতে চেষ্টা করে। আইল ছোঁয়ার আগে বারুয়া ডোল যাকে ছোঁবে সে বেড হয়ে যাবে। আর দৌড়ে বা ছুটে আইল ছুঁতে পারলে সে পার পেয়ে গেল। যারা আইল ছোঁতে পারল তারা ঘর হতে একলাপে যদ্দুর যেতে পারে তদ্দুর দলের অগ্রগতি। এভাবে সবাই আউট বা বেড হওয়া পর্যন্ত যত ছাবু, যতবার আইল ছোঁবে ততদূর জনপ্রতি একলাফ এগোবে। এভাবে লাফ দিয়ে আইল ছোঁয়া পর্যন্ত এক গাইচ। সব কয়জন খেলোয়াড় বেড হওয়া পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকবে। সব খেলোয়াড় বেড হলে বারুয়া ডোল, ঘোরুয়া ডোলে পরিণত হবে ও পূর্ববৎ খেলা চলতে থাকে। এরই মধ্যে 'বউ'র ভূমিকা অনন্য। সে যদি কোনও ফাঁকে বেড না হয়ে আইল ছুঁতে পারে তবে কিস্তিমাৎ ঘোরুয়া ডোলের গাইছ হয়ে যাবে এ জন্য বারুয়াডোলের সেরা ও চৌকস খেলোয়াড়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে 'বউয়ের' উপর। বউকে পাহারা দেয়ার জন্য একাধিক খেলোয়াড় নিযুক্ত থাকে ও নজরদারি করে। বউ সর্বদা সতর্ক থাকে কোনও এক ফাঁকে ছুটে গিয়ে গাইছ দেওয়ার জন্য। যদি বউ বেড হয় তা হলে সবাই পরাজিত। সকল খেলোয়াড় আইল ছুঁলেও লাভ হবে না। আবার ঘর থেকে খেলোয়াড় বেড হয়ে পড়লে বা বউ ঘরের বাইরে ছুঁতে পারলেই সে বেড হয়ে যায়। আবার দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বারুয়া ডোলের কাউকে ছুঁতে পারলে সেও বেড হয়। এ পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত সে বেড থাকে।

www.pathagar.com

মজার দিক : এ খেলায় অন্যতম মজার দিক হলো। ঘোরুয়া ডোলের যে বা যারা চৌকস খেলোয়াড় তারা ছুটে। ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ির মাঝে মাঝে গোত্তা দিয়ে বাঁক পরিবর্তন করে আইল ছোঁয়। ছুটাছুটির সময় হঠাৎ গোত্তা দিলে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা পড়ে যায় বা দিক ভ্রান্ত হয়ে পড়ে এরই ফাঁকে উক্ত খেলোয়াড় ফাঁকা জায়গা বা সুবিধা মতো কম ঝুঁকিপূর্ণ দিক দিয়ে দৌঁড়ে আইল ছুঁয়ে ফেলে।

খেলার আগে খোঁট করা হয় যাতে একই দল ভালো খেলোয়াড়েরা না পড়ে সেজন্য অষ্টে-নিষ্টে ভাগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঘোরুয়া একজন খেলোয়াড় আর বারুয়া একজন সামন দক্ষ ও সামর্থ্যবান খেলোয়াড় খোঁট হয়। এভাবে সমান সামর্থ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন জোড়া মিলিয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে খেলোয়াড় নির্বাচন হয়।

খেলা শুরুর প্রাথমিক পর্যায় : ঘোরুয়া ছাবুরা বউয়ের হাত ধরে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত ধরে লতা, কড়া, শিকল তৈরি করে ঘরের চারদিকে বার কয়েক ঘুরে ও কে কোন দিকে ছুবে তার সুযোগ তৈরি করে। লতা হতে ছুটলে বিপক্ষ তাদেরকে বেড করার চেষ্টা করে, লতা বা শিকল না ছিড়লে বিপক্ষ ছাবু বেড হয়ে যায় যাকে ঐ শিকল বা লতা ছুঁবে।

২. বুল্লিয়ালা গোল্লা : এতেও দুদল থেকে। ঘোরুয়া ডোল বা বারুয়া ডোল। একজন বিজোড় হলে ঘোরুয়া বা বারুয়া ডোল থাকে। এতেও ঘোরয়া ডোলে একজন বউ থাকে। গাইছ বা গেম হয় পূর্ববৎ আইল ছুঁলে। এক্ষেত্রে বউয়ের ভূমিকা ছুডাগোল্লার মতোই। বুলিবা বুলিয়ালা গোল্লার বৈশিষ্ট্য হলো, ঘোরুয়া ডোলের ছাবুরা খেলোয়াড় একজন বুল্লি দিয়ে বারুয়া ডোলকে তাড়াবে ও দৌঁড়াবে, বুলি মুখে বিপক্ষের যাকে ছোঁবে সে বেড হয়ে যায়। বুল্লিওয়ালার ছত্র ছায়ায় অন্য ছাবুরা আইল ছুঁতে চেষ্টা করে। আইল ছোঁয়ার পূর্বে বেড হলে সে এ পর্বে আর খেলতে পারবে না। বুল্লিয়ালা বিপক্ষকে তাড়া করতে যেয়ে অধিক দূরত্বে ঘরে পৌঁছার আগে বুল্লিপড়ে গেলে বা ছেড়ে দিলে বিপক্ষ তাকে ঘরে ফেরার আগে ছুঁতে পারলে সে বেড হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও যারা ঘোরুয়া টিকে থাকে ও বারুয়া টিকে থাকে তারা খেলতে থাকে। ঘোরুয়া ছাবু একলাফ করে এগোয় আইলের দিকে। 'ঘর' ও তদনুপাতে এগিয়ে যায়। ২ প্রকারেই এ পদ্ধতি প্রচলিত। আইল ছোঁলেই গাইছ বা গেম। অঞ্চল বিশেষে খেলার ধরনের কিছুটা হের-ফের হয়। পদ্ধতিরও হের-ফের লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

ঞ. মাছ মাছ খেলা

প্রথমে যতগুণ হোলাহাইন আছে সাম ভাগ করি। মূল দুজন সাম দুই দল করি। তারপর দুজন দুজন করি নাম ঠিক করি। যেমন দুজন আঁই কয়, ডাক ডাক বেলী, মূল সামেরা কয় আমরা সবাই খেলি। আমরা আঙ্গো নাম কই, যেমন ধরেন আঁর নাম পাতা, আর ইগ্গার নাম ফুল। তই কই ফুল নিবেন না পাতা নিবেন। যে সামে কয় ফুল ইগ্গা হে দলে, আর পাতা কইলে আঁই হেতার দলে যামু।

এভাবে সাম ভাগ হই গেলে তারপর খেলা শুরু হয়। তারপর একদলের ওগ্গা চোখ বন্ধ করে, অন্য দলের ওগ্গা টোঁয়া মারে। জিগ্গার চোখ বন্ধ হিগ্গা যদি কইত হারে কে টোঁয়া মাইছে তাইলে হেতে হেতার ঘরের তন এক লাফ দি টক্কা দি দাগ দি থুইব। এভাবে খেলা চইলতে থায়। এভাবে যেতারা এ ঘরের ৩ লাফ দিই অন্য ঘরের সীমানা পর্যন্ত যাইতো হাইল্যে হেতারা জিতছে।

ট. মাংস চুরি

দুদল থাকবে, একদল অপর পাশে রাখা মাংসের টুকরা (ইটের টুকরা বা অন্য কিছু) চুরি করে আনবে অন্য দল পাহারা দিবে। প্রথম দলের একজন দম নিয়ে বোল নিয়ে মাংসের টুকরা আনতে যাবে বোল থাকা অবস্থায় অপর দলের কাউকে ছুঁতে পারলে সে আর খেলতে পারবে না। এভাবে বোল দিতে দিতে মাংস চুরির চেষ্টা চালাবে অন্য পক্ষ বাঁধা দিবে। যে বোল দিবে সে মাংস হাতে নিলে অপর পক্ষের কেউ ছুঁতে পারলে সে আর খেলতে পারবে না। ওর দম শেষ হয়ে গেলেও যদি ছোঁয়া যায় সে আর খেলতে পারবে না। এই প্রক্রিয়ায় মাংস চুরি করা গেলে তারা জিতবে।

ঠ. আকাশের তিন তারা

রামগঞ্জ : ফকির বাড়ি, মধ্য ভাদুর, নাম : সাগর, বয়স : ১০ বছর, করিমন, বয়স : ৯, পাখি : বয়স : ৮, আরো অনেকে।

www.pathagar.com

পদ্ধতি দুজনে হাত ধরে বসে থাকে। অন্যরা বুলি দিয়ে লাফ দিয়ে হাতের উপর দি চলে যায়। বুলি- আকাশের তিন তারা, তিন চাইর বরফ খেলা। আমার নাম আনোয়ারা আমি কিজানি, ঠাণ্ডা লেবুর পানি, আলু কি চপ চপ মেন্দি বাটা থপ থপ, লেংরার ভাই টেংরা থুক্কু দিলে ১ ক্বান। মাগো মাগো হিয়া ছোট দাদুর বিয়া ছোট দাদুর লম্বা চুল আশে পাশে গোলাপ ফুল, গোলাপ ফুলের গন্ধে বর আনে আনন্দে বরেরা সাত ভাই মিষ্টি আইনতো মন নাই।

ড. মালাছাড়ি

তারিখ : ২৯-০১-২০১২ ইং
পূর্ব সৈয়দপুর (চরশাই)
সদর, লক্ষ্মীপুর
সময় : বিকেল পড়ন্ত

শিশুতোষ অনেকগুলো জনপ্রিয় খেলায় 'মালাছাড়ি' অন্যতম খেলা। খুব ছোট্ট শিশুরা সাধারণত বাড়ির উঠোনে, ঘরের আঙ্গিনায়, বাড়ির দরজায় এ খেলা খেলে থাকে। খেলার উপাদান এক বা একাধিক নারিকেলের মালা, মাটিয়া বাটি, ঘটি, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কলস, হানক ইত্যকার ভাঙ্গা টুকরা-চাঁড়া-উপকরণ খেজুরের ছোঁর (ঝরে পড়া), সুপারির ক্বরা (গাছ থেকে ঝড়ে পড়া), নানাহ ঝরে পড়া ফলের ক্বরা, তৃণাদির মূল, শিকড়, ফুল, ফল, পাতা দিয়ে যা দিয়ে তৈরি খেলনা সামগ্রী তৈরি বা রান্না করে যেমন, পোলাউ, মাংস, মাছ, ডিম, তরকারি, পিঠাপুলি শিরনি ইত্যকার খাদ্য সামগ্রী। উপাদানের আকৃতিকে খাদ্য সামগ্রীর নমুনা কল্পনা করে পরিবেশন করা হয়। মাটির ছোট খেলনা চুলা বানিয়ে মাটিয়া পাতিল বা হাঁড়ি বসিয়ে খড় কুটা যোগাড় করে কাল্পনিক আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা হয়। তারপর সবাই খেতে বসে নানা ছড়া-শ্লোক আউড়ে মজা মজা করে খাওয়ার অভিনয় করে।

একটি ছড়ার নমুনা : 'গাইয়ুম, গুয়ুম ছৈদ্দানা, হুতের বোরে ভাত দেয় না।' 'আঁই আইনছি খুঁজি, তোরে দিয়াম কি বুঝি।' ইত্যাদি।

রূপান্তর :

আজ হঠাৎ চোখে পড়ল কয়েকটি শিশু 'মালাছাড়ি' খেলছে ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্ন কায়দায়।

পদ্ধতি : শারমিন একটা খেলনা হোন্ডায় বসে বসে মোবাইলে অভিনয় করে সাথীদের জানাচ্ছে সে তাদের জন্য কি কি জিনিস আনতে হবে। তার সাথীরা ৪-৫ জন শিশু অদূরে বাগানে মালাছাঁড়ি নিয়ে বসে আছে ও বাগান থেকে বিভিন্ন উপাদান (ভাত-তরকারি রান্না) সংগ্রহ করছে। আর ওখান থেকে শারমিন ফরমায়েশ দিচ্ছে বাজার থেকে কি কি জিনিস আনতে হবে। সে মোবাইলে তাদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করছে অভিনয়ের মাধ্যমে। এক সময় হোন্ডায় করে লতা, পাতার বিভিন্ন উপাদান এনে সাথীদের দেয় এবং রান্না-বান্না কাজে লেগে যায়।

www.pathagar.com

ঢ. লাটিম

নাম : রুদ্রদাস, পিতা : সুভাষ চন্দ্র দাস, মা : শুক্লা রাণি দাস। কুরি বাড়ি। সেকপুরা-রামগঞ্জ, বয়স : ৮ বছর, একই বয়সের তিন কিশোর উঠানে বিকেলে লাটিম খেলায় মনের আনন্দে। এ খেলা তারা প্রায়ই খেলে থাকে। এ ছাড়া মার্বেল, কুৎকুৎ খেলে থাকে।

লাটিম খেলার দৃশ্য

ণ. লতালতা খেলা

নাম : শান্তা, ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী। শারমীন-৪র্থ শ্রেণি। নদী : ৫ম শ্রেণি। কল্যাণপুর প্রাইমারী স্কুল, স্থান : কল্যাণপুর, লক্ষীপুর।

খেলার বোল :

একে- ইঁদুর	সাতে- সাতী
দুইয়ে- গুলগুল	৮এ- আংটি
তিনে- তেতুল	৯এ- নদী
৪এ- ৪ ফুল	১০এ-দধি
৫এ- পেঁচা	
ছয়ে- ছেঁছা	

বর্ণনা : লতালতা খেলায় দুপক্ষ থাকে। একপক্ষ ঘরে আরেক পক্ষ বাইরে থাকে। ঘরের পক্ষে কেন্দ্র এ থাকে রাজা। একটা ছোট্ট বৃত্তের মধ্যে রাজা অবস্থান করে। তার হাতে হাত কড়া ধরে তার দলের খেলোয়াড় বা চাবুরা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে ছুঁতে পারলে তার মউত হয়। রাজা যদি ছুটে চলে তার সুযোগ মতো বিপক্ষ তাকে ছুয়ে; ফেললে যেখানে ছোঁয় সে থেকে রাজা তিন টক্কা দিয়ে যদি ঘর ছুঁতে পারে তাহলে তাদের এক গাইছ হয়। পুনঃ খেলা শুরু হয়। রাজা তিন লাফে

www.pathagar.com

ঘর ছোঁতে না পারলে রাজার মউত হয় ও তারা বাইরে চলে যায়। পালাক্রমে এ খেলা চলতে থাকে। অনির্ধারিত সংখ্যক খেলোয়াড়। বাড়িতে বিকাল বেলায় তারা এ খেলা খেলে থাকে বলে জানায়।

ত. সাপের খেলা

জেলার বিভিন্ন স্থানে সাপ খেলা যারা দেখায় তারা মূলত জীবিকার সন্ধানে এ কাজ করে। সাপ খেলা হলো বাক্স থেকে বিভিন্ন জাতের সাপ একটা একটা করে বাহির করে। একটা একটার খেলা দেখায়। কোনো জনসমাগম স্থানে বাক্সগুলো নিয়ে বসে। তারপর লখাইর গানের সুরে সাপ বাহির করলে মানুষ সাপ দেখতে ভিড় করে। সবাইকে বসায়ে দিয়ে সাপের হিংস্রতা সাপের গুন ও কাজের বর্ণনা দেয় এবং সাপ নিয়ে খেলা করে। এক সময় বেশি লোক হলে কথার জাদু দিয়ে সাপে কাটার, বাতের ও পেশাবের তাবিজ বিক্রি করে।

লক্ষ্মীপুর জেলায় বেদে সম্প্রদায়ের লোক এখনও আছে। তবে তারা এখন এ কাজে আর নেই। এক সময় শহরে একটি পরিবার ছিল মুন্সিগঞ্জ থেকে এসেছে। 'পঁচার মার পরিবার'। এরা গোডাউন রোডে স্থায়ীভাবে প্রায় ৬০-৭০ বছর থেকে বসবাস করছে। এদের পরিবারে এখন পেশা পরিবর্তন হয়ে গেছে। অনেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে উন্নত জীবনযাপন করছে।

বর্তমানে যারা সাপ খেলা দেখায় তারা অন্য জেলা থেকে এসে এখানে বসবাস করছে। কখনও ৬ মাস থেকে ১ বছর কখনও ২-৩ বছর । রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত জমিতে ছোট নৌকার ছইয়ের মতো করে ঘর বানায়। এদের পুরুষরা সাপ খেলা দেখানোর পাশাপাশি তাবিজ বিক্রি করে। মহিলা দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সিঙ্গা দেয় ও তাবিজ বিক্রি করে।

সাপের খেলা দেখাচ্ছেন মো. সবুল্লা

www.pathagar.com

শহরের মটকা মসজিদের পাশে খালি জায়গায় ৯ পরিবার নিয়ে ঘর করে থাকেন। মূলবাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলায়। পরে বাবা-মাসহ মানিক ছড়ির পাহাড়ে স্থায়ী ঠিকানা গড়ে। লক্ষ্মীপুর শহরে আসার আগে কমলনগর উপজেলার হাজির হাটে ছিল প্রায় এক বছর। আমার সাপ আছে ৫টি। আমার বাবা আমার ওস্তাদ। বাবা সাপ ধরতেন। আমি সাপ ধরতে পারি না। সাথে সারগেদ জহির (১৬) থাকে। দৈনিক আয় করি ৩ থেকে ৪ শ টাকা। আমাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে হয়। মামাতো বোন বিয়ে করি। স্ত্রী সাপ খেলা দেখায়। বাবা-মাসহ পরিবারে ৮ জন এ কাজ করে। বাপ সাপ ধরতে ৫ শত থেকে এক হাজার টাকা নেয়। মহিলারা টাকা ছাড়াও চাল-তরু-তরকারি নেয়। বাবা ছাড়াও মামা ও বড় ভাই সাপ ধরে। সাপ বিক্রিতে ৩ শ থেকে ৬ শ টাকা প্রাপ্তি হয়।

এ পেশা ভালো লাগে না। কষ্ট অনুযায়ী টাকা পাই না। সামনে অন্য সুযোগ পাইলে এ ব্যবসা ছেড়ে দিব। এ ব্যবসায় শান্তি নাই, সুখ নাই, সব জায়গায় কিছু লোক বাঁধা দেয়। কাজ করতে বাধা, মেয়েছেলে নিয়ে থাকতে বাঁধা, সাপ ধরতে বাঁধা, চলতে বাঁধা, এভাবে চলা যায় না। বড় ছেলে ১০ বছর বয়স। মাদ্রাসায় ভর্তি করাইছি। ছোট ছেলে স্কুলে যায়, ক্লাস ওয়ানে আছে।

থ. লোকখেলা

তারিখ : ১৪-০৬-২০১২ ইং
সময় : রাত : ১০টা
স্থান : তোরাব গঞ্জ, কমল নগর

তথ্যদাতা

নাম : কামাল উদ্দিন বাহার। পিতা : প্রয়াত ফজলুর রহমান মিয়া। সাং তোরাবগঞ্জ ডাকঘর তোরাব গঞ্জ, ফজলু চেয়ারম্যানের বাড়ি । উপজেলা : কমলনগর, জেলা লক্ষ্মীপুর।

বয়স : ৪০ বছর। শিক্ষা এম.এ বিপি এড। পেশা : ক্রীড়া শিক্ষক, তোরাব গঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, কমলনগর। উপজেলার সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

(ছ) মিলিং-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা: কমল নগর উপজেলা বছর দশেক পূর্বেও রামগতি উপজেলা ছিল। রামগতিকে দ্বিখণ্ডিত করে কমলগনর উপজেলার সৃষ্টি। এ উপজেলা লোক বা গ্রাম্য খেলার লীলাক্ষেত্র ছিল। মেঘনার পাড়ে (পূর্ব পাড়) বিশাল চরাঞ্চল নিয়ে এ উপজেলার অবস্থান। এখানকার কর্মজীবী মানুষ এবং শিশু-কিশোরেরা আমোদপ্রিয়। কর্মজীবনের পাশাপাশি এখানকার মানুষ, শিশু কিশোরেরা অবসর বিনোদনের জন্য নানা রকম খেলাধুলা করে থাকত। সভ্যতার বিকাশের কারণে মানুষ এখন কর্মব্যস্ত ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা দিকে ঝুঁকে পড়েছে। শিশু কিশোরেরা সারাদিন কোনো না কোনো খেলায় মত্ত থাকত। যুবক বয়স্করাও অনেক খেলা খেলে থাকত। অনেক খেলাই বিলুপ্ত হয় গেছে। অনেকগুলো বিলুপ্তির পথে।

www.pathagar.com

এখানে যে, খেলাগুলো সচরাচর দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হা-ডু-ডু। এ খেলা দিনের বেলায় বিশেষত বিকেলে হয়ে থাকে। শিশুরা বাড়ির উঠানে, পাশে গেঁয়ো, রাস্তায় খেলোয়াড়রা স্কুল মাঠে বাজারের উন্মুক্ত জায়গায় বড় রাস্তার মোড়ে খেলে। এর মৌসুম বর্ষাকাল।

শিশুতোষ খেলা : এখনো খেলা হয়, মারবেল, লাঠিম, চাড়াবাজি প্রায় প্রতি বাড়িতে। এরপর কানামাছি চোঁখ বাঁধা চোরডাকাত, চারগুটি ষোলগুটি (শীতকাল-বর্ষাকাল)

বিলুপ্ত : গোল্লা, চোরডাঙ্গা (ডাঙ্গুলী, রেডিখেলা (দাঁড়িয়াবান্ধা)

তথ্যসংগ্রহের সময় সরেজমিনে পাওয়া গেল মারবেল, চার গুটিপেছী। স্থান: চরমাটিন, কমল মাকেট, ছোট বাজারের এক পাশে একটু খোলা জায়গায়। পাঁছ, ছয়টি শিশু আপন মনে খেলে চলেছে পড়ন্ত বিকালে ১৬-০৬-২০১২ ইং। ছবি ও ভিডিও ধারণ।

চারগুটি : স্থান তোরাবগঞ্জ হাইস্কুল সংলগ্ন সাইক্লোন সেন্টার ৪ থেকে ৫ জন শিশু চারগুটি খেলছে। উপকরণ : খেজুরের দানা (বিছি) ছোট খেজুরের বিছির মাঝখান দিয়ে কেটে ৪টা গুটি তৈরি হয়। খেলায় উভয় পিঠ প্রয়োজন হয়। খেলোয়াড় (২-৪ জন) ছবি ভিডিও ধারণকৃত। তারিখ ১৭-০৬-২০১২ইং স্থান (তোরাবগঞ্জ)।

খাদ্যাপচি : তোরাবগঞ্জে বাজারের সামান্য পূর্ব পাশে রাস্তায়। খেলছে দুই কিশোর।

কাঁচা রাস্তা। উপকরণ : সামান্য ফাঁক রেখে দুপাশে পাঁচটা করে দশটা খাদ বা গর্ত সমান দূরত্ব। কাঁচা মাটির জায়গা প্রয়োজনে যে খাদ খোদা যায়। প্রতি খাদ বা গর্তের জন্য পাঁচটা করে খেজুর বা খেজুরের বিচি। মোট ৫০টা গুটি লাগে।

খেলোয়াড় থাকে দুজন অন্যরা দর্শক। খেলার, মৌসুম বর্ষাকাল। তবে অন্য ঋতুতেও সখের বশে খেলে যদি মূল উপাদান না থাকে ছোট ছোট চাঁড়ার টুকরো দিয়ে খেলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

১. নৌশিল্প

এমন এক সময় ছিল সুদীর্ঘকালব্যাপী লক্ষ্মীপুরবাসীর সাথে নৌকা ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিগত শতাব্দির ষাটের দশক পর্যন্ত নৌকা ছিল এ জেলার মানুষের নিত্যদিনের অপরিহার্য সংগী। পুরো বর্ষাকালব্যাপী তথা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় থেকে শুরু করে মাঘ মাস পর্যন্ত যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন ছিল নৌকা। ব্যবসায় বাণিজ্য আমদানি রপ্তানির প্রধান বাহন বা যান বলতে নৌকাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। তারপর নৌকার সাথে বর্ষাকালে যোগ হতো তালের কোঁদা। প্রতিটি বাড়িতেই সব পরিবারের এক বা একাধিক তালের কোঁদা ছিল। অনেক বাড়িতে নৌকা রাখা হতো এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম হাট-বাজারে যাতায়াতের জন্য একমাত্র পথ ও যান ছিল এ তালের কোঁদা ও নৌকা। বর্ষার ক্ষেত থেকে ধান কেটে আনার জন্য তালের কোঁদা ছিল অনস্বীকার্য। বর্ষায় ক্ষেত থেকে ধান কেটে পাট কেটে তা নৌকায় করে গন্তব্যে আনা হতো। তারপর ছিল নাইওরী নাও, পাটের নাও যা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষকের পাট গ্রামের হাটে-গঞ্জে নেয়া হতো বিক্রির জন্য। ছিল বালাম নাও যাতে ধান পাট, সুপারি পান আমদানি রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত হতো। এ জেলার তৈরি বালাম নায়ে করে (ধান বিক্রির উদ্দেশ্যে) আনা হতো বরিশাল, ভোলা, হাতিয়া ও সন্দীপ হতে। পানও আনা হতো বরিশাল, চাঁদপুর হতে। সে বালাম নায়ের উল্লেখযোগ্য মাঝি মাল্লারা অনেকেই জীবিত আছে। জীবিত আছে অনেক নৌশিল্পী যারা মনের মানুষ পেলে গল্প করে।

নৌশিল্পী আবুল খায়ের

www.pathagar.com

নৌকা তৈরি করছেন নৌশিল্পীরা

নৌশিল্পীরা নৌকা তৈরি করছেন

www.pathagar.com

তালের কোঁদা : জীবিত অথবা মৃত তাল গাছ কেটে তালের কোঁদা তৈরি করা হয়ে থাকে। একটি কোঁদা ৫ থেকে ৬ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। প্রতিটি তালের কোঁদা তৈরি করতে ২ থেকে ৩ রোজ লাগে।

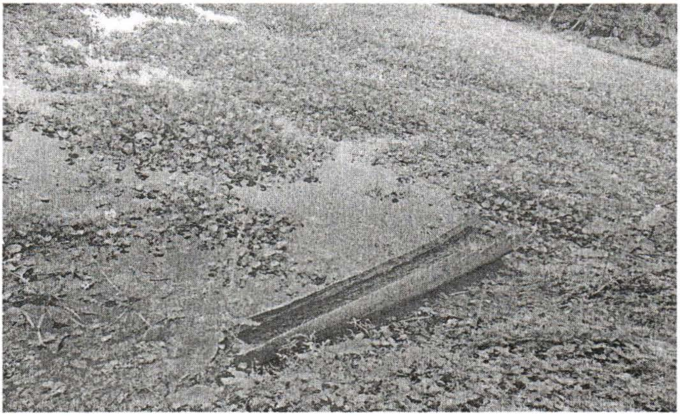

পরিত্যাক্ত তালের কোঁদা

লক্ষ্মীপুর সদরের শহর-কসবা, দাসের হাট, ভবানীগঞ্জ, নৌ-বন্দরে পাকিস্তানি আমলেও খ্যাতিমান ছিল। তৎকালীন মিস্ত্রি, মাঝি, পঞ্চাশোর্ধ প্রতিটি মানুষের এসব নৌকায় চড়া, দেখার ব্যবহারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে এ জেলাবাসীর। প্রতিটি গ্রামেই নৌকা নির্মাণের মিস্ত্রি বর্তমান ছিল। এসব নায়ের প্রধান উপকরণ গাছ পাওয়া যেত প্রতিটি বাড়িতে। কাঁদা তৈরি হতো গোটা তাল গাছ কেটে মাঝখানে কুঁদে এক সময় গোটা গাছের গোড়া ও অন্য মাথায় ভরাট যাতে তৈরিতে মুন্সিয়ানার কাজ ছিল। মুন্সিয়ানা ছিল নাইওরীর নাও তৈরিতে, কেরায়া নাও তৈরিতে, কোষা নাও তৈরিতে ও চান্দি নাও নদীতে ইলিশ ধরার জন্য, তালের কোঁদা অনেক সময় নারকেল গাছ কেটে করা হতো। নৌকা তৈরির জন্য প্রধানত ব্যবহৃত হতো।

১. উরিয়া গাছ, ২. জাম গাছ, ৩. সাদাকড়ই, ৪. রয়না গাছ, ৫. বল্লা গাছ, ৬. হিজল গাছ, ৭. বাধি গাছ।

বর্তমান : বর্তমানে নদী অধ্যুষিত অঞ্চলে রামগতি, কমলনগর, সদর, রায়পুর নৌশিল্পের অন্যতম পীঠস্থান।

তথ্যমতে, রামগতিতে নৌঘাট রয়েছে ১৫টি, কমলনগর ৬টি, সদরে ৩টি, রায়পুরে ৪টি। (৩০-৩৫টি নৌঘাটে নৌকা রয়েছে আনুমানিক প্রায় ৮০,০০০ হাজারের মতো। গড়ে প্রতি নৌকায় ১০ জন করে হলেও ৮০০০ পূরণ ১০= ৮০০,০০/-৮ লাখের মতো জেলে মাঝি প্রধান জীবিকা নির্ভর করে এ নৌশিল্পের উপর। তার সাথে রয়েছে নৌশিল্পী, মালিক, মৎস্য ব্যবসায়ী ও কাঠ গাছ ব্যবসায়ী 'স' মিলসহ সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী। দৈনিক ব্যয় ২৫০ থেকে ২০০ টাকা।

www.pathagar.com

বড় বড় নৌকা তৈরির দৃশ্য

জেলেপল্লী

এদের জীবন মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের চিত্রের সাথে কিছুটা মিল থাকলেও বৈসাদৃশ্য আকাশ-পাতাল। নদী-সমুদ্রের সংস্কৃতির সাথে এরা নিয়তই পরিচিত, অভ্যস্ত, উদ্বাস্তু। নদীর ভাঙা-গড়ার মতোই এদের ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান, জীবিকা-জীবন। এক কথায় বৈরী ও বিরূপ পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে এরা বেঁচে থাকে। বানের পানিতে নিয়তই ডুবে, ভাসে, ভেসে যায়, নিরুদ্দেশ হয়। মতির হাট বাজার থেকে দুতিন কিলোমিটার দূরে প্রমত্তা বিস্তীর্ণ মেঘনার বুকে জেগে উঠেছে কয়েক বর্গমাইলব্যাপী বিশাল চর। যার ফলে পূর্বপাড়ের দিকে ভাঙন ও নদী অগ্রসর হওয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।

জেলেরদের মাছ ধরার দৃশ্য

চৈত্র-বৈশাখে ইলিশের নৌকা তৈরি ও মেরামতের মৌসুম। নৌকা তৈরির দক্ষ কারিগর রয়েছে এখানে, যারা নদীতে ইলিশও ধরে। নৌকা বানানোর কাঠ নির্দিষ্ট গাছের হয়ে থাকে। নৌকা গড়নের সময় এরা মানত করে, মিলাদ পড়ায় ও নানা আচার-অনুষ্ঠান করে থাকে। নৌকা তৈরি হয়ে গেলে নদীতে ভাসানোর সময় পড়শিদেরকে দাওয়াত করে খাওয়া-দাওয়া করায়, মিলাদ পড়ায়, খতম পড়ায়, মানত দেয়-দায়রা, আস্তানা, মসজিদে। হুজুর ডেকে বিশেষ মোনাজাত করে ও বড় খতমের দোয়াসহ নানা দোয়া-দরুদ পড়ে। হিন্দু জেলেরা তাদের ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী নানাবিধ আচার, পূজা দেয়, দেবতা, অপদেবতার নামে। নৌকা নদীতে ভাসানোর সময় পরিবারের সবাই নদীর তীরে বা ঘাটে যায়। আল্লাহ বা ঈশ্বরের হাতে স্বজনদের সঁপে দেয় ও দোয়া-দরূদ পড়ে, জিকির করে, হিন্দুরা পূজা দেয়, অর্চনা করে। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণি বলি বা মানত করে যাতে ভালয় ভালয় স্বজন মৌসুম শেষে জীবন নিয়ে ফিরে আসে। হিন্দুরা মনসার পূজা, মহাদেবের পূজা, কালিপূজা দেয়। ভর-মৌসুমে নদীতে বা সাগরে বা জনপদে ঝড়-তুফান উঠলে বাড়িতে জিকির করে, দোয়া-দরুদ পড়ে, মানত করে। হিন্দু জেলেরাও নানা উপাচার করে থাকে। ঝড়ের আধিক্য বাড়তে থাকলে বড় খতমের দোয়া পড়ে, বাড়ির উঠানে বা দরজায় আজান দেয়, হিন্দুরা উলুধ্বনি দেয় ও অপদেবতাকে অভিসম্পাত করে। কালী-মনসার কৃপা কামনা করে। শিলের আধিক্য হলে উঠানে ঘরের ব্যবহৃত পিঁড়ি, খুদ, কুঁড়া, চিটিয়ে দেয়। নদীতে হাডা-হুতা ফেলে দেয়, যাতে হিল পড়া বন্ধ হয়।

বেয়াল জালে মাছ ধরছেন জেলে

www.pathagar.com

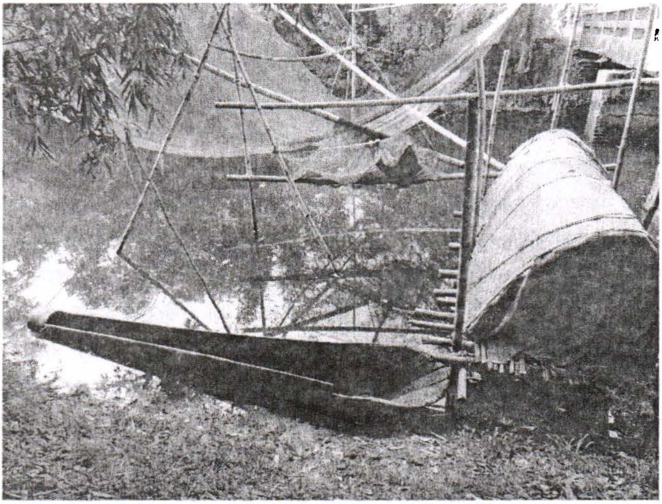

বেয়াল জালে মাছ ধরছেন জেলে

জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর, রামগতি, রায়পুর, রামগঞ্জ, এখনো অসংখ্য খাল, দাঁড়া, জালের মতো ছড়িয়ে আছে পুরো জেলা। আর এ সকল খাল, দাঁড়া ঝোরায় হাজার হাজার বেয়াল দিয়ে মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ ও নিজেদের মাছের সংস্থান করে চলেছে হাজার হাজার পরিবার। কি পরিমাণ বেয়াল বা বেয়াইল্লা রয়েছে জেলায়। এ নিয়ে আলাদা অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রয়োজন রয়েছে। এ বেয়ালের পরিসংখ্যান অত্যন্ত দুরূহ কাজ বৈকি! বর্ষাকালেই সাধারণত বেয়াল দিয়ে মাছ ধরা হয়ে থাকে। অপরাপর মৌসুমে যৎসামান্য চোখে পড়ে। বর্ষায় প্রতিটি অঞ্চল ও জনপদে বেয়াল পাতা হয় খাল, দাঁড়ায় প্রায় প্রতিটি গ্রামের সাথে যুক্ত ঐ সকল খাল, ঝোরা, দাঁড়া এখনো জেলাবাসীর মৎস্য চাহিদার অধিকাংশ পূরণ করে থাকে।

সফিক মাঝি (৬৫) : ১৬ বছর বয়স থেকে জেলে জীবন। বাবাও একই পেশায় ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর ৪ ভাইয়ের মধ্যে ছোট ছেলে। নিজে নিজে দাঁড়ের নৌকায়। বাবার ২টা দাঁড়ের নৌকায় ছিল। ভাই একজন এই কাজে ভোলায় অছে।। নাম নূর আমিন। সে ভোলায় বিয়ে করে। ভাইদের সাথে কাজে গেছে। পরে নিজে শিখেছে। আগে নিজে থেকে টাকা খরচ করেছি পরে দাদন নিই। মেশিন নষ্ট, জাল ডাকাতে নেয়ার কারণে, বানের কারণে লোকসান হয়। নদীতে ৬ মাস থাকতাম। মনপুরা পর্যন্ত যাইতাম (সাগরের মোহনায়) যতটুকু সাহসে কুলায়। মনপুরার গোয়াইল্যার চরে ঘাটে এসে রাত্রে চর পিয়লে থাকতাম। সাগরের মুখে কালকিনিতে (ভোলা চর ফ্যাশনে) থাকতাম। ৬-৭, ৮-১০ জনসহ থাকতাম। মো. সিদ্দিক, কামাল, জুয়েল, সাহেব আলী সঙ্গী ছিল। সবাই এই পেশায় নাই। মাইর খাওয়ার কারণে। করার কিছু নাই বলে এই পেশায় আছি। নৌকা, জাল আমাদের। কড সুতার চান্দি জাল। চার হুতার জাল। একতারির সুন্দর জাল। সাগরে গিয়ে বড় ইলিশ ধরতাম।

www.pathagar.com

রামগতি থেকে ৪/৫ ঘণ্টার দক্ষিণে যাইতাম নিজের নৌকা। বিয়ে করছি ২৬-২৭ বছর বয়সে। মহিলা জাল বানানোতে সাহায্য করে।

মাছ ধরার সময়

জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আশ্বিন মাস- ইলিশ মাছ । আশ্বিন থেকে চৈত্র– পোয়া মাছ, (হাইয়া মাছ) চুরকা (রিক্সা মাছ), গোংরা, (টেংরা)। চৈত্র থেকে বৈশাখ– বাইলা, চিরিং মাছ। ১ মাস মাছ ধরা বন্ধ। ঐ সময় নৌকা মালামত ও জাল সারাইতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে দাদন নিয়ে নেমে যাইতাম ।

যাত্রা– যাত্রার শুরুতে গাজীর নামে শিন্নি করি। ডাল, চাল, মাংস দিয়ে খিচুরী করি। প্রথম অংশ নদীতে গাজী কালুর নামে ছাড়ি দিই। বাকিটা নিজেরা ও অন্যদের মধ্যে বণ্টন হয়। নাম গাজির শিন্নি। মিলাদ হয়।

যাওয়ার সময় : নৌকায় বরফ, জাল, তেল (২০ গ্যালন) চাল, ডাল, হলুদ, মরিচ, চুলা পাতিল, লাড়কি, বিড়ি, জাল, সুতা, বাক্সে বরফ রাখা হয়। এক নৌকায় ৭-৮ জন যাই। টান পড়লে কিনা হয়। পায়খানা-পেশাব নদীতে সারা হয়। পানি নেওয়া হয়। ঠেকলে সাগরের পানি খাওয়া হয়। ফিটকারী নেওয়া হয়।

মাছ ধরার কৌশল : নদীতে জাল ফালাই, মেশেন যখন ছিল না। ইট ফালাই। (চাক্কা যা কুমারা বানায়) আরেক জনে পুলুট (বলের মত) ফালাই। চার জনে দাঁড় বায়। মাঝি বৈঠা ধরে। এক কিলো পরিমাণ জাল ফালাই। পশ্চিম পূর্বে ফালাই, মাঝখানে ফালাই। গভীরে বেশি ফালাই। বইয়া থাকি। যদি বাড়া (ভাটা) দিয়া ফালাই, জোয়ার আসার সাথে সাথে উঠায়। সাত আট মাইল জাল চলে যায় । জেলেরাও যায় জালের সাথে যায়। জোয়ারের সময় ফালাই জোয়ারে চার-ছয় মাইল জাল আসে। ইলিশ ধরতে মজা বেশি। বেশি পাওয়া যায় লাভ বেশি।

www.pathagar.com

বিক্রি : মজু চৌধুরীর হাটে। সাগরের মোহনা থেকে রামগতি বড় খেরী। সাহবাজপুর, কালকিনি, চর ফ্যাশন, সামরাজ গুলিচ, পাইকার এর কাছে ঘাটে বিক্রি হয়।

উৎসব- রায়পুর পুরান বেড়ি মাছ ঘাটে অনুষ্ঠান হয়। মহিষের দুধের পায়েস। ঘাট মালিকেরা করে।

করিম মাঝি (বয়স ৭৫-৮০)

যদি ঠেকে দায়–সে চড়ে নায় (নৌকায়)।

দুঃখ : কষ্টের জীবন। নদীতে তুফানে চরে গেরাফি (নোঙ্গর) ফালাইছি। খাওয়া ছাড়া থাকতে হয়েছে। জাল ফালাই। তুফানে ট্রলার নৌকার উপর উঠে, নৌকা ভেঙ্গে মাঝ নদীতে। মাছের ওঁরা ধরে, বাঁশ ধরে নদীতে ভাসি। অর্ধেক মানুষ রাত তিনটায় স্টিমার নিয়ে যায়। বাকি অর্ধেক সবাই ধরে থাকি। অন্য স্টিমার, নৌকা উটায় না। রাত পোহানোর পর একটি নৌকা আসি বাঁচায়। উলঙ্গ ছিলাম, ২ দিন উপবাস।

আনন্দ : নদীতে জাল ফেললে আল্লাহ কিসমতে রাখলে ২.৫০ কাউন পর্যন্ত মাছ পড়ে। ঐ সময় ঈদের চেয়ে আনন্দ। প্রতি ভাগে ১ হাজার, মালিক ১০ হাজার টাকাও প্রতিদিন পেয়েছে। জাল টানার সময় বলি, "আল্লাহ আমনে দেন, রিজিকের মালিক আল্লা আমনে"।

গান : কেউ আপন দুলাল, কেউ গুনাইর গান গায়, কেউ রূপবানের গান গায় :

১. মাঝি বেটার নাম জানি না রে আল্লা ডাক দেবে কারে রে
ওমোর আল্লা আল্লা রে।

২. জাইল্লার মাথায় জালের বোঝা আমার মাথায় খারি
দুই নয়ন চুকাইয়া পড়ে পচা মাছের পানি রে।
কি কাম শিখাইলি জাইল্লারে...
সাত ভাইয়ের বোন এইরে আমি নয় মামার ভাগ্নি
আউস কইরা নাম রাইখাছে বেলবা সুন্দরী রে
কি কাম শিখাইলা জাইল্লারে...
জাতে ছিলাম ব্রাহ্মণি করিতাম সেবা পূজা
জাইল্লার সাথে কইরা পিরিত কাটি জালের সুতারে,
কি কাম শিখাইলি জাইল্লারে...
(লোকমান মাল)

কেউ মোবাইলের গান শুনে, নদীর থেকে আসি মোবাইলে গান লোড করি। এখনকার জাইল্লারা মোবাইলে গান শুনে।

সিগনাল : মাইকে সিগনালের কথা শুনা যায়। ফোনে সিগনাল সম্পর্কে অন্য জেলেরা সতর্ক করে। রেড ক্রিসেন্ট সতর্ক করে।

যাত্রায় : তিন চারশ টাকার সদাই নিই। আগে পাঁচ সাত দিনের জন্য, আগে গেলেও আমার এখন যাওয়া হয় না।

www.pathagar.com

দাদন : ঘাটের মালিককে দাদন দেয়। বছরে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা দাদন নেয়া হয়। জাল ছিড়লে, ডাকাতি হলে জেলেদের যায়। মাছ বিক্রি করলে ৯০ ভাগ জেলেরা ১০ ভাগ দাদনদাতা পায়। কিন্তু দাদনের মূল টাকা শোধ হয় না। দাদন মালিকের কাছে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য জেলেরা। বড় মাছ দাদন মালিক রেখে দেয়। খাবারের জন্য বলে, কিন্তু পরে বিক্রি করে দেয়। ছোট মাছের বেলায় হলা (এক বাটি) নেয় দাদন মালিক এক খারি থেকে। এটা তাগো ট্যাক্সের বাহিরে। ১০% টাকায় ৫% এর ৩% সরকার।

জেলে পরিবার : চর রমণীতে ১১৫০ জেলে পরিবার চারটা মৌজায়। মধ্য চর রমনী, পশ্চিম চর রমনী (সাহেবের হাট), দক্ষিণ চর রমনী (বুড়ির ঘাট), চর আলী হাসান। জেলেদের ভূমি নাই, পরিমাণ প্রায় ৭০% উপরে থাকে। ৭০০-৭৫০ পরিবার হবে। বাকিরা ভাসমান। ভাসমান- ১৩০ পরিবার মজু চৌধুরীর হাট ঘাটে। ২০০ পরিবার বড় খেরী, রামগতি উপজেলায়। এদের বেবাইজ্যা বললে রাগ করে। সর্দার বলতে হয়। জেলে পরিবারগুলো ভোলার শাহবাজপুর, রামদাস পুর, কালিগঞ্জ, বঙ্গার চর থেকে এসেছে। নদী ভাঙ্গার কারণে, জীবিকার খোঁজে। মেহেন্দীগঞ্জ থেকেও এসেছে।

বিয়ে : বিয়ে সাদী আল্লার হুকুম। নিজেদের মধ্যে হয়, বাহিরেও হয়। ডেকোরেশন ভাড়া করে। যারা গরিব, নিজেদের পাতিলে রান্না হয়। মাইক চালানো হয়। শ্লোক দেয়া হয়। মেন্দী বাটতে হিন্দাইতে গান গাওয়া হয়। মেয়েদের বিয়ে হলে নৌকা উপহার দেয়া হয়।

www.pathagar.com

শ্লোক : ১। আউয়ালোচি এমন খরাইত্তার লগে ইস্টি কইরাছি।

২। আসসালামুলাইকুম এন...

নৌকার সংখ্যা : ছোট বড় ৭০০-৮০০টি।

নৌকার নাম : দাড়ের নৌকা (ছোট), মেশিনের নৌকা, হলি নৌকা (বড়), ডিঙি নৌকা (ছোট), কোষা নৌকা, আনি নৌকা। ছোট নৌকা বেশি, বড়গুলি দূরে যায়।

সাবাড় : জাল-নৌকাসহ মিলাইয়া সাবার। সেট মিলিয়ে সাবার হয়।

ভাণ্ডারী গান : ৮-১০ পর্যন্ত বাড়ি মিলাইয়া হয়। শীতের সময় সাহেবের চর। নূরা মেস্ত্ররীর বাড়ি । সারা রাত মাইক বাজে, রাত তিন-চার টার সময় শেষ হয়। শিন্নি খাওয়ানো হয়। ভাণ্ডারী গানের আয়োজন করে রহিম, বাদশা, কালু। হানিফ বয়াতি গান করে।

গফুর পাগলার মাঝার : চর আলী হাসান দরবার শরিফে চর আলী হাসান, চর রমণী, চর ভৈরবী, হাইমচর, চর বংশী, বালামচর, শরিয়তপুর থেকে নৌকা সাজিয়ে মানুষ আসে । মহিলা আসে। মাঘ মাসে আসে। মানত করে আসে। গরু ছাগল নিয়ে আসে। সবাই কাজ করে। ৩ দিনব্যাপী ওরস। মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়, সারারাত ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম নিয়ে গান হয়, মাইজভাণ্ডারী গান। ঝিকিরের তালে তালে নাচে। গতবার ব্যান্ডদল গাইছে।

৩. খেঁজুরের রস ও গাছি

এ অঞ্চলে প্রচুর খেজুর গাছ আছে। শীতের মৌসুমে খেজুরের রস হয়। যারা খেজুর গাছ কেটে রস বের করে তাদের বলা হয় গাছি।

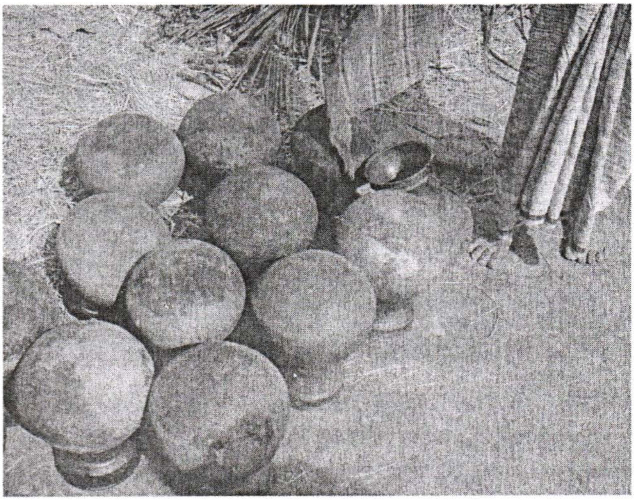

খেজুরের রসের হাড়ি

খেজুর গাছ কাটছে আবু তাহের গাছি বর্গী গাছি

হাট-বাজারের ভূমিকা : অনেক গাছি এ খেজুরের রস ও গুড় দূরে নিকটবর্তী বাজারে রস সকাল বেলা, গুড় বাজার বার বিকেলে নিয়ে বিক্রি করে। ভবানীগঞ্জ বাজার, তেয়ারীগঞ্জ বাজার, লক্ষ্মীপুর শহরসহ অনেক বাজারে এ অঞ্চলের খেঁজুরের রস ও গুড় বিক্রি হয়। রস ও গুড় বিক্রির ক্ষেত্রে বাজার বিশেষ ভূমিকা রাখে।

লক্ষ্মীপুরের অনেক বাড়িতে খেজুরের রস দিয়ে গুড় বানানো হয় যার আঞ্চলিক নাম : খাজুরের খাঁড় বা রাব।

জেলার গ্রাম, গঞ্জ, হাট-বাজার, শহরে শীত মৌসুমে এ গুড় পাওয়া যায়। বাজারের দিন ব্যবসায়িরা সারিবদ্ধভাবে বসে এ গুড় বিক্রি করে যা দিয়ে নানান পিঠাপুলি তৈরি হয় জেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক অঙ্গ এ খেজুরের রস। এ রস ও গুড় নিয়ে অসংখ্য প্রবাদ প্রবচন, লোক কাহিনী, স্মৃতিজাগানিয়া ঘটনাবলী ও কাহিনি জেলার লোক কথাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমান শীতের মৌসুমে এ গুড় অত্যন্ত আদরণীয় পণ্য।

ব্যবহার : বিভিন্ন ধরনের পিঠাপুলি তৈরি, শিরনি, বাতাসা ও সাদামুড়ি বা কড়ুই দিয়ে, দুধের সাথে ভাতে এ গুড় খাওয়া বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক।

www.pathagar.com

তৈরির পদ্ধতি : খেজুরের রস তপ্ত কড়াইতে জ্বাল দিয়ে ঘনীভুত করে এ গুড় তৈরি হয়।

খেজুর গাছ কাটা হয় দুই পদ্ধতিতে – এক. গাছের মালিক নিজে কাটে, দুই. বর্গাচাষি বা বর্গাগাছি।

গাছের মালিক তার রস দিয়ে এ গুড় তৈরি করে। গাছিরাও তাদের রস দিয়ে এ গুড় তৈরি করে।

গুড়ের বাজার : জেলার পাঁচ উপজেলার মধ্যে রামগঞ্জ বাদ দিয়ে বাকি চার উপজেলা সদর, রায়পুর, কমলনগর, রামগতির সর্বত্রই খেজুর গাছ রয়েছে পর্যাপ্ত।

সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে দক্ষিণাঞ্চল (উপকূলীয়) গুড়ের উল্লেখযোগ্য বাজার : রামগতি, আলেকজান্ডার, করইতলা, মাতব্বরনগর, তোরবগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, ফজুমিয়ার হাট, করুনানগর, দাশের হাট, দিঘলী, লক্ষ্মীপুর শহর, মান্দারী, চাঁদখালী, কুশাখালী, ফরাশগঞ্জ, তেয়ারীগঞ্জ, রায়পুরের বিভিন্ন হাট-বাজার।

৪. মৃৎশিল্পী

৩১/১২/১১

পাল বাড়ি (রসরাজ উকিলের বাড়ি)

গোপী কৃষ্ণ পাল (৬৩)

পিতা : কৃন্তল কৃষ্ণ পাল(মৃত) মাতা : কুলবালা

১৯৬৮ সালে এসএসসি (ফেল)

সহযোগী : স্ত্রী বিজলী রাণি পাল (৫৫), পুত্র বধূ শিল্পী রাণি পাল (৩৫), লিটন চন্দ্র পাল

১. ঈদের মেলা, বৈশাখি মেলা, স্নান ঘাটা মেলা, কোর্ট বিল্ডিং মেলা, কালির হাট (পার্বতীনগর) ও কালি বাজার (উত্তর হামছাদী) মেলা।

২. বছরের আয় ২৫-৩০ হাজার টাকা।

৩. মাটি, লাড়কি, খের, ডাইজ (খাঁচ) চক পাউডার, লাল-সাদা- রঙ।

৪. মাটিকে পানি দিয়ে কাঁদা করি, পা দিয়ে মিশাই, খাঁচ দিয়ে কাজ করি, রেৌদ্রে শুকাই, খের ও লাড়কি দিয়ে পোড়া দেই, চক পাউডার,সাকু বা এরারোট ও রঙ।

৫. জমিদার হাট (নোয়াখালী) থেকে অগ্রহায়ণ মাসে মাটি ক্রয় করি কিংবা ফরিদগঞ্জ আশটা বাজার থেকে, ৫-৭ হাজার টাকা আনার খরচসহ ২টনি পিক আপে। চৈত্র মাসে তৈরি শেষ।

৬. ১১ ডিং জমি আছে। নিজের বাড়ি ও পুকুরসহ

৭. ৩ ছেলে স্ত্রী, বউ, নাতি ২ জন সহ ৮জন পরিবারে সদস্য।

৮. টিয়া পাখি, ময়ুর, হাতি, পুতুল ৪টি (ক) মেম সাব (খ) কলম পুতুল ২টি (গ) ছোট পুতুল, ব্যাংক, টুনটুনি, হাঁস, ছোট ও বড় নৌকা বালতি, কুছা ব্যাংক, চুলা ২

www.pathagar.com

ধরনে, কুলা জোড় ঘট, বাঘ, ঘোড়া, গরু ২টি, হরিণ, পাতিল ২ ধরনের, সরা, জাজর, চামনা ।

৯. শিল্পী রাণি: নিজে নিজে এবং বাপের বাড়িতে মা ও ভাইয়ের সাথে শিখেছে।

১০. সুন্দর দেখে ছোট বেলায় বানাতেন পরে পরিবারের সহযোগিতায়।

১১. শ্বশুর-শাশুড়ি উৎসাহ দেয়। পারিবারিক কারণে।

১২. অন্যদের থেকে ভালো অবস্থা।

১৩. খুশিতে বানাই। আয়ের জন্য করি। পূজা দেই। গীতা সংঘ বা হরিসভা দেই। খারা হরি লুট (ধ্বনি) দেই।

১৪. নিজেরা একক ভাবে কাজ করি।

১৫. গ্যাস থাকলে ভালো হতো।

১৬. আরো বেশি বিক্রি করা সম্ভব বাজারে চাহিদা আছে।

১৭. অবসরে কাজ করলে ৪০টা-১০০টা ২ দিনে তৈরি করা যায়।

১৮. এক আইটেমে ৩০০-৪০০টি বানাই মোট ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার।

১৯. ট্রেনিং বিসিক দেয়।

২০. আগে বেশি চলত

২১. পাকিস্তান আমলে ৪ ঘর বানতো ওরা চলে যায়। অনিল, মনমোহন, বড়মনা, প্রাণ গোপাল।

২২. ১৯৭৫ সাল থেকে আমি কাজ করি, এর আগে ছেলে মেয়েদের জন্য বাড়ির মাটি দিয়ে তৈরি করি।

২৩. পরে ডাইজে, ঢাকা, কুমিল্লা ও চাঁদপুর থেকে কিনে আনি বানাই, বিক্রি করি।

চন্দনা রাণি পাল

www.pathagar.com

মাইজের বাড়ি, পাটারী বাড়ি, প্রভাত বাবুর বাড়ি ও দক্ষিণ মজুপুর।

চন্দনা রাণি পাল

স্বামী : বরণ চন্দ্র পাল (৪৫)

পিতা : মৃত. লাল মোহন পাল,

মাতা : বিশাখা রাণি পাল

১. শিক্ষা : নিরক্ষর।

২. মা বাপের কাছে শিক্ষণ শুরু, স্বামী বাড়ি এসে শিখি, শ্বশুরে হাঁড়ি, কলস, ঘট, ধুপতি, গ্লাস, বারাঘাট, তুমড়ি, ছোট মাঝারি ও বড় মটকা বানাতেন। শ্বশুর রমনি মোহন পাল।

৩. স্বামী মালামাল বিক্রি করে, মাটি ক্রয় করে।

৪. বছরে কার্তিক মাসে আরম্ভ, শেষ চৈত্র মাসে। রামগঞ্জ ফকির বাজার থেকে এক ট্রাক ১০ হাজার টাকার মাটি আনি। ৪ ভাগের ৩ ভাগের কাজ হয়, ১ ভাগ থাকে ৩ ধরনের দদির পাতিল, তাবা, হরা, ৩ ধরনের ব্যাংক, আগুনের পাতিল, খেলনা ইত্যাদি।

৫. হৈনে (পৌনে) পোড়া দেয় ৫-৭ শত মাল, মাসে এক হৈন। মোট ৬ হৈন = ৪২০০ টার কাজ হইছে। এক হৈনে ৫ শ টাকার খের ও ৪ মণ লাকড়ি লাগে, ১ মণ ১৮০ টাকা।

৬. শত হিসেবে বিক্রি হয়। ৭-৮ টাকা বড় পাতিল, ৫ টাকা মাঝারি পাতিল, সাড়ে ৪ টাকা ছোট পাতিল, ৫-১২ টাকা তাবা, ৫ টাকা হরা, ৮ টাকা, ১০ টাকা ও ৩০ টাকা ব্যাংক ১৫ টাকা ও ২০ টাকা আগুনের ভসি।

www.pathagar.com

৭. মাটি, লাড়কি, খের পিন্না বালু, রং, যন্ত্র (কাঠের হাঁচ), সামুক, হাতাইল ও দলা (সিমেন্টের তৈরি) । আগে রং দেয়া হয় পোড়ার আগে।

৮. ছেলে ২ মেয়ে ১ স্বামীরা ৪ ভাই, ১২ ডিং জমি। সবাই ভালো বানায়। ছেলে সেলুন করে, মেয়ে বিয়ে দিছি।

৯. স্বামীর বাড়িতে আয় বাড়ানোর জন্য জায়গা জমি নাই। যার পাইকারি ব্যবসায় করে তারাই লাভ করে। ঠাণ্ডার মধ্যে ভুগেন যে কষ্ট করি। কষ্ট করি সংসার উঠাই। বাধ্যগত হয়ে পাতিল বানাই। দিনকে দিন কাটাই, চিড়া খুদ খাই, এক কেজি আটা ৪ জনে খাই। প্রায় উপবাস থাকতে হয়। নিজের শরীরে কষ্টকে কষ্ট বলি নাই।

১০. মঙ্গল ও শুক্রবারে হরি সভা হয় আনন্দ-সুখ লাগে, প্রার্থনা হয়, গীতা পাঠ হয়। যে কোনো বাড়ি যে কোনো ঘরে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা হয়, যে বাড়িতে হয় তারা খাওয়া। বছরে একবার মহাউৎসব মাঘ-ফাল্গুন ।

১১. মাটি আনেন, মাটি ভিজাই, গোলকরে খামির করি, আছরা দিয়ে মিশ করি। পা দিয়ে ছাট দেই।

১২. পাতিল তৈরি : হাতাইলে রাখি দলা দিয়ে। পিটাই অথবা চেঁচি। পিন্না দিয়ে পিটে। সামুক দিয়ে পেট বাইর করি, গোল হয়। শুকাই, রঙ করি, পোড়া দেই।

১৩. এ বাড়িতে আরো বানায় ১. সতি রাণি (৩৫), স্বামী : দীপক, পিতা : সাধন (ফেনী রামপুর), ২. শিবানী, স্বামী : শ্রী কৃষ্ণ, পিং. সুদর্শন, (দাগন ভুঞাঁ), ৩. খুকু রাণি, স্বামী : হারান চন্দ্র, পিং. হরিমন ৪. লনী রাণি ৫. বাসন্তী।

১৪. চন্দনা রাণি পাল কাতর কণ্ঠে বলেন, ছেলে মেয়েদের পড়ামু, অন্য জাতে বিয়া দিমু, তবু কষ্ট করতে দিমু না। কুঁয়ারের (কুমারের) কাছে দিমু না।

১৫. তিনি জানান, আগে ১২ পরিবার কুমারের কাজ করত, এখন ৪ পরিবার কাজ করে। অনেকে পেশা ছেড়েছে অনেকে দেশ ছেড়েছে।

শ্রী শ্রী শ্যাম সুন্দর জিউ আখড়া, থানা রোড, লক্ষ্মীপুর।

২৬.৯.২০১১, (০২ অক্টোবর -০৬ অক্টোবর শারদীয় দুর্গা পূজা, হাট বারের ফলে পরদিন ০৭ অক্টোবর বির্সজন)

কারিগরি-অরুন পাল (৫৩) পিতা : স্বর্গীয় রাজেন্দ্র পাল, মাতা : স্বর্গীয় মালতী রাণি পাল, গ্রাম : সুজাবাদ, থানা : নরিয়া, জেলা : শরিয়তপুর।

১৯৭৩ সালে এ কাজে যোগ দেই। ওস্তাদ স্বর্গীয় মতিপাল (কার্তিকপুর, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর) তিনি চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় কারিগর। চট্টগ্রাম সদর ঘাট রাজরাজস্বী নারায়ণ মন্দিরে প্রথম কাজ করি। ১৩ বছর ওস্তাদের সাথে ছিলাম, ৫ বছর শিক্ষা নেই, তারপর প্রথম বেতন ২৫,০০/-। ৫/৭ বছরের মাথায় কাজের মান দেখে আরেক জন ওস্তাদের কাছে যাই। এরপর ২/৩ জনের সাথে কাজ করি। অন্য ওস্তাদের সাথে।

www.pathagar.com

অরুণ পাল

ওস্তাদ আমাকে নিজে কাজ করার অনুমতি দেয়। আমি কি পারব। ওস্তাদের আশির্বাদ নিয়ে কাজ করতে ১৯৮৬ সালে বঙ্গপাড়ার প্রতিমা বানাই ৭ হাজার টাকায় পরে চট্টগ্রামে সকল থানায় ও কক্সবাজারে অনেক প্রতিমা বানাই।

লক্ষ্মীপুরে আসি ২০০০ সালে। লক্ষ্মীপুরের প্রাণ কৃষ্ণ পাল আমার গ্রামের লোক ছিল। সে খুব ভালো কারিগর। দালাল বাজারে ইন্দ্রোজিত পাল নামে যে ছেলেটি কাজ করে সে আমার গ্রামের ছেলে। ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত শ্যামসুন্দর আখড়ায় রয়েছি। রায়পুর জগন্নাথ মন্দির, রামগতির আলেকজান্ডার ও ভোলার চর ফ্যাশনে প্রতিমার কাজ করি। এবছর শুধু লক্ষ্মীপুর, ভোলা, নরসিংদীতে কাজ করেছি। ২০০৯ সালে ২২,০০০ টাকায়, ২০১০ সালে ৩০,০০০ টাকায় ও ২০১১ সালে ৪০,০০০ টাকায় প্রতিমার কাজ করি। নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন খুব দ্রুত এসেছে।

তবে বছরে চলার মতো তেমন একটা থাকে না। দ্রব্য মূল্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলা যায় না। মৌসুমে স্বরস্বতী ও দুর্গা পূজা লক্ষ্মীপুর সরস্বতী ৩০ থেকে ৭০টি বানাই, কারিগর দিয়ে লক্ষ্মীর কাজ করে পোষায় না। লক্ষ্মীপুরে দাম কম। পরিবার গ্রামের বাড়িতে। স্ত্রীর ভক্তি শ্রদ্ধা থাকায় কাজ করে সুখি, অতীব তৃপ্তি থাকায় এ শিল্পের কাজ করে উন্নতি করতে পেরেছি।

ভারতের কলকাতার সিঁথির মোড়ে কাজ করেছি। কাজ দেখার জন্য আগরতলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকায় যাই। লেখাপড়া : ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত। বাবা মাটির হাঁড়ি পাতিল তৈরি করতেন। তখনকার সময় প্রতিমার কাজে মান ছিল ও কারিগরদের সামাজিক মান ছিল। এখনও এজন্য আসি। এ ছাড়া ধর্মীয় অনুভূতি প্রবল।

বর্তমান প্রতিমায় শিল্পোতত্ত্বের ভাব বেড়েছে, সাজ-সজ্জা বেড়েছে। অর্থ খরচও বাড়ছে। আগে ডাইজ হতো মাটি দিয়ে এখন প্লাস্টার পেরিস দিয়ে। এখন তুষের কাজ হয়। পূর্বে একই রকম প্রতিমা সব জায়গায় হতো। বর্তমানে প্রতি নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে।

বৈশাখ-আষাঢ় : সিমেন্টের প্রতিমা। আষাঢ়-কার্তিক-মাটির প্রতিমা (চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীপুর) দুর্গা, লক্ষ্মী, কালি, ও রাস উৎসবের প্রতিমা। কার্তিক-পৌষ-অর্ডার থাকলে

www.pathagar.com

সিমেন্টের কাজ এবং মাঘ-চৈত্র : সরস্বতী ও বাসন্তী ৮০ থেকে ৮৫টি, কারিগর থাকলে বেশি তৈরি হয়।

প্রতিমা তৈরির বিবরণ

প্রথম পর্যায় : কাঠ ও বাঁশ (কদম, তুলা, আম, কাঠ) দিয়ে কাঠামো তৈরি করি।

২য় পর্যায় : খড় দিয়ে প্রতিমার ধরন অনুযায়ী বেণা বানাই।

৩য় পর্যায় : মডেল নিজস্ব বাড়িতে দাঁড় করাই। বেণা দাঁড় করানো হয় নিজস্ব ভাব দিয়ে।

৪র্থ পর্যায় : মাটি দিয়ে বেণা ঢাকা হয়। মাটি দিয়ে বেণা পোছা হয়। জমিন থেকে আঠালো মাটি ও বালু কিনে আনি। আনার পর মাটি চেক করি।

৫ম পর্যায় : খড় কুঁচিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রতিমা সাইজ করি। প্রতিমার বডি গঠন করি । এতে প্রতিমা শক্ত হয়।

৬ষ্ঠ পর্যায় : পাট কুচিয়ে বালু অংশ মাটি, বেশি বালু নয়, আঠালো নয়, মাটির সাথে মিশানো হয় এবং প্রতিমার গায়ে লাগানো হয়। গঠন পুরা হয়। (পা দিয়ে-নিচে ছালা দিয়ে মিশানো হয়)

৭ম পর্যায় : শুকানোর পরে মাজা হয়, বাঁশের কাইন (কাইম কাঠি) বা হাত দিয়ে। প্রয়োজনে মাটি লাগানো হয়।

৮ম পর্যায় : (ক) আঙুল ও মুখ-মাথা লাগানো হয়। হাতে বা ডাইজ দিয়ে (ডাইজ অবসর সময় হাতে তৈরি করা হয়)।

(খ) হাতে সকল প্রতিমা-মানুষ সাদৃশ্য প্রতিমা তৈরি হয়, ডাইজে মুখমণ্ডল। সিংহ, অসুর, মহিষ, হাঁস, পেঁচা, ইঁদুর, ময়ূর, সাপ, গণেশের মাথা হাতে তৈরি হয়।

৯ম পর্যায় : শুকানোর পর-ফাটা জেরা দেয়া হয়। ।

১০ম পর্যায় : জল, নাতা দিয়ে (কাপড়ে নেকড়া) প্রতিমা মুছে সাইজ করা হয়।

১১তম পর্যায় : হালকা করি মাটি মিশিয়ে গায়ে শেষ লেপ দেয়া হয়। (গোলা মাটি)

১২তম পর্যায় : শুকানোর পর প্রতিমার শরীরে খড়ি মাটি-চক পাউডার লাগানো হয়।

১৩তম পর্যায় : রঙ তৈরি এবং প্রতিমা অনুযায়ী রঙ করা হয়।

১৪তম পর্যায় : মেশিন দিয়ে (পূর্বে হাত দিয়ে) সেড দেয়া হয়। বড়ির খাঁজ-ভাঁজ তৈরির জন্য।

১৫তম পর্যায় : চোখ কাটা হয়। চুল সাইজ করে লাগানো হয়।

১৬তম পর্যায় : প্রতিমা সাজ-গোজ যথা : অলংকার, কাপড়-চোপড়, পাইড়, অস্ত্র সেট লাগানো হয়।

সহকারিগর- শংকর মণ্ডল, ২৮ বছর, গ্রাম : শব্দালপুর, থানা : আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

www.pathagar.com

কাজ শুরু প্রথম নারিকেল তলা মন্দিরে সরস্বতী প্রতিমায়, পরে সাতক্ষীরায় দুর্গা প্রতিমা তৈরি শিখি, তখন পড়াশুনা করি হাড়িভাঙা স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে, পরে বিয়ের টোপর, মুকুট, ভোটের প্রতীক তৈরির কাজ করি। ২ বছর থেকে লক্ষ্মীপুরে কাজ করি।

এক বছর লক্ষ্মীপুরে ২টি প্রতিমা (শাখারীপাড়া মন্দির ও শ্যাম সুন্দর মন্দির) এবং ভোলার চর ফ্যাশনে ২টি প্রতিমা। এর আগে নরসিংদী ৩০টি প্রতিমার মাটির কাজ করি। আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে বাড়ি থেকে বের হই, সাথে ৭ থেকে ৮ জন কাজ করি।

টাকার উপর, কারিগরের হাতের উপর নির্ভর করে প্রতিমা ভালো-মন্দ হয়। গ্রামের ভালো লাগে, কাজ নিরিবিলি করা যায়। আদর, আপ্যায়ন করে। রাতে কাজ ভালো হয়। গ্রামের মানুষ প্রতিমা তৈরিতে মূল্যায়ন করে। ভালো হলে মূল্যায়ন করে।

১০ বছর পূর্বে কোনো বেতন বা টাকা দেয় নাই। মালিক যা দিত। তাই নিয়ে চলতে হতো। আস্তে আস্তে ৫০০ টাকা তারপর ১০০০, ৩০০০, ৮০০০ টাকা পাই। মালিক পূজার সময় জামা কাপড় দেয় খাওয়া মালিকের, কন্ট্রাক্ট এ কাজ করি। মালিক কাজ জানে, নিজে একদিন মালিক হবার স্বপ্ন দেখি। আগে তুষ ও মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি হতো, এতে ভালো হতো না।

৫. ফসল

নারিকেল

লক্ষ্মীপুরে বর্তমানে স্থানীয় বাজারে নারিকেল ব্যবসা চলছে জমজমাট। জেলায় প্রতিবছর প্রায় ১০ কোটি নারিকেল উৎপাদিত হয়। যার বাজার মূল্য শতকোটি টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতি জোড়া নারিকেল বিক্রি হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। জেলায় সবচেয়ে বড় হাট মিলে সদর উপজেলার দালাল বাজারে। এখান থেকে জেলাবাসীর চাহিদা মিটিয়ে এখানকার নারিকেল যাচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বিদেশেও। আর এসব নারিকেল বেচা-কেনা ও এর থেকে ছোবড়া বের করার কাজে প্রায় শতাধিক নারীপুরুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে দালাল বাজার এলাকায়। নারিকেলের ছোবড়াও বিক্রি হচ্ছে ভালো দামে। যা দিয়ে তৈরি হচ্ছে জাজিম, পাপশ, ওয়ালমেটসহ অনেক পণ্যসামগ্রী। এখান থেকে বড় বড় ব্যবসায়ীরা নারিকেলের পাশাপাশি ছোবড়া কিনে নিচ্ছেন অন্যত্র। জেলার নারিকেলের প্রধান মোকাম হচ্ছে, সদর উপজেলার দালাল বাজার, চন্দ্রগঞ্জ ও রায়পুর উপজেলার হায়দারগঞ্জ বাজার, রামগঞ্জ শহর। সরেজমিন সদর উপজেলার দালাল বাজার গিয়ে দেখা গেছে রাস্তার দুই পাশে হাজার হাজার নারিকেল জমাট করে রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

দালাল বাজার নারিকেলের মোকাম

তথ্যদাতা : নুর আলম কবির শিপন (৩৬) পিতা জনাব নুরুজ্জামান মাস্টার
ও
জাকির হোসাইন
নারিকেল ব্যবসায়ী, দালাল বাজার, নারকেল হাটা
এ বাজারে ১৩ বছর যাবত ব্যবসা করছেন তারা।

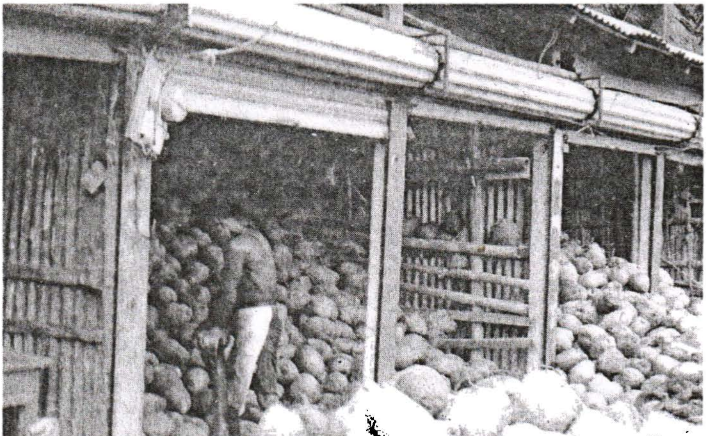

নারিকেলের আড়তের দৃশ্য

১৩ বছর পূর্বে প্রতিটি নারিকেল ৫ টাকা হারে আর বর্তমানে প্রতিটি ১৭ টাকা হারে বিক্রি হয়, গত বছর সর্বোচ্চ ৩০ টাকা ছিল। নারিকেল পশ্চিম লক্ষ্মীপুর থেকে

www.pathagar.com

বেশি সংগৃহীত হয়। পূর্বে চন্দ্রগঞ্জ, পশ্চিমে হায়দরগঞ্জ, দক্ষিণে রামগতি ও উত্তরে রামগঞ্জ সব এলাকা থেকে নারিকেল এ বাজারে বিক্রির জন্য আসে। মাইজদী থেকেও আসে, সারা দেশের মধ্যে বৃহৎ নারিকেল ব্যবসাকেন্দ্র হলো দালাল বাজার। প্রতি বছর কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা লেনদেন হয়। অথচ এ বাজারে স্থায়ী 'নারিকেল হাটার বাজার' নাই। উন্মুক্ত স্থানে বেচা কেনা হয়। সপ্তাহের শুক্রবার ও সোমবার হাটবারে বেচাকেনা বেশি হয়। বাহিরের ব্যাপারিরা বেচাকেনা করে। অন্যান্যরাও বেচাকেনা করে। হাটবারে লেনদেন হয় ১০ লক্ষ টাকা। হাট ছাড়াও ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। ট্রলিতে করে ছোট নারিকেল ব্যাপারিরা নারিকেল বেচতে আনে।

স্থানীয় পর্যায়ে পারিবারিকভাবে ভালো নারিকেল উৎপাদন হয়। প্রভাবশালীরা বাজারের স্থান পরিবর্তন করায় স্থায়ীভাবে ব্যবসা নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রথম আখড়ায় সামনে, উচ্ছেদের পর স্বর্ণকার পট্টি, তারপর মেইন রোডের পার্শ্বে বর্তমান এখানে। সরকারের কাছে স্থায়ীভাবে বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট আছে, পুরোনো ব্যবসায়ীরা অনেকে নেই। বয়সের কারণে চলে যাচ্ছে। নতুন ব্যবসায়ীরা আগ্রহী হচ্ছে। এখানকার জমি নারিকেল উৎপাদনে সহায়ক। লবণাক্ত মাটিতে নারকেল বেশি হয়। বীজের উপর, উর্বরতার উপর নির্ভর করে ফসলের কম বেশি উৎপাদন।

www.pathagar.com

নারিকেল ব্যবসায়ী রায়পুরের খোকন, লক্ষ্মীপুর সুজন (নতুন), হায়দারগঞ্জে ইব্রাহীম, ইউসুফ আজিজ, চন্দ্রগঞ্জে কামাল, সুমন, রামগতির তোরাব গঞ্জের নূরনবী ও টুমচরের নূরনবী ভালো ব্যবসা করে। উত্তরাধিকার সূত্রেও ব্যবসায়ী আসছে। দালাল বাজারে ২ জন আছে। শশী ভূষণ নাথ ও আবদুল মান্নান ৪০ বছর যাবত এ ব্যবসা করে। বাবার আমল থেকে ব্যবসা।

হুমায়ুন কবির বিপ্লব, নারিকেল ব্যবসায়ী

দালাল বাজার

প্রতি সপ্তাহে দালাল বাজার থেকে ৬০-৭০ লাখ টাকার নারিকেল দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই জেলার নারিকেল রপ্তানি করা হচ্ছে— ভৈরব, খাদেমগঞ্জ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বাগেরহাট, রাঙ্গামাটি, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলায়।

ছোবড়া কারখানা

শশী ভূষণ নাথ (৬৫)

নারিকেল : ৬০ গাড়ি মাল গত বছর গেছে। যার বাজার মূল্য ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা। সামাজিক মূল্য কম। ৪০-৫০ বছর যাবত ঐতিহ্যের সাথে চলছে। দরিদ্রের ছেলে, BSC পরিক্ষা দিয়ে স্কুলে চাকরি পাই। ১৯৭৫ সালে এ ব্যবসায়, পরিবারের দরিদ্রতার কারণে part-time এ ব্যবসা করি। বর্তমানে Full-time. গাড়ি, রাইস মিল আছে। বিসিকে নারিকেল তেলের মিল আছে। অনেক কষ্ট করেছি। বড় ছেলে BSC-Eng শেষ করেছে। ঢাকায় চাকরি করে, Ast. Manager। ছোট ছেলে MBBS ফাইনাল দিচ্ছে।

৩ জন মিলে ছোবড়ার ব্যবসা করি। ছোবড়ার ব্যবসায় এখনও তেমন লাভজনক হয়ে উঠেনি। চাহিদা নিদিষ্ট হওয়ার কারণে সরবরাহ বেশি । ছোবড়া প্রতি ট্রাকে বিক্রি ৩৫০০০-৪০০০০ টাকা, গাড়ি ভাড়া ৭-৮ হাজার টাকা, উৎপাদন খরচ বেশি পড়ায় Loss হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই বছর। শ্রমিক বেতন মাসে ৭০-৭৫ হাজার টাকা।

www.pathagar.com

প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ গাড়ি মাল যায়। ছোবড়া আগে জ্বালানির জন্য বিক্রয় হতো। ঢাকায় কেজি ১০ টাকা বিক্রি হয়। বেল্ট=২০ কেজি থেকে ১৬০ কেজি পর্যন্ত। প্রতি ট্রাকে ৩৫০০ থেকে ৪০০০ কেজি পর্যন্ত, হালকার কারণে ট্রাকে বেশি নেয়া যায় না। পাপশ, রিক্সার গদি, জাজিম এসব বানায় ছোবড়া দিয়ে।

ঢাকায়, টঙ্গী নেয়া হয়। হায়দারগঞ্জ ও রায়পুরে চোবড়ার মিল ছিল। এখন গোপালগঞ্জে বরকত উল্যাহর কাছে বিক্রি করি। ১ ট্রাকে ১৬০ কেজির ২৪ টা বেল্ট দেই। প্রতি ২/৩ দিনে ১ ট্রাক পরিমাণ তৈরি করি, ভূষি মুরগীর ফার্মে নেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়ে ফলন কম হয়। ফলে গত বছর নারিকেলের দাম প্রতিটি ৩০ টাকা হয়েছে।

নুর আলম কবির শিপন ও আকরাম হোসেন

এ শিল্পে কোন লোকসান নেই। বার মাস নারিকেলের ব্যবসার চাহিদা আছে। নারিকেল শ্রমিক আজগর আলী জানান, প্রায় বিশ বছর যাবৎ তিনি নারিকেলের ছোবড়া তোলার কাজ করছেন। এক হাজার নারিকেল ছোবড়া তুললে ৩ শ টাকা পান। দৈনিক তিনি এক দেড় হাজার নারিকেলের ছোবড়া তুলতে পারেন। নারিকেলের চাহিদা অনুযায়ী এ জেলায় নারিকেল ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে উঠলে এলাকার বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হবে।

মো. রফিক (কর্মচারী-৫০বছর)

স্থানীয় বাজারে নারিকেল কিনে ছিলে মেশিনের সাহায্যে। চিটগাং-ঢাকা পাঠাই। জাজিম, রিক্সা, গদি বানায়। এখানে কর্মরত শ্রমিক, ছেলে ৮ জন ও মেয়ে ১৬ জন। মাসে কাজ করে। মেশিন যারা চালায় তারা ২০০ টাকা মেয়ে ১৫০০-৩৫০০ ও ছেলে ৪০০০-৫০০০ টাকা টাকা করে আয়, সারাদিন ৮-৫ টা পর্যন্ত ডিউটি করে। রাখালিয়া ওয়াপদা বাজার, গোপালগঞ্জ থেকে অনেকে এসেছে কাজ করতে। ছেলেরা মেশিন চালায়। দিনে এক ট্রাক মাল প্রসেসিং হয়। দিন পর চালান হয়। শ্রমিকদের লেখাপড়ার সময় নাই। এখানকার ভুষিও বিক্রি হয়।

কামাল হোসেন

নারিকেল ও ছোবড়া ব্যবসায়ী

চন্দ্রগঞ্জ বাজার

তিনি এ মৌসুমে হাজার পিছ নারিকেল ১৬-১৮ হাজার টাকা দামে কিনি। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার নারিকেল কিনি। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার নারিকেল ছোবড়া ভৈরব, বাগেরহাট, খাদেমগঞ্জে বিক্রি করছি। মোকামে ৮ জন শ্রমিক নারিকেল ছোবড়া তোলার কাজ করছে। এ বছর ভালো দাম পাইছি।

আনোয়ার হোসেন

নারিকেল চাষি

চন্দ্রগঞ্জ, সদর উপজেলা

www.pathagar.com

আঁর প্রায় ১০ একর ভিটি জমিতে নারকেল বাগান আছে। নারিকেল চাষে তেমন খরচা নেই। প্রথমে গাছ লাগাতে দরকার সার ও চর্যা। গাছ লাগানোর পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। প্রতি বছর বর্ষা সময় গাছের মাথা পরিষ্কার করতে হয়। একেকটি নারিকেল গাছ ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত ফল দেয়। প্রতি গাছ থেকে প্রতি বছর ২ থেকে ৩ শতটি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। এ মৌসুমে ইতোমধ্যেই প্রায় ৫ হাজার নারিকেল বিক্রি করছি। গত বছর ১ শ নারিকেল ১ হাজার- ১ হাজার তিনশ টাকা বিক্রি করলেও এ বছর বিক্রি করছি ১ হাজার ৫ শ থেকে ১ হাজার ৮ শ টাকায়।

সুপারী কেনাবেচার দৃশ্য

সুপারি

প্রায় ৪০ জন ব্যবসায়ী দালাল বাজারে সুপারির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। সুপারির জন্য হায়দরগঞ্জ ও রায়পুর বিখ্যাত। বাজারগুলোর মধ্যে দালাল বাজার ৩ নম্বর স্থান দখল

সুপারি গাছের বাগান

www.pathagar.com

করে আছে। এ বাজারে মূল সিজনে ৩০ লাখ টাকার সুপারি লেনদেন হয়। দালাল বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে এমন কোনো গৃহস্থ নাই যার কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ কাউন (২০ গোণ্ডায় বা ৮০টি সুপারি ১ পোন হিসাব করা হয় এবং ২০ পোনে ১ কাউন ধরা হয়) সুপারি হয় না। সবার বাড়িতেই সুপারি গাছ লক্ষ করা যায়।

শিশু শিল্পী হিসেবে বিবেক নাচ ও মেয়ে সাজার কাজ করি।

আলোমতি প্রেমকুমার, সাগর বাদশা, আপন দুলাল রহিম রূপবান ও গুনাই বিবি পালায় কাজ করি।

১৯৭১-৭৫ যাত্রাপালায় কাজ করি। কান্তিমজুমদার বড় ভাই যাত্রায় কাজ করতেন।

অদৈত্য মজুমদার বাবা, যাত্রাদলের ম্যানেজার ছিলেন।

৭৪-এর দুভিক্ষের কারণে দলভেঙ্গে যায় এলাকার সন্ত্রাস কারণে, মন ভেঙ্গে যায়। তারপর পেশা হিসেবে দর্জি কাজ শুরু। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে পরিবেশনা করি।

২০০৯ সালে তৃণমুল শিল্পী গোষ্ঠী গঠন করি আর্থিক লাভ তেমন নেই। সামান্য ভাতা প্রতি নাটকে ১০০ টাকা পাই মনের খোরাক নিয়ে কাজ করি। যাত্রার জন্য দূরে বায়নায় গেলে কিছু আয় হতো। বিভিন্ন উৎসবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবেশনায় কিছু সম্মানী পাওয়া যেত। সামাজিক মর্যাদা: বেশি ভাগ মানুষ ভালো চোখে দেখে কিছু মানুষ ভালো চোখে দেখে না। প্রথম প্রথম উৎসাহ না পেলে এখন যৌতুক বিরোধী ও বাল্য বিবাহ প্রচারণায় ভালো ফল পাওয়া গেছে। ইভটিজিং সাড়া পাওয়া গেছে।

আলপনা রাণি : স্বামীর অনুপ্রেরণা শিল্পের কাজ করি।

বাবা ঢোল বাজাতেন। বড় ভাইও যাত্রার অভিনয় করতেন। বাবা বাউল শিল্পী ছিলেন।

এ ধরনের কাজে সংসারে কোনো অসুবিধা হয় না।

হরিসভা : ধর্মীয় সংগীত, গীতাপাঠ করি।

মনের ইচ্ছা আগ্রহে কাজ করি, কিছু চাওয়া পাওয়ার জন্য না।

নন্দন শিল্পী গোষ্ঠী

পূর্ব নন্দনপুর, দালালবাজার

সদস্য সংখ্যা ১২ জন

কাজল রাণি সরকার, সভাপতি

স্বামী অরচন চন্দ্র সরকার

বাবার বাড়ি চর বাটা, নোয়াখালী, ৪ বছর পূর্বে দলে কাজ শুরু করি।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানো, নাম কীর্তন, ধর্মীয় গান, ধর্মীয় পালা দিয়ে শুরচ করি।

www.pathagar.com

পূর্ব পুরুষদের চর্চা থেকে অনুপ্রেরণা পাই। এই বাড়ির নাম কীর্তনীয়া বাড়ি যেহেতু কীর্তন করতেন। নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ঠেকাতে এরা কাজ করে।

নুপুর রাণি সরকার

স্বামী : পরেশচন্দ্র সরকার

সামাজিকভাবে ভালোচোখে দেখে। সম্মান পায়। প্রতি প্রোগ্রামে সম্মানী হিসেবে দল ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা পায়। প্রতি প্রহর বিটার নাটকে প্রতিজন ১০০ টাকা সম্মানী রাখে।

একাজে কোন বাধা নাই। প্রথম প্রথম ছিল দু একটা পরিবেশনা পরে সমস্যা কেটে যায়।

সমাজে সচেতনতা তৈরি হয়।

জনকল্যান শিল্পীগোষ্ঠী

৮.২.১২ সময় ১.০০ টা । বিটা তৈরি করে।

মো. ওসমান (২২)

পিতা : মরহুম আহাম্মদ আলী (কৃষি)

মাতা: মমতাজ বেগম

শিক্ষা : নবম শ্রেণি

পারদর্শী : অভিনয় ও দেশের গান, পালা গান, বাউল গান।

দলে : ১২ জন

পুরুষ : ৮ জন

মহিলা : ৪ জন

২ বোন ৪ ভাই আমি ছোট।

পেশা : (সুপারি ও নারিকেল ব্যবসা)।

আমার এক ভাই সাইফ, জেঠাতো ভাই, আমি নাটক করতাম আগে, ভাই আমাকে বিটা অফিসে নিয়ে আসে, ৪ দিন প্রশিক্ষণ করি ২০০৭/২০০৮ সালে। সাইফ ভাই বিদেশে যাওয়ার পর দল ভেঙ্গে যায়। পরে বিটার লোকজন এসে দল গঠনের কাজ করে। রায়পুরে নাটক হয়, মুক্তি নাটক, পরিবেশিত হয়। বাবার কাছে থেকে জমি পাই। পরিবারে সবার ছোট। দলের ঢোল, ঝুড়ি, জিপসী আছে।

গান : ১. আজকের জমানায় আগের মত মানুষ নেই।
যদি পাইতাম কইলজার ভিতর রাখিতাম,
মনে কতা মনে চাপাই তার পাশে থাকতাম।
২. আমাগো বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলা লক্ষ্মীপুর
ডিসটিক মোদের নোয়াখালী ডাকঘর : দালাল বাজার।

www.pathagar.com

আমরা গেরাইমমা পোলা,
মদুর মদুর কতা কই, দাম ৪৫০ টাকা তোলা।
পালাগান : ৩. মা জননী পরম দুঃখী
তার মতো কেউ নেই।
মায়ের চরণে রাইখা হাত,
করিতাম সালাম।
অন্যজন : বাবা নামটা বড় সুন্দর, তোমরা জান নাই
মোহাম্মদে বাবা ডাক তোমরা শুন নাই।

বাবা মাঝে মধ্যেই গাইতো এলাকার অনুষ্ঠানে। জেলার অনেক জায়গায় দলের গান হয়। রায়পুর উপজেলা পরিষদ, লক্ষ্মীপুর হল। মানিকগঞ্জ (রায়পুর), চর বংশী, মোলার হাট, দাসকান্দি, পঃ লক্ষ্মীপুর, ডাকাইচ্ছা কান্দি (ইটের পোল), দালাল বাজার, মিরগঞ্জ, রসুলগঞ্জ, কামানখোলা হাইস্কুল, দালাল বাজার রানীর হাট, (কামান খোলান পর), শাইদ্দার পোল, খাসের হাট, কোম্পানি বাজার, যৌতুক, বাল্য বিবাহ, মাদক বার্ড ফ্লু উপর গান গাই।

মুক্তি (নারী নির্যাতন) ময়নার কিস্‌সা (মাদক/শিশু) অভিশপ্ত যৌতুক, অত্যাচারী জমিদার, মুখোশ, গরিবের সন্তান, মা আমার মা, ক্ষুধার্ত মানুষ আরো অনেক নাটক করি।

বাদ্যকর

প্রাণ গোবিন্দ- কমল নগর।

বাদ্যকর প্রাণ গোবিন্দ

www.pathagar.com

তারিখ : ২০ মাঘ, ১৪১৮ বাংলা
সময় : বিকাল ০৫টা
বাদ্যকর : হারমোনিয়া, ঢোল (ঢুলী)
দলের নাম : বলদেব জীউি সম্প্রদায় (কীর্তন)
নাটক, যাত্রা (অভিনেতা)

নাম : প্রাণ গোবিন্দ দাস (৪৫)
পিতা : মৃত ঘনশ্যাম দাস
মাতা : শেফালী দাস
স্ত্রী : স্মৃতিরাণি দাস
সন্তান : ২ ছেলে (অনীক দাস, দীপ্ত দাস), ১ মেয়ে (স্মরণীকা দাস)
পেশা : অভিনয় ও বাদক
পৈতৃক পেশা : চাষাবাদ

বাবার অনুপ্রেরণায় সংগীত ও অভিনয় জগতে পদার্পণ। বাবা পালা ও যাত্রা শিল্পী ছিলেন।

শিক্ষানবিশ : হাতে খাড়ি বাবার কাছে হারমোনিয়াম, ঢোল।

এরপর নোয়াখালী নৃত্যকলায় ক্লাসিক্যাল সংগীত ও যন্ত্র।

ওস্তাদ : সত্য গোপাল নন্দী। ৩ বছর একটানা তালিম।

এরপর কীর্তন জগতে (এক নাম কীর্তন) আগমন।

ওস্তাদ : গনেশ দাস (ভোলার) প্রায় পাঁচ বছর তালিম ও অনুশীলন। এরপর নিজেই দল গঠন করি ও সংগীতকলা জগত নিয়ে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হই।

সাগরেদ :

১. কৃতান্ত দাস (ঢোল)
২. বেচু রাম দাস (হারমোনিয়াম)
৩. পিকু রাণি রাস (সংগীত)
৪. কামরুল জামান (সংগীত)
৫. শ্রীবাস দাস (ঢোল)
৬. সুফক সাহা (ঢোল)
৭. পূর্ণিমা রাণি দাস (অভিনয়- নাটক, যাত্রা)
৮. সুজাতা রাণি দাস (নাটক)

এছাড়াও ৩৫ থেকে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী আছে যারা আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শেখে।

ঠাকুরের দোয়ায় এ পেশায় আমি স্বচ্ছল। পরিবার পরিচালনা করতে অসুবিধা হয় না। বড় মেয়ে কলেজে পড়ে, বড় ছেলে এসএসসি পরীক্ষার্থী।

আমার স্বপ্ন : সংগীত একাডেমী গড়ে তোলা। সমাজে আজো কীর্তন, শাস্ত্রীয় সংগীত, নাটক যাত্রার গ্রহণযোগ্যতা আছে। মানুষ গ্রহণ করে ও সমাদর করে আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জগৎকে টিকিয়ে রাখতে ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

স্থান : মধ্য ভাদুর, ডাকঘর : ভাদুর, উপজেলা : রামগঞ্জ, জেলা : লক্ষ্মীপুর। নাম : উষা কবিরাজ, বাবা : স্বর্গীয় চন্দ্র মাধব কবিরাজ, মাতা : চন্দ্রাবলী দাস, বয়স : ৭৩, শিক্ষা : প্রাথমিক। পেশা : কবিরাজ, গুরু : বাবা পেয়ারী মোহন কবিরাজ, চাঁদপুর। রোগ-ব্যাধি : লিভার, জন্ডিস, বাত, বায়ু, সুতিকা, প্রসূতি, উদরাময়, (উদুরী) জামির পড়া। চিকিৎসা পদ্ধতি : লিভার বড়ি, পাঁচন জন্ডিস, বাত-পাঁচন বড়ি, বাত-বায়ু, সুতিকা পাঁচন, উদুরী বড় জামির পড়া কেউ কিছু করলে বা টোনা তাবিজ করলে, কিছু খাওয়ালে, জামির পড়া দেন। পরিবারে ছেলে বৌ ঝিকে শিখিয়েছেন। বংশপরম্পরায় এ চিকিৎসা করে আসছেন। তিন ছেলে এক মেয়ে। থালপড়া : বিষাক্ত কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি কামড়ালে থালপড়া দেন। পদ্ধতি মন্ত্রযোগে থালপড়া রোগির পিঠে লাগানো হয়। সে থাল বিষ টেনে নেয় ও থাল বিষ চুষে পড়ে যায়।

জন্ডিস চিকিৎসা করছেন মঞ্জুরা খাতুন

রুগী- পেয়ারা বেগম, পূর্ব সৈয়দপুর

www.pathagar.com

স্থান : বরন্দাজ বাড়ি
সৈয়দপুর (চরশাই)
সদর, লক্ষ্মীপুর।
লোকচিকিৎসক বা ওঝা
নাম : রোকেয়া বেগম
স্বামী : আনু ভাণ্ডারী
ঠিকানা : গ্রাম : সৈয়দপুর, ডাকঘর : রূপচরা, জেলা ও উপজেলা : লক্ষ্মীপুর।
পেশা : গৃহিণী
বয়স : ৫২ বছর
শিক্ষা : স্বশিক্ষিত
সংস্কৃতির বিষয় : লোকজ চিকিৎসা

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে এ পেশায় কাজ শুরু করেন।

এলাকায় যখন দেখলেন বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রোগে ভোগে, সর্প, কুকুর, বিষাক্ত পোকা মাকড় মানুষকে কামড়ায়, দংশন করে তখন মানুষের সেবায় ছুটে যেতেন এভাবে এলাকার মানুষ তার গুণের কথা জানতে পারে। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম। তখন বিপদের সময় মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি মানুষের সেবার জন্য, আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার জন্য তিনি এগিয়ে যান।

ওস্তাদ : তাঁর মাতা। মায়ের আগ্রহে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে এ বিদ্যা শিখেন ও মায়ের মৃত্যুর পর মানব সেবায় এগিয়ে আসেন। পারিবারিক বাধা নেই।

কে উৎসাহ দেন : তার স্বামী

যেখান থেকে তাঁর ডাক আসে, সেখানেই ছুটে যান। পার্শ্ববর্তী ২০ থেকে ৩০ গ্রামে তাঁর খ্যাতি রয়েছে।

প্রয়াত মায়ের আগ্রহ ও অনুরোধে এ চিকিৎসা করে থাকেন। মানুষের সেবায় ব্রতী হয়ে এ কাজ করে থাকেন।

শিষ্য : তাঁর ছেলে-মেয়েদেরও তিনি তালিম দিচ্ছেন।

সারা বছরই এ চিকিৎসা করা যায়।

ঘর সংসার সামাল দিয়ে এ কাজ করা যায়। কোথাও তাৎক্ষণিক বা দূর-দূরান্ত হলেও রান্না-বান্নার কাজ মেয়ে করে।

পারিবারিক সমস্যা হয় না। স্বামী এ কাজে তাঁকে উৎসাহ প্রদান করেন। আর্থিক কিছু রোজগার হয় স্বামী ও ছেলে ব্যবসায় করে (মুদি ও চা দোকান)। তবে তা লোকের ইচ্ছানুযায়ী। তিনি চেয়ে কোনো আর্থিক সুবিধা নেন না। মানুষ আরোগ্য হলে বা ভালো ফল পেলে স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তিনি গ্রহণ করেন।

আর্থিক সুবিধা রয়েছে যা লোকের ইচ্ছার উপর।

সংশ্লিষ্ট কাজে উপকরণ : একটা গামছা, বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় যেমন, বল্লা (বোলতা), বেঙ্গুল (ভীমরুল) ইত্যকার পোকার কামড় ঝাড়াতে দুটো বিশকাটালী গাছ,

www.pathagar.com

কুকুরের কামড় ঝাড়াতে হড়িক গীরা গাছ-বড়ি, সাপে কামড়ের ঝাড়ায় : উতলেঙ্গা গাছের শিকড় (তাবিজ পরে দেয়া হয়) একটা পাটের দড়ি (রশি)। একটা শক্ত মাদার কাঁটা।

ডায়রিয়া, হানাইয়া (ফক্স), লুতি, কালের দৃষ্টি, মুখে লালা পড়া, সিংয়ের (শিং মাছ) ঝাড়া, দুধের ঝারা, প্রসূতি, বিষাক্ত পোকা মাকড়ের কামড়/দংশন, সর্প দংশনয়ের ঝাড়া, কুকুর কামড়ের চিকিৎসা (ঝাড়া) ইত্যাদি।

চিকিৎসার ধরন : কোনো লোককে যদি বিষাক্ত কোনো সাপ, পোকামাকড় ও কুকুরে কামড়ালে সবাই চিকিৎসার জন্য তার কাছে ছুটে আসে। প্রথমেই তিনি মন্ত্র পড়া শুরু করে দেন। তারপর দুই হাতে একটা থাপ্পড় মেরে ডান কানে জোড় হাত রেখে বিষাক্ত প্রাণিটিকে বন্ধ করে ফেলেন, যাতে রোগির আর কোনো ক্ষতি হতে না পারে।

তারপর ঘটনাস্থলে গিয়ে চিকিৎসার ধরন তথা চিকিৎসার বিশেষ উপকরণ জোগাড় করেন। তারপর আক্রান্ত ব্যক্তির বা দংশনকৃত ব্যক্তির হাতের বা পায়ের একটা আঙুলে শক্ত একটা রশির একপ্রান্ত গিঁট দিয়ে বাঁধেন ও অন্য প্রান্ত ঝারা শেষ হওয়া পর্যন্ত একজন জোরে জোরে টানতে থাকে। তিনি একটা গামছার সাথে প্রয়োজনানুযায়ী উপকরণ যথা বিভিন্ন গাছের শিকড়, গাছ একত্র করে মাথার তালু হতে শুরু করে পুরো শরীরে কখনো বাড়ি দিয়ে, কখনো মুছে মুছে ঐ হাত বা পায়ের গিঁটের আঙুল পর্যন্ত নিয়ে আসেন। মুখে মনে মনে মন্ত্র জপতে থাকেন। এভাবে সারা শরীরে কয়েক বার ক্রিয়া করে গিঁট দেয়া আঙুলের মাথায় একটা মাদার কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে দেন। সাথে সাথেই বিষাক্ত রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে থাকে। ২ অথবা ৩ আবার ৫ অথবা ৭ ফোঁটাও হতে পারে। এরপরই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন, হাঁটা চলা করতে পারেন।

মন্ত্র : এক এক চিকিৎসায় একেক মন্ত্র। মন্ত্র কাউকে বলা বা শোনানো ওস্তাদের নিষেধ আছে। তাহলে মন্ত্র আর কাজ করবে না। তবে, যাকে শেখাবেন শুধু তাকেই মন্ত্র দেয়া ও শেখানো যেতে পারে।

মানুষের বিশ্বস্ততা সংস্কারের প্রভাব : গ্রাম্য সমাজে এসব চিকিৎসা, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্রের লোকবিশ্বাস এখনো সমান ক্রিয়াশীল। এ চিকিৎসার প্রভাব যথেষ্ট। শিক্ষিত ভদ্রজনেরাও এসবে বিশ্বাসী। ঢাকাসহ সারা দেশে শহুরে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজেও এ জাতীয় লোকজ চিকিৎসায় বিশ্বাস ও প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট।

মানুষ এ চিকিৎসাকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে।

আর্থিকমূল্য : আর্থিক মূল্য অবশ্যই আছে। অনেকে পেশা হিসাবে এই বৃত্তি নিয়েছে। জীবিকা নির্বাহ করছে।

ঐতিহ্যিক মূল্য : এ চিকিৎসার সামাজিক মূল্য রয়েছে এখনো মানুষ এ চিকিৎসাকে উপকারী ও ভালো মনে করে। অতীতের ঐতিহ্য হিসেবে এর সমধিক গুরুত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

চিকিৎসার নাম : হাড় ভাঙ্গা চিকিৎসা

চিকিৎসার ধরন : পাতা ঔষধ দিয়ে তিনবার ব্যান্ডেজ করতে হয়। ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে বাধ্য। প্রতিবার খুলে ড্রেসিং করতে হয়। ঠিকমতো না হলে সমস্যা হয়। অতি সাবধানতার সাথে বাঁধতে হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। পথ্যাদি ব্যবহার অপরিহার্য।

কবিরাজি

চিকিৎসা : গ্যাস্টিক, বাত, পক্ষাঘাত, কালাজ্বর, মূত্রনালির সমস্যা, হার্নিয়া, মহিলাদের সূতিকা, বন্ধ্যাত্ব ও জটিল বিবিধ সমস্যা, হাড়-গোড় জোড়া লাগানো।

ঔষধ-পথ্যাদি : ভেষজ। ক্ষেত্র ও প্রয়োজন বিশেষে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক।

মাসিক আয় : অনির্ধারিত। কোনো কোনো মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। কোনো মাসে বেশি আবার কোনো মাসে কম। রোগ ও চিকিৎসা অনুযায়ী।

কবিরাজ জালাল বেপারি জানালেন– পূর্ব-পুরুষেরা এ পেশায় জীবিকা নির্বাহ করতেন ও আজো লোকের সেবায় নিয়োজিত। শিখেছেন দাদা ও পিতার কাছ থেকে। মাসিক আয় অনির্ধারিত। আনুমানিক ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। বাৎসরিক আয় ৮০০০০ থেকে ১০০০০০ টাকা। সামাজিক মর্যাদা খুবই সম্মানজনক। পেশাকে মান্য করে। কর্মক্ষেত্র লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী।

লোকচিকিৎসক গিয়াসউদ্দিন। গিয়াস ডাক্তার নামে পরিচিত

স্থান : ফাজিল বেপারি হাট
চর পাগলা, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর
নাম : গিয়াস উদ্দিন ডাক্তার (৭০)
গ্রাম : চরপাগলা, ডাক : তোরাবগঞ্জ, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর।
পেশা : চিকিৎসক ও সমাজ সংস্কারক

এ অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাঁর সম্যক ধারণা আছে। তাঁর ছোট বেলায় দেখা ও জানা ইতিহাস, সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত : এ অঞ্চলে নদীতে চর দেয়ার পর ধীরে ধীরে পলি মাটিতে কিছু নোনা জমা ঘাস, কাচ্ছাবন গজে ওঠে। হাজারো রকমের পাখির ডাকে ও কিচির মিচিরে অন্য এক জগৎ মনে হতো। সে সব পাখি, দুর্বাঘাস, কাচ্ছাবন, গরু, মহিষ, ভেড়ার পাল, নাম জানা-অজানা জন্তু সবই বিলুপ্ত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মানুষ আর পাখির কণ্ঠের গানে অঞ্চলকে বেহেস্ত মনে হতো। ধীরে ধীরে পুরো চরাঞ্চল কাচ্ছাবনে ছেয়ে যায়। এক সময় কাচ্ছাবন ছাড়া কিছুই দেখা যেত না। ফাঁকে ফাঁকে দুঃসাহসী মানুষের দু-একটা বাড়ি ছিল। কোনও গ্রাম বা মহল্লা ছিল না। চোর-ডাকাত, দস্যু, জলদস্যুর অভয়ারণ্য ছিল এ অঞ্চল। নদীর কিনারে শুধু কিছু জেলেরা বাস করত। প্রতি বছর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে পুরো অঞ্চল ভেসে যেত। মানুষ, পশু-পাখি কলাগাছের মতো সাগরে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যেত। সাগরের ঝড়, চোর-ডাকাত, লাঠিয়াল, দস্যুর ভয়ে কেউ এ অঞ্চলে আসতে চাইতো না। দুচারটা দরিদ্র পরিবার মাত্র বাস করত। জোতদার বা সম্ভ্রান্ত বেশ কিছু পরিবার ছিল প্রবল প্রতাপে। তাদের অধিকাংশেরই লাঠিয়াল বাহিনী থাকত নিজস্ব। এ অঞ্চলে

www.pathagar.com

নদীর ভাঙ্গা-গড়া, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল। এছাড়া জোতদার লাঠিয়াল, ডাকাত, সামুদ্রিক দস্যু, চরমপন্থি এসব নিয়ে বলতে বা লিখতে গেলে কয়েক বছর লেগে যাবে। আর এগুলো বলার লোকও পাওয়া যাবে না। নতুন চর নিয়ে কাহিনী, লোকাচার, কাচ্ছাবন, বান, বন্যা, খরা, জমি দখল, চর দখল এগুলোর ইতিহাস লেখার কেউ ছিল না। শিক্ষিতজনেরা অঞ্চল ছেড়ে গেছে বহু আগেই। অশিক্ষিত, কবি, বয়াতি, গায়ক, বাদক কিছুই লিখে যেতে পারেনি। মুখে মুখে অত হাজার কাহিনী কত দিন থাকে আর। বয়াতিদের মধ্যে একমাত্র জীবিত আছে আবদুল হাশেম হাড়িয়া। এখন চলাফেরাও করতে পারে না। কথা মুখে বাজে। শয়ের কাছাকাছি বয়স হবে। তার সাগরেদও মারা গেছে প্রায় সবাই। সে রাতারাতি দলবল নিয়ে দেশের, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিয়ের গজল গাইত। বাজারে, উৎসবাদিতে লোকগান জারি, সারি, গেয়ে বেড়াত। ডাক্তার সাহেব বলে চলেছেন তাঁর ডাক্তারখানায় বসে। পাশে বাউলশিল্পী দুলাল হুজুর ও আরো দু-একজন প্রবীণ ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন অতীতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কাসুন্দি শুনে। সবাই নির্বাক। মাঝে মধ্যে সংযোজন করেন ও সায় দেন।

তখনকার দিনে শতাধিক বর্গমাইলের মধ্যে কোন ডাক্তার ছিল না। চিকিৎসা করত ওঝা, বৈদ্য, হুজুরেরা। কলেরা হলে পানি পান নিষিদ্ধ ছিল। হোমিও ঔষধ দিত ডাক্তাররা 'হুরিয়া' একমাত্র কলেরার ঔষধ। পানি পড়া, গাছ-গাছালির লতা, পাতা, শেকড় দিয়ে চিকিৎসা করা হতো। একবার তো হুরা অঞ্চল উজাড় হলো কলেরা, চিচকে। কাউকে মাটি দেয়ার কেউ ছিল না। কাচ্ছাবনে ফেলে আসা হতো। শেয়াল-কুকুর, হাইলডিতে খেতো। চৈত্র মাসের আগে মা-বাবা ছেলেমেয়েদেরকে খেতে বসলে বলত, 'বাবারা, খাইল, চৈত্র মাস আইয়ে কে বাঁচে কে মরে।'

একবার রামগতিতে বসন্ত (গুটি) ভয়াবহ আকারে দেখা দিলে এমদাদ হুজুর শিষ্যদের নিয়ে জিকির করে সারারাত। সকালে বাড়ির এককোণা দিয়ে বেরিয়ে আসে পরদিন হতে ঐ বাড়ির সবাই সুস্থ হয়ে ওঠে আর কেউ মারা যায়নি। হুজুরের কেরামতি প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তিনি তান্ত্রিক খোনার প্রেত, ভুত, জ্বিন-পরি, দেও-দানব আছর তাড়ান, এজাতীয় বহু চিকিৎসা করেন বলেছেন। মহিলাদের বিভিন্ন রোগেরও লোকিক চিকিৎসা করেন।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

তন্ত্রমন্ত্র-সদর

পিন্টু আচার্য মন্ত্র পড়ে জ্বিন, ভূত, দেও-দানো তাড়ান। কারো উপর এসব অপশক্তি আছর করে তিনি মন্ত্র পড়ে তাদের তাড়িয়ে দেন। ৮-১০ বছর ধরে এই বৃত্তি তিনি নিয়োজিত আছেন। এদের এলাকায় খোনকার বলে। পেশায় তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাড়ি কল্যাণপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর। তিনি কবজ ও তাবিজ দেন। কিছু মেয়েলি রোগের চিকিৎসাও করে থাকেন।

www.pathagar.com

খোনকার রহিম খোনার

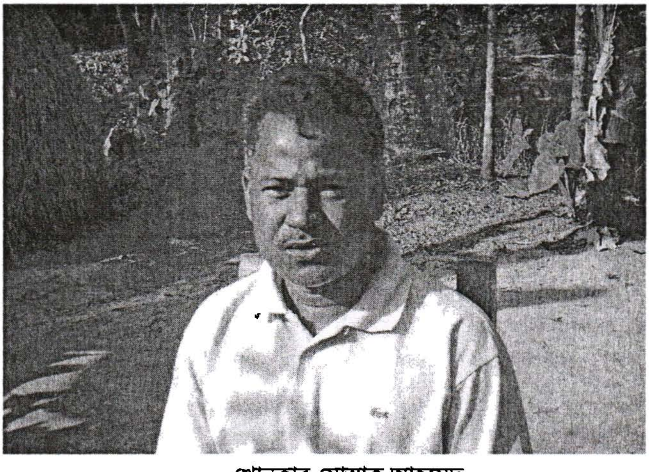

খোনকার মোস্তাক আহমেদ

খোনকার মোস্তাক আহমেদ ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত মার্জিত, রুচিবান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়ামোদী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী চমৎকার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। এত গুণের অধিকারী হয়ে এ নিরহংকার, প্রাণোচ্ছল ও হাস্যোজ্জ্বল মানুষটি পিতার পদাংক অনুসরণ করে কঠোর তন্ত্র সাধনা করেন। প্রয়াত পিতা বিশিষ্ট গুণিন জনাব জগা খোনারের নামে এখনো শিন্নি পড়ে। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে বৈকি! জীবিত অবস্থায় লোক জীবনে তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি ছিলেন। তিনি নাকি যে পথ দিয়ে যেতেন সেপথ তার সাথে কথা বলত এমনতরো বহুবিদ কথা এখনো লোকমুখে শোনা

www.pathagar.com

যায়। যৌবনে কামরূপ-কামাক্ষ্যা গিয়ে মন্ত্র ও তন্ত্র সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, তিনি ফুল ছিঁড়ে কোনো রমণির দিকে ছুঁড়ে মারলে জগতে হেন কোনো রমণী ছিল না তার পিছু নিতে বাধ্য হতো। লোকশ্রুতিতে আছে, জগা খোনার ভুত চালতেন। তাঁর আজ্ঞাবহ পেত্নী, ভুত-খেঁচড় ছিল। অসংখ্য কাহিনী, যা লোক সাহিত্যের তথ্য উপাত্তের আধার হতে পারে। একটি প্রবচন এখনো অসংখ্য মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

'জগার ভুতে কোরান মানে না।'

গুণিন পিতার যোগ্য অনুসারী জনাব মোস্তাক আহমদ বিভিন্ন বিষয়ে পিতার আদলে চিকিৎসা দিয়ে জনসেবা করে যাচ্ছেন।

তিনি চিকিৎসা করেন, বাতরোগ, বিরহ-বিচ্ছেদের মিলন, উম্মাদ, ভুতোম্মাদ, শারীরিক নানা ব্যাধি, বন্ধ্যাত্ব, পক্ষাঘাত রোগ। শারীরিক ব্যাধিতে তিনি আয়ুর্বেদী ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি (নানান ঔষধিবৃক্ষের মূল, পাতা, শিকড়, লতাপাতা) শাস্ত্রীয় মতে গ্রহণ করে থাকেন। উম্মাদ, ভুতোম্মাদ এর ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ও তন্ত্র পদ্ধতি, আধি ভৌতিক (ভুত, পেত্নী, জ্বিন, যক্ষ) এসব ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ তন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগ করেন। প্রয়াত পিতার কাছ থেকেই তিনি এসব চিকিৎসায় বুৎপত্তি অর্জন করেন ও তন্ত্রমন্ত্র শেখেন (আয়ুর্বেদী ব্যতীত)। তবে, আয়ুর্বেদিক ছাড়া অন্যান্য চিকিৎসাতে তিনি মানব সেবা হিসেবে বেছে নিয়েছেন বলে জানান। তাঁর কোনো চাহিদা নেই এসব চিকিৎসায়। মানুষ উপকার পাওয়ার পর তাঁকে সম্মান করে যাই দেয় তাই তিনি নিয়ে থাকেন। অনেক চিকিৎসার পর তিনি অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন বলে জানান ভুক্তভোগীও রুগীদের কাছ থেকে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাবিজ, কবজও দিয়ে থাকেন।

ভুত-প্রেত তাড়ানিয়া একটি মন্ত্র।

১. ওঝার ঝাড়ার তন্ত্রমন্ত্র

২. ভুত প্রেতের ঝাড়ন

৩. ওঁ কালো ভৈরব কাঠালী জটারাত দিন খেলে চৌপ কালো ভাস মুসান জেহি মাঁগু চোই পকড়া আন ডাকিনী শাকিনী ভিহারী জরখ চড়র্তী গোরখ মারী। ছোড়ী ছোড়িরে শাপন বালক পরায়্য গোরখনাথ কা পারওয়ানা আয়া"

৪. "ও পম : দীপ সোহে দীপ জাগে পবন চলে পানি চলে শাকিনী চলে

৫. হনুমান বীরের শক্তি আবার শক্তি ফুরো মন্ত্র ইশ্বরী বাচাঁ"।

৬. ভুত-প্রেত-নাশক

৭. মন্ত্র : জীরা-জীরা মহাজীরা জিরিয়া চালায়। জিরিয়া কি শক্তি সে ভুত/প্রেত/যোগিনী জায়ে।

৮. জিয়ে তো রম টলে ভৈহি তো মপান টলে।

৯. ভুত/প্রেত/যক্ষ/জ্বিন দোষ নামক মন্ত্র

১০. "ওম নমো আদেপ গুরু কো, লড়গড়ি সো মুহম্মদ পঠান, চরয়া শ্বেত ঘোড়া, শ্বেত পলান, ভুত বাঙ্গি প্রেত বান্দি চৌমঠ জোগিনী কান্দি, অড়সধ স্থান বান্দি, জোতুন বান্দে, তো পনী মাতো কি শৈষ্যা পর্র পাঁত্ত ধরে, মেরী ভরি গুরু কী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাঁচা"।

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধাঁ, হেঁয়ালি, শ্লোক

১. একবির, নয় শীর, গাছে ঝুলে হেই বীর : ঝিংগা (তরকারি, ছাকু সরকার, দিঘলী
২. ইঁয়ানতোন মাইলাম থাল, থাল গেল বরিশাল : চিঠি
৩. এ্যাতকাঁড়া, বেতকাঁড়া হিয়ার ভিত্তে সায়েবের বেটা : আনারস
৪. ইরে ভাই কানী, আল্লা তালায় মিলাই দিছে গাছের আগাত হানি : ডাব
৫. বুদ্ধি খাডাই বল না গাছের আগাত হৈল হোনা : পাকা খেজুর
৬. আঁর নানাগো বাইত গেছিলাম বেডি ওগগা সাদা কাপড় হিঁদি বোই রইছে : রসুন
৭. আঙ্গো এককান ঘর-দরজা নাই, চাইরও কিনারদি জানালা : মশারি
৮. বৃন্দাবনে আগুন লাগে কে নিবাইতো হারে : সূর্য

দরবারি শ্লোক /বিয়ের শ্লোক /আড্ডার শ্লোক, সদর

বিয়ের আসরে একসময় বরপক্ষকে প্রতি পদে শ্লোক ভাঙিয়ে বা শ্লোকের উত্তর দিয়ে অগ্রসর হতে হতো। কনের ঘরে ঢোকার সময় প্রথমে বন্ধ দরজায় আটকানো হতো। ভিতর হতে রসিক মহিলারা শ্লোকে শ্লোকে জর্জরিত করত এমনকি শাশুড়িপক্ষও শ্লোক ছুড়ে দিত। শ্লোক ভাঙার জন্য বরপক্ষ এবং শ্লোক দেয়ার জন্য কনেপক্ষ দক্ষ শিল্পী আমদানি করত বা হায়ার করে আনত। কনের ঘরে ঢোকা থেকে পিঠা পায়েস, ফল-ফলাদি খেতে উত্তর দিয়ে খেতে হতো সহজে এক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হতো না অনেক ক্ষেত্রে রাতও পোহাই যেত। এখন প্রচলন নেই। তবে লোকমুখে এখনো এগুলোর প্রচলন রয়েছে। অনেক আড্ডায় রসিক জনেরা এখনো চটিয়ে রসালাপ করে থাকে। তেমনি কয়েকটি শ্লোক নিম্নে প্রদান করা হলো :

কনেপক্ষ : আস্‌সামু আলাইকুম এন
দুলে আইছে বিয়া কৈত্তো আমনেরা আইছেন কেন?
বরপক্ষ : আচ্ছালামু আলাইকুম ওভা
দুলা আইছে বিয়া কইত্তো আমরা অইছে শোভা।
কনেপক্ষ : কিবা দেশে কিবা ছল
গাছের ভিত্তে হানির কল কিয়া?
বরপক্ষ : আখ।

www.pathagar.com

কনেপক্ষ : কিবা দেশে কিবা ছল
স্বামী থাকতে রাটীর ছল
সাধ্য থাকলে কথা বল।
বরপক্ষ : নিরোত্তর। কিবা কিবা ছল- কানের গোড়ায় হারিকল।

এইসব শ্লোকে উভয়পক্ষই ছুঁড়ে দিত প্রতিপক্ষ শ্লোক ভাঙাতে না পারলে হাসাহাসি ও হেনস্থার অন্ত থাকত না।

সবশেষে কনের ঘরের ভেতর থেকে একজন বলে উঠত, আমি চোখে দেখি না, কানে শুনি না দশ টাকা বিনে আমি দরজা খুলি না। এ প্রশ্নের পর দরজার বাইরে দাঁড়ানো বরপক্ষ নানা ভৎর্সনা করত ও আন্দা বয়রাকে খয়রাত দিলে সে কিভাবে নিবে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি চলত। শেষে দশ টাকা দিয়ে ধাক্কাধাক্কি জক্কি, জামেলা উৎরে ঘরে ঢোকার অনুমতি পেত।

এখানেও আরেক জামেলা। কনের সাথে সাথিরা বা মামাতো, চাচাতো, খালাতো বোন বউ সেজে এক সাথে বসে থাকত। বরপক্ষ কাকে বউ ভেবে কার বাম পাশে বসে সে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিত। বাকিরা চটকে যেত। এ পর্ব সারার পর আরেক উপদ্রব উপস্থিত হতো। সে হলো সাগরানা পিঠা। এখানেও শ্লোক ভাঙা বা কিচ্ছার প্রচলন ছিল। শ্লোক : তিন মাথা এক কান- কিচ্ছা ভাঙ্গাই হিডা খান। (চুলা) সব পিঠারই আলাদা আলাদা শ্লোক ছিল।

'জাগা-জমিন আরাই গিরস্থির ভা বুঝছি'

ব্যাখ্যা : প্রতিজনের একই রকম : মনুমাঝি সারাজীবন মাঝি ও ভবঘুরে জীবনযাপন করেছে। কখনো বাপ-দাদার ক্ষেতে নামেনি। ইরি ধানের প্রাথমিক অবস্থায় চাষাবাদে বাড়ির সম্মুখে পুকুর পাড়ে ৫ থেকে ৭ ডিসিম জমি মনুমাঝি ইরির আবাদ করেছে। ধান ফলেছে ৫ থেকে ৭ মন। বাজার ও গ্রাম থেকে অগণিত মানুষ এসে ধানের ক্ষেত দেখতে এসেছিল। মুনমাঝির উক্ত বিষয়ে খেদোক্তি : জাগা-জমিন আরাই গিরস্থির ভা বুঝছি। অর্থ্যাৎ পৈতৃক প্রাপ্ত জমি-জমা বিক্রি করে চলেছে ও শেষ করেছে। এখন কোনো ক্ষেত বা আবাদি জমি নাই। সখ করে ইরি ধানের গিরস্থি করেছে যা হয়েছে উৎপাদন তা কিছু দিন আগেও সবার ধারনাতীত ছিল। তখনো পর্যন্ত এ অঞ্চলে আউশ ও আমনের আবাদ হতো। কোনো বছর বন্যা, কখনো উর্বা, খরা, কখনো অতিবৃষ্টি। এরকম ৫ থেকে ৭ ডিসিম সাধারণত তখন ধান হতো কখনো ৮-১০ সের। খুববেশি হলে ১৫-২০ সের। ভাগ্য ভালো হলে সর্বোচ্চ ১ থেকে দেড় মণ। সেখানে ইরি হলো ডিসিমে একমণ। মানুষ চাইতে আসবে না কেন? আর তা-ই মনুমাঝির উক্ত খেদোক্তি। বাজারে প্রসঙ্গক্রমে শ্রুত একদা জকু হাজারীর ব্যাখ্যা-জিজ্ঞাসাক্রমে।

www.pathagar.com

দান মাইরছে মোর গুজা হুতে, টের পাইবো বো আডাই নিতে।

ব্যাখ্যা : ১. বিয়ের উকিলের চাতুরতা সে বরপক্ষকে কৌশলে কনেকে পরখ করে দেখতে না দিয়ে দূর থেকে দেখতে কৌশল নিল। আসলে কনে খোঁড়া অথবা ভালো মতো হাঁটতে পারে না। বরপক্ষকে বুঝাল যদি কনেকে ডেকে কথা বলতে চান তাহলে টাকা লাগবে, মিষ্টি আনা লাগবে ইত্যাদি খরচাদির ব্যাপার। তাই দূর থেকে একনজর দেখে পছন্দ করল। ২. অপর পক্ষে ছেলে গুজা। তাই তাকে দোকানে বসা অবস্থায় কনে পক্ষকে দেখাল খরচাদির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। তার ও মেয়ের দুর্বলতার কথা চিন্তা করে অত ঘাঁটতে যায়নি ওরাও যদি মেয়েকে পরখ করে। ধুমধামে বিয়ের পর ছেলের বাবা এ বিয়েতে জিতেছে বলে, আত্মকথন 'দান মাইরছে মোর গুজা হুতে, টের হাইবা বো আঁডাই নিতে।' অর্থাৎ আমিও ঠকি নাই আমার খোঁড়া মেয়েকেই গুজার কাছ বিয়ে দিয়েছি। যে খুব একটা হাঁটতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

যদি অয় সুজন এক্কই ঘরে নয় জন।

১. যদি অয় কুজন এক ঘরঅ নজন।

ব্যাখ্যা : অর্থ : পরিবারের মধ্যে নয় ভাই যদি সুনাগরিক হয় ও সাধুভাবে থাকে তা হলে একঘরে উভয়েই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে যদি সুবিধাবাদী ও দুশ্চরিত্রের কেউ হয় তাহলে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হয় ও তারা বিছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদাভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করে এবং ঝগড়াজাটি, কোন্দলে-কোন্দলে অশান্তিও অরাজক অবস্থায় দিনাতিপাত করতে বাধ্য হয়।

তথ্যদাতা : গোপাল চন্দ্র পাল, পিতা : গোবিন্দ চন্দ্র পাল, শর্ষে পাল বাড়ি, বয়স, ৫০ উর্ধ্ব, পেশা-কুমার।

২. যত ধুল তত হুল। অর্থ : হুল= ফুল

হাল চষতে জমিন যত বেশি চাষ মই দিয়ে মাটি মিহিন ও ঝুরঝুরে করা হবে, ক্ষেত ততবেশি ফসল ফলনের উপযোগী হবে। ফসলের শিকড় বাকড়, মূল আনায়াসে মাটি হতে খাদ্যরস গ্রহণ করতে পারবে ও নিজেকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করতে পারবে। এতে ফসল বা শষ্যে প্রচুর ফুল (হুল) আসবে ও ফলন সে পরিমাণ হবে। অর্থ হুল-ফুল।

তথ্যদাতা : আবদুর রশিদ (৪২), পিতা: বসু পাটারী, আহম্মদ উল্যাহ পাটারী বাড়ি, পূর্বে সৈয়দপুর, লক্ষ্মীপুর। তারিখ : ১.৪.১২

প্রবাদ

৩. হাগলে দরিয়া হাঁচুরী অইলেও হাগল টোগাইলয়।

অর্থ : হাগল-পাগল, হাঁচুর- সাঁতার, অইলেও- হলেও।

ব্যাখ্যা : যে-লোক যে প্রকৃতির সে-লোক সেই প্রকৃতির লোককে পছন্দ করে। তার মতো অন্যজনকে তার যেরকম ভালো লাগে, ভিন্ন ধরনের লোককে তত ভালো লাগে না।

হোলাহাইন কোন আন গেলে, হেই জাগার হোলাহাইন লোই খেলাধুলা, চলাহিরা করে, মাইঅলারা অন্যত্র গেলে হেই বাড়ির মাইঅলার লগে বোই গফ মারে, কতাবাত্তা কয়। বুড়ারা, যুবকেরাও হেই রকম (ছেলে মেয়েরা কোনো স্থানে গেলে, সেই স্থানের ছেলেমেয়ে সাথে নিয়া খেলাধুলা, চলাফিরা করিয়া থাকে। মহিলারা কোনো স্থানে গেলে

www.pathagar.com

সেই জাতীয় মহিলার সাথে বসিয়া গল্পগুজব কথাবর্তা বলে। বয়োবৃদ্ধ বা যুবকেরাও সেই রকম)।

গূঢ়ার্থ : যে কোনো পেশা নেশা বা প্রকৃতির মানুষ অনুরূপ মানুষকেই ভালোবাসে ও তার সঙ্গ কামনা করে।

তথ্যদাতা : এলাদার, পণ্ডিত বাড়ি, গোবিন্দপুরে দাশের হাট, লক্ষ্মীপুর।

প্রবাদ

কোটা কোটা মন্দুক (কোটি কোটি অজস্র অর্থে) মুক্তিযুদ্ধের সময় সিধা (হাবাগোবা) কিসিমের এক লোক ছিল। (আলম ডা. হাবিবুল্লাহ পণ্ডিতের ছোট ছেলে) সে মুক্তিযোদ্ধাদের বহর (কাঁধে রাইফেল) দেখে ঐ উক্তি করেছিল যা পরবর্তীকালে প্রবাদ বাক্য হয়ে গিয়েছিল,আজো অজস্র অগণিত অর্থে এ অঞ্চলে কথাটার প্রয়োগ হয়ে থাকে। তথ্যদাতা : মামুন আল রশিদ, পিতা : আবর আলী মাস্টার, পড়ালেখা বি এ, বয়স : ৪০, পেশা : ব্যবসা, মীরগঞ্জ বাজার, (গ্রাম : মীরগঞ্জ, ডাকঘর : মীরগঞ্জ) পানপাড়া বাজার : নামকরণ : অজ্ঞাত। এখানে কস্মিনকালেও কোনো পানের বরজ ছিল না। আজো নেই, পানের কোনো ব্যবসাকেন্দ্রও পূর্বে ছিল না। কি কারণে এ গ্রাম ও বাজারের নাম হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। তথ্যদাতা : আব্দুল হক (শতোর্ধ্ব) পিতা : নুরবকস বেপারী, গ্রাম-ডাকঘর : পানপাড়া।

৪. যেইধান উঁদুরে খাইছে- হেইধান অঅন হাইঅ না। অর্থ : যে ধান ইঁদুর খেয়েছিল (ক্ষেতে উৎপাদন ও গোলায় তোলন) সে (পরিমাণ) ধান এখন পাইও না।

ব্যাখ্যা : যে পরিমাণ ধান ক্ষেতে ফলতো, সে পরিমাণ ধান এখন কৃষকের ফলে না। প্রকারান্তরে ক্ষেতে ফলানো ধান কৃষকের বাড়িতে পাওয়া যায় না। কারণ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ক্ষেতি জমিন বাড়ি ঘর উঠেছে রাস্তাঘাট, হাট বাজার ও শহর বন্দরের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের কারণে আবাদি জমিন সংকুচিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণে কৃষকেরা জমি বিক্রি করে নিস্ব হচ্ছে। কৃষিজীবনে বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়ায় কৃষক এখন ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। আবাদি জমিতে গাছ বাগান করে চলেছে মানুষ (অধিক লাভের আশায়) জানালেন তথ্যদাতা।

তথ্যদাতা : পংকজ মজুমদার (৬৫) পিতা : পারী মোহন প্রয়াত, মাতা : চারুবালা (প্রয়াত), গ্রাম ও ডাকঘর : ভাদুর, পেশা : গ্রাম্য ডাক্তার। সংগ্রহ : প্রবাদ-প্রবচন,

৫. 'ডাইল ভাত কতরে ভাই, আঁইতো সরকারে খাই'।

অর্থ : ডাল ভাত (চাল অর্থে) কতরে ভাই আমিতো সরকারে খাই।

ব্যাখ্যা : জিনিসপত্রের দাম দস্তুর জানা। অন্যঅর্থ : বাস্তবে ও সংসারে সম্পৃক্ততা। ব্যাঞ্জনার্থ বা দ্বার্থকতা : সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্নতা, উদাসীনতা। তথ্যদাতা এ প্রবচনে বুঝাতে চেয়েছেন যা তিনি ব্যাখ্যাও দিলেন : সংস্কৃতি সাহিত্য বর্তমান সময়ে মানুষের ধ্যান জ্ঞান থেকে তিরোহিত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে মানুষকে ব্যস্তজীবন কাটাতে হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বা তার খোঁজ-খবর এখন আর রাখা সম্ভব

www.pathagar.com

নয়। জীবনের প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষ এখন কর্মব্যস্ত। ওগুলো করা এখন আর সম্ভব নয়। তার কথার গুঢ় অর্থ : আমার মতো (সংগ্রাহক) এসব কাজ (সাহিত্য সংস্কৃতি তথ্যসংগ্রহ) করতেই পারে। তার (তথ্যদাতার) মতো সামাজিকরা জীবন সংগ্রামেই নিয়ত ব্যস্ত। তাদের পক্ষে এসব নিয়ে মাথা ঘামানো বা সময় ব্যয় করা সম্ভব নয়।

৬. মাও নাই বড়বিও নাই : আল্লা তুইবিয়া

৭. 'মাও নাই বড়বিও নাই। আল্লা তুই বিয়া' বিয়ান বিয়ানো, সন্তান প্রসব করা, বাচ্চা প্রসব করা (প্রাণী অর্থে) ব্যাখ্যা : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীর সন্তান প্রসব করার সময় বাড়িতে কোনও মহিলা উপস্থিত ছিল না। ধারে কাছে পুরুষ ব্যতিত কোনও মহিলাও নাই। তার মাতা ও ভাবি বেড়াতে গেছে এমতাবস্থায় স্ত্রীর প্রসব বেদনা কাতর। উঠানে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে ও কাতরাচ্ছে। তাকে সেবা করা ধরা বা শুশ্রূষা করার কেউ নেই। স্বামী সরল মানুষ সে এ সবের কিছু বুঝে না বা কি সাহায্য স্ত্রীকে করতে হবে জানে না। স্ত্রীর বেকায়দা অবস্থা দেখে সে (সৃষ্টিকর্তার) আল্লার সাহায্যের ও কৃপার উপর নির্ভর করছে এবং দূরে দাঁড়িয়ে স্বগতোক্তি করছে। এ প্রবাদ উক্ত অঞ্চলে সচরাচর লোকে ব্যবহার করে থাকে হতবাক হাওয়া, অসহায় হওয়া বা কাউকে ব্যঙ্গ করতে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। তথ্যদাতার ব্যাখ্যা।

তথ্যদাতা : নাম : রহমত উল্যাহ (৫৫), পিতা : নুর মোহাম্মদ, মাতা : করফুলের নেছা (ধাত্রী) গ্রাম ও ডাকঘর : রতনপুর, লতুপাটারী বাড়ি।

৮. চ্যালেঞ্জ ধরা, বেড ধরা, সৈদ ধরা

সৈদ ধরা : কোনো কঠিন, দুঃসাহসিক কাজ করা, রস-রহস্য করা, যেমন— উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় হাঁটা, বাজারে যাওয়া আসা ইত্যাকার কর্ম। সাধারণ লোকের সাধ্যতীতে কোনও সামগ্রী খাওয়া (মাংস, ফলমুল) এতদ যাবতীয় বিষয়ে দুজনের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে (অর্থ, ঘড়ি, আংটি, মোবাইল, বা মূল্যবান কোনও সামগ্রী) এক সময়ে রেডিও নিয়েও বেড ধরার অনেক ঘটনা রটনা রয়েছে। বিনিময়ে ঐহিত্য রেওয়াজ এখনো কোনও সমাজে প্রচলন, অনুষঙ্গ রয়েছে। লক্ষ্মীপুর জেলার সর্বত্র এ রেওয়াজ এখনো বর্তমান। এ নিয়ে অতীতের অনেক অনুষঙ্গ ও প্রবাদ, প্রবচন, লোকশ্রুতি পাওয়া যায়। রামগঞ্জে (১৪.১০.১২ ইংরেজি) তথ্য সংগ্রহের জন্য গেলে তথ্য দাতার সাথে আরো ৮ থেকে ১০ জন ছিল স্থানীয় রসিক লোক। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সময় তথ্যদাতা আমার সাথেই সৈদ ধরে বসলেন, স্যার হেনজাসহ কেলা ইগুন খইতেন হাইরবেননি। দোকানে টাঙ্গানো ৭ থেকে ৮টি কলা ছিল। বললাম, আমনে হাইল্লেখান,আঁই হেঞ্জাসহ খাইতাম হাইত্তাম নঅ। আঁসি আঁসি কইলেন, আঁই খাইতাম হাইল্লে আমনে আঁরে কি দিবেন? আঁই কোইলাম কেলার দাম আঁই দিয়ুম-উনি কোইলেন ওইতো নঅ। হাঁছশ টিঁয়া দিবেন, হেলে খাইয়ুম। হেকুলে ব্যাকে আঁর দিগে চাই রোইছে। আঁই বুইঝতাম হারি নঅ দেই ব্যাকে মোছের হেরে হেরে আঁসে। পরবর্তীকালে রহস্য বুঝিয়ে দিলেন : হেঞ্জা অনেকের নাম রাখা হয়। হেঞ্জার আঞ্চলিক অর্থ চোবড়া। হেঞ্জাসহ বা সহকারে কেলা/কলা খাওয়া

www.pathagar.com

মানে কলার চোবড়াসহ ব্যঞ্জনার্থ হেঞ্জা নামক লোককে সাথে করে কলা খাবেন। তাতে সৈদে বা বেডে সে বিচারে জিতে যাবে, আমি হেরে যাব ও পেনাল্টি দিতে হবে। আঞ্চলিক হেঞ্জাসহ খাইতেন হাইরবেননি। অর্থ চোবড়াসহ খেতে পারবেন নাকি। আঞ্চলিক : কোইলাম, আমনে হাইল্লেখন,আঁই হেঞ্জসহ খাইতাম হাইত্তাম নঅ। আঁসি আঁসি কোইলেন, আঁই খাইতাম হাল্লে আমনে আঁরে কি দিবেন, হেলে খাইয়ুম। হেকুলে ব্যাকে আঁর দিগে চাই রয়েছে। আঁই বুইঝদাম হারিনঅ দেই ব্যাকে মোছের হেরে হেরে আঁসে। অর্থ : কইলাম। বললাম : আপনি পারলে খান, আমি হেঞ্জাসহ খেতে পারব না। হেসে হেসে বললেন, আমি খেতে পারলে আপনি আমাকে কি দিবেন, তাহলে খাব। সেখানে বেবাক/সবাই আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি বুঝতে পারিনি বলে সবাই গোঁফের (মোচ-গোঁফ) ফাঁকে ফাঁকে হাসে। (মুচকি হাসা) প্রবচন : কোইলে মায় মাইর খায়, নো কোইলে বাপে হারাম খায়। অর্থ : বললে মায় শাস্তি পায়, না বললে পিতায় হারাম খায়। ব্যাখ্যা : স্ত্রী স্বামীর জন্য ভাত বেড়ে রেখেছেন। কোত্থেকে আচম্বিত এক বিড়াল এসে পাতে মুখ দিয়ে ভাত খেতে লাগল। স্ত্রী বিড়ালের মুখ দেওয়া ভাত স্বামীকে খেতে দিয়েছেন : বিড়াল তাড়িয়ে স্বামীর অগোচরে। যা দেখে ফেলেছে মেয়ে। মেয়ে এ কথা খুলে বললে বা প্রকাশ করলে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করবে জিদের বশে অন্যদিকে পিতাকে বিষয়টা না জানালে পিতার ভাত খাওয়া হারাম হবে। বাঙালি সাংস্কৃতিতে কুকুর, বিড়াল বা কোনো পশু-পাখি খাবার জিনিসে মুখ দিলে তা না খেয়ে ফেলে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। উভয় সংকট অর্থে এ প্রবচনের প্রয়োগ হয়ে থাকো। এ প্রবাদ অন্য উপজেলায় ব্যবহৃত হয়। সে ক্ষেত্রে বিষয়গত বা বিবরণ ও কাহিনীগত পার্থক্য লক্ষণীয়। সে ক্ষেত্রে স্তন্য পানরত দুধের অনুষঙ্গ রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

মানুষ তার বোধের বাইরের জগৎকে খুঁজে পেতে চায় লোকবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। জীবনের দুর্বোধ্য রহস্য পরম্পরাগত লোকবিশ্বাস দ্বারা মোকাবিলা করতে চায়। যুক্তি সেখানে কোনো প্রকার কার্যকর প্রদক্ষেপ রাখতে পারে না। বিশ্বাস ও বোধের তাৎপর্যে কাঙ্ক্ষিত সত্য নিরুপিত হয়ে থাকে। এ কারণে লোকবিশ্বাসকে কুসংস্কারজাত হিসেবে গণ্য করা যায় না। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত অপেক্ষা সংহত সমাজ যেসব সংস্কারে বিশ্বাসী সেগুলোর প্রতি সঠিক গুরুত্ব আরোপ করে।[১] ব্যক্তিবিশ্বাস ও লোকবিশ্বাসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সংহত সমাজে মানুষের মনে স্থান না করে নিতে পারলে বিশ্বাস কখনও লোকবিশ্বাসে পরিণত হতে পারে না।[২] লোকসংস্কার বলতে বোঝায়– সেসব আচার-আচরণ এবং বিধি-নিষেধ যেগুলো পালনীয় অথবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, বরং ব্যবহারিক জীবনেও সেগুলো মেনে চলে।[৩]

ক. লোকবিশ্বাস

সৈয়দপুর, লক্ষ্মীপুরের মসজিদের ইমাম বিভিন্ন বিষয়ে পানিপড়া, তেলপড়া, কাছনপড়া, বাসনপড়া, বাটিচালা, কুকুরে কামড়ের তাবিজ, কবজ ইত্যাদি।

পানিপড়া : মুখদোষের পানিপড়া, গাছে ফল ধরার জন্য পানিপড়া, ভয় পেলে পানিপড়া।

তেলপড়া : শারীরিক নানাবিধ ব্যাধি সারানোর জন্য তেলপড়া, ভূত-প্রেতজনিত কারণে তেলপড়া।

কাছনপড়া : গরুর (গাভীর) দুগ্ধ যাতে আঁচিলা, সর্প বা কোনো কীটে না খায় তার জন্য কাছনপড়া। দুগ্ধ দোহনে গাভিকে বশ করানোর জন্য কাছনপড়া দেয়া হয়ে থাকে।

বাসনপড়া : পুরোগায়ে বিশেষ মন্ত্র লিখে তা ভুক্তভোগীকে ধয়ে খাওয়ানো হয়।

বাটিচালান : চোর ধরার জন্য কাঁসার খোরায় (পানি পানের পাত্রবিশেষ) তাবিজ লিখে তুলা রাশির লোক দিয়ে চালনা করা হয়। কাঁসা এক পর্যায়ে রক্ষিত কুণ্ডলী অতিক্রম করে সওয়ারকে নিয়ে ঘুরতে থাকে ও দৌড়াতে থাকে। যে লোককে ঐ পাত্র সনাক্ত করবে সে চোর বলে সাব্যস্ত হবে।

বাঁশচালা : দুটো বাঁশকে মন্ত্রপুত করে তুলা রাশির লোক দিয়ে চালনা করা হয়। বাটিচালার মতোই উক্ত বাঁশ সজোরে সওয়ারকে নিয়ে দৌড়তে থাকে ও চোরকে আক্রমণ ও আঘাত করে।

www.pathagar.com

আয়নাপড়া : এটাও চোর ধরা বা সনাক্ত করার একটা প্রক্রিয়া। কারো কোনো কিছু চুরি হলে খোনারের শরণাপন্ন হয়। আয়না পড়ে খোনার তুলা রাশির লোক দিয়ে আয়নায় চোরের গতিপথ, প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করে।

কুকুরে কামড়ানো : কুকুরে কামড়ানো ব্যক্তির পিঠে একটা কাঁসার পাত্র বসিয়ে মন্ত্রপুত একটা তাবিজ তাতে রাখা হয়। দংশনপ্রাপ্ত ব্যক্তি উঠানে বসে থাকে। ঐ অবস্থায় তার পিঠে বেশ কিছুক্ষণ ঐ পাত্র লেগে থাকে। এক সময়ে পাত্রটি গড়িয়ে পড়ে যায়। তখন নাকি ঐ পাত্র সমস্ত বিষ টেনে নিয়েছে ও বিষ শোষণের পর পাত্রটি পড়ে গেছে বলা হয়ে থাকে। কুকুরের বিষ ঝাড়ানো ব্যক্তি বা খোনার বিশেষ আরও বিভিন্ন পদ্ধতি বা রেওয়াজ বিদ্যমান আছে।

তাবিজ কবজ : বাচ্চারা শিশু বিছানায় প্রস্রাব করে, ঘুমের ঘোরে দাঁত কাটে, ভয় পায়, ঘুমের ঘোরে বকে, অথবা কান্নাকাটি করে ইত্যাকার বিষয়ে, তাবিজ, তুমার দেয়া হয়।

ভূত-প্রেত, পিচাশ, পরি, দেও-দানাব তাড়ানোর জন্য তাবিজ, কবজ দেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন রোগব্যাধি প্রশমন, মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া ইত্যকার বিষয়ে তাবিজ কবজের লোকজীবনে ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে।

ঘরবাড়ি করা : নতুন ঘরবাড়ি তৈরি করলে চতুষ্কোণে স্বর্ণ রুপা বা ছিটিয়ে দেয়ার রেওয়াজ আছে। বাড়ি বা ঘরের চারকোণে মন্ত্রপুত ও লিখিত চারটি বড়ুয়া (ঢাকনা) বেঁধে টাঙ্গিয়ে দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে।

সর্প খিলানো : কোনো ব্যক্তি বিষাক্ত সর্পকে আঘাত দিলে সে যাতে রাত্রে এসে ঐ ব্যক্তিকে দংশন করতে না পারে সেজন্য সর্প খিলানোর রেওয়াজ বিরাজমান। এতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

১. খের (খড়) মন্ত্র পুত করে তাতে নিয়মানুযায়ী গিঁট (৭টা) দেয়া হয়। সাপ উপরে থাকুক আর গর্তে থাকুক তাৎক্ষণিক সে নাকি ৭ খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যায়।

২. মন্ত্র পড়ে ধানকাটার কাঁচি দিয়ে গুণিন মাটিতে কয়েকটি (নির্দিষ্ট অংক) আঁক কাটেন তাতে সর্প নাকি ঐ রকম খণ্ডিত হয়ে যায়।

লিভার খিলানো : হজম শক্তি কমে গেলে। লিভার সমস্যা হলে তা সারানোর জন্য ওঝা বৈদ্যের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত মানুষ ভালো মানুষকেও দেখা যায় যাতে তার লিভার নষ্ট না হয় বা তাতে কোনো সমস্যা না হয় সে জন্য ওঝার শরণাপন্ন হতে দেখা যায়। জেলার বিভিন্ন লোকালয়ে তেমন একজন যিনি নানা বিষয়ে তদবির ও চিকিৎসা দিতেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁরই দুই ছেলে শেখানো বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা, তদবির দিয়ে থাকেন।

লিভার খিলানো প্রক্রিয়া : তিনি একটা কলাপড়া দিতেন (কাঁচকলা)। ঐ কলা চুল্লির উপর (যেখানে প্রতিদিন ভাত ও তরকারি রান্না করা হয় পাকঘরে (রসই ঘর) রশি দিয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হতো। অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ঐ কলা বেশ কয়েকটা বড় বড়

www.pathagar.com

খেজুর কাঁটা দিয়ে এফোঁড়, ওফোঁড় করে রাখা হতো। স্বচক্ষে অনেক বাড়িতে এমনকি আমার পাকঘরেও ঐ কলা দেখেছি। বিভিন্ন খোনার, ওঝা বৈদ্য অন্যান্য প্রক্রিয়াও ব্যবহার করে উক্ত বিষয়ে।

গোয়াল ঔষধি : দুগ্ধবতী গাভির ওলান চুষে দুগ্ধ পান করে থাকে কিছু সরীসৃপ, কীট। বিশেষ করে, দুধরাজ সাপ, দাড়াইশ, আঁচিলা প্রভৃতি। এতে গাভির দুধের বাঁট দষ্ট হয়, ফলশ্রুতিতে গাভির দুগ্ধ তার বাছুর খেতে গেলে ব্যথাজনিত কারণে গাভি ল্যাথি মারে, কৃষক দুগ্ধ দোহন করতে পারে না। এসব থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য নানাবিধ তাবিজ, কবজ, কাছনপড়া, তাত্ত্বিক পদ্ধতি যেমন বিভিন্ন ঔষধি গাছ লতাপাতা গোয়াল ঘরে দেয়া হয়ে থাকে। কখনো শুকনো বাইল (সুপারি গাছের শুকনো ডগা) টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। তেমনি একজনকে পেলাম যে কতগুলো লতাপাতা নিয়ে যাচ্ছে গোয়াল ঘরে দেয়ার জন্য। (ভিডিও ধারণকৃত)

খ. লোকসংস্কার

১. **নবজাতকের বিছানার পাশে লোহা রাখা**

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার বিছার পাশে লোহা বা লোহার তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখা হয়। এতে অশুভ শক্তি শিশুর কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

২. **পরীক্ষার আগে ডিম খেতে নেই**

লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে এখনও মায়েরা তাদের সন্তানদের পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ডিম খেতে দেয় না। কারণ, ডিম খেলে সন্তান তার পরীক্ষায় ডিমের মতো গোল শূন্য পায় কিনা এই ভয়ে।

৩. **শার্ট গায়ে রেখে বোতাম লাগানো**

শার্ট গায়ে রেখে সুঁই দিয়ে বোতাম লাগালে হাতে নাকি সুঁই বাত হয়।

৪. **মেয়েদের চুল যত্রতত্র ফেলতে নেই**

মেয়েদের মাথা আঁচড়ানোর পর ছিড়ে যাওয়া চুলগুলো কোথাও গুঁজে রাখতে হয়। যত্রতত্র ফেলতে নেই। কারণ, কেউ মেয়েদের চুল হাতের কাছে পেয়ে গেলে চুল নিয়ে জাদুটোনা করতে পারে।

৫. **নতুন শাড়ি পরে কোমর দেখতে নেই**

মেয়েরা যখন নতুন শাড়ি পরে তখন কোমরের দিকে তাকিয়ে কোমর দেখতে নেই। এতে নাকি তার স্বামীর অকাল মৃত্যু হতে পারে।

৬. **ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাথায় মারতে নেই**

ছোট ছেলেমেয়েদের মাথায় মারতে নেই। মাথায় মারলে নাকি তাদের বুদ্ধি লোক পায় এবং বিছানায় প্রস্রাব করে দেয়।

www.pathagar.com

৭. যাত্রাকালে খালি কলসি ও ঝাটা দরজার পাশে রাখতে নেই

ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হবার সময় খালি কলসি ও ঝাটা সামনে পড়লে যাত্রা শুভ হয় না। এতে নাকি যাত্রায় অমঙ্গল হয়।

৮. ছিঁড়া গেঞ্জি ও গামছা ব্যবহার ভালো নয়

ছিঁড়া গেঞ্জি ও গামছা ব্যবহার ভালো নয়। এতে নাকি অবস্থার অবনতি বা দিন দিন গরীব হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৯. হাত পায়ে ঝিঝি ধরলে দুই কানে কাঠি ব্যবহার করতে হয়

কারো হাত বা পায়ে ঝিঝি ধরলে দুই কানে দুটি কাঠি গুঁজে দিতে হয়। এতে ধীরে ধীরে হাত পায়ের ঝিঝি ভালো হয়ে যায়।

১০. যাত্রা পথে বাঁধা পড়া

বাড়ি বা ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও যাত্রাকালে কপালে বা মাথায় ঢুশ খেলে মনে করা হয় যাত্রা অমঙ্গলের লক্ষণ। সে ক্ষেত্রে যাত্রা বিরতির নজিরও দেখা যায়।

১১. রবিবারে বাঁশ কাটা যায় না

রবিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ। রাত্রিবেলায়ও। বিশেষ প্রয়োজনে যেমন মৃত ব্যক্তির সৎকারে শুধু কাটা দুরস্ত আছে।

১২. হাঁচি দেয়ার পর আল-হামদু-লিল্লাহ বলা

হাঁচি দেয়ার পর আল-হামদু-লিল্লাহ পড়া হয়।

১৩. শনি ও মঙ্গলবার (বিদেশ) যাত্রা অমঙ্গল হয়

শনি ও মঙ্গলবার বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে নাকি বিদেশ যাত্রা শুভ হয় না। তাই শনি ও মঙ্গলবার বিদেশ যাত্রা অমঙ্গল।

১৪. ভয় পেলে বুকে থুথু দেওয়া

কোনো কারণে ভয় পেলে বুকে তাৎক্ষণিক থুথু বা ছেফ দেয়া হয়।

১৫. বড় খতমের দোয়া পড়া

নিশিরাত যাতায়াতের পথে ভয় পেলে দুই হাতে তিন থাপ্পড় দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এসে মুসলিমরা বড় খতমের দোয়া বা বিভিন্ন দোয়া দরুদ পড়ে গলা খাঁখারিয়া দিয়া তারপর অগ্রসর হয়।

১৬. কোমরের ধাগা ছিঁড়ে ফেলা

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাবিজ, টোনা করার আশঙ্কা থাকলে কোমরের ধাগা ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। কোমরে তাগি বা ধাগা না থাকলে নাকি তাবিজে কাজ করে না।

www.pathagar.com

দাঁতের পিঠা : বাচ্চাদের দাঁত উঠলে নানা-নানি কর্তৃক দাঁতের পিঠা পাঠানোর রেওয়াজ রয়েছে জেলায়।

মুসলমানী : শিশুদের মুসলমানী বা খৎনা করলে নানা, মামা, ফুফা, খালা বিশেষত মাতৃ-বংশীদাররা নতুন জামা কাপড়, খেলনা ইত্যকার বিষয় কিনে দিতে হয়। অনেকে গরু, ছাগল দিতেও দেখা যায়।

মেয়েরা সাবালক হলে বিশেষ অনুষ্ঠান করে প্রতিবেশিদের দাওয়াত করার প্রচলন ছিল।

ঝড়-তুফানের সময় (বিশেষ পরিস্থিতিতে) বাড়ি-বাড়ি আযান দেয়ার সংস্কার রয়েছে। প্রচুর শিলা বৃষ্টি হলে উঠানে খুদ, কুঁড়া, চাল, পাটা-পুতা, পিড়া ছুঁড়ে দেয়ার রেওয়াজ আছে। বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে খাট, চৌকির নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়।

ঠাডা বিজলিপাতের সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ জিকিরের রেওয়াজ প্রচলিত।

যাত্রাকালে খালি কলসী দর্শন অমঙ্গল, কুলক্ষণ।

কোনো তত্ত্বকথা বা পৌরাণিক কথা বলতে যদি টিকটিকি টিক টিক করে ডেকে ওঠে– তাৎক্ষণিক দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয় উই হুনেন টিকটিকিও কয় ঠিক ঠিক। তত্ত্বের সঠিকতা বা সত্যার্থে।

হলুদ পাখি ডাকলে মেহমান আসে।

মুরগিতে ঝগড়া বাঁধতে দেখা গেলে মেহমান আসবে।

প্যাঁচায় ডাকা সৌভাগ্যের লক্ষণ (অন্যমতে অসুখ, মহামারী ও দুর্ভোগের লক্ষণ)।

শেয়ালে উড়াল দিলে বিপদের লক্ষণ।

চৈত্রের শেষদিন আমের বীজ যায়।

কাটা মাসে বিয়ে হয় না। কোরবানির ঈদের পর প্রায় একমাস।

যাত্রাকালে পিছু ডাক কু লক্ষণ।

বর কনের গোছলের পানি, ছুলে ভদ্রা বাড়ে।

আটকড়ি : এ সংস্কার কয়েক ধরনের

১. নাতি, নাতনির দাঁত উঠলে নানা, মাসি কর্তৃক প্রদত্ত।

২. নতুন বধূর কাঁপড়ের খোঁটে আটকড়ি বেঁধে দেয়া হয়। বাপের বাড়ি হতে শ্বশুর বাড়ির প্রথম যাত্রায় যাতে তার স্মৃতিশক্তি অটুট থাকে। প্রয়োজনীয় কথা ভুলে না যায়।

৩. ভুত-প্রেতে পেলে তেপান্তরে বা তেপথের মাথায় (ভোগ দেয়া বলে) আটকড়ি : (চালের) কড়ি, ডাল, ছৈদ্দানা (সিমবিচি) কোমড়ার দানা (বিচি) কদুর দানা, শশীন্দার দানা (আট উপাদান ভেজে একসাথ করা হয়।)

www.pathagar.com

নববধূ স্বামীর বাড়ি যাওয়ার সময় বিভিন্ন প্রকার ফল মূলের বিচি ও বিজ সাথে দেওয়া হয় স্বামীর বাড়িতে উৎপাদনও উন্নতির জন্য।

শিশুদের দাঁত পড়লে কখনো পুকুরে মাছের উদ্দেশ্যে, কখানো বা ইঁদুরের গর্তে উৎসর্গ করা হয় তাদের চিকন দাঁত প্রাপ্তির জন্য। শ্লোক : মাছ ভাই, আঁর মোডা দাঁতগা নি আঁরে তোমার চিকন দাঁতগা দিঅ। ইঁদুর ভাই, আঁর মোডা দাঁতগা নি আঁরে তোমার চিকন দাঁতগা দিস।

ফলজ গাছে মুখ নালাগার জন্য পিছা (ঝাড়ু) বা জুতাকাটা টাঙ্গিয়ে দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে।

রাত্রিবেলা সুই বেচা-কিনা নিষিদ্ধ।

তেঁতুলগাছ, চালতাগাছ, তালগাছ, বাঁশঝাড় এগুলোতে ভুত-প্রেত্নী, দেও-দানব বাস করে বলে বিশ্বাস রয়েছে। তাই সচরাচর ঘরের আশেপাশে ঐ জাতীয় গাছ খুব একটা লাগানো হয় না।

তথ্যদাতা : ইমামুদ্দিন, পিতা : হাফেজ আবদুর রশিদ, সাং : সৈয়দপুর, ডাকঘর : রূপাচরা, লক্ষ্মীপুর, বয়স : ৬৫, ধনুমিয়া হাফেজ বাড়ি।

সুফিয়া বেগম, স্বামী : আবদুল হাই, সাং : সৈয়দপুর, ডাকঘর : রূপাচরা, আবদুল হক মুন্সী বাড়ি, সদর, লক্ষ্মীপুর, বয়স : ৬২।

মনোরথ (যুথবদ্ধ) সর্প মারা ঠিক নয় এতে ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় কোনো প্রাণিকে আঘাত করা গুনাহ হয়। এ নিয়ে অনেক জনশ্রুতি রয়েছে।

প্রতি বাড়িতে একটি করে বাড়ি পাহারা সাপ রয়েছে। যারা কোনো ক্ষতি করে না। আসলে সাপের ছবি ধরে জিন থাকে এরা সাধারণত কবরস্থানের আশে পাশে থাকে।

মুখলাগা বা মুখদোষ বলে জেলার লোক সমাজে প্রচলিত ধারণা রয়েছে। তার বশবর্তী হয়ে ইকবাল হোসেন (তামীম) কাঁঠাল গাছে ঝাড়ু বা পিছা টাঙ্গিয়েছে। কারণস্বরূপ সে জানায় নতুন চারাগাছ বা ফলন্ত গাছে যখন ফল ধরে তখন মুখ না লাগার জন্য ছেঁড়া জুতা, ঠুণ্ডা হিছা (পরিত্যক্ত ঝাড়ু) বা পুরানো হাঁড়িতে চুন-কালির ফোঁটা দিয়ে গাছে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। মুখ দোষের কারণে নাকি ফল ঝরে যায় বা ফল নষ্ট হয়ে যায়। সে একথা মহিলাদের কাছে শুনেছে ও অনেক অনুরূপ চিত্র পাওয়া গেছে।

বাড়ির আঙ্গিনায় সাগর তার লাগানো লাউ ও কুমড়া ক্ষেতে দুটো খুঁটি গাঁড়িয়ে দুটো পরিত্যক্ত জুতা (কাড়ুয়া জুতা) ঝুলিয়ে রেখেছে। তারও বক্তব্য একইরকম। জেলার প্রতিটি জনপদে এ বিশ্বাস ও লোকাচার বিদ্যামান।

www.pathagar.com

আদি-ভৌতিক (জ্বিন-পরি, দেও-দানব, পিচাশ-ভুত-প্রেত)

জ্বীনে পাওয়া জৈধনের লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার ও তদ্‌বির লোক চিকিৎসা

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা লোকবিশ্বাস, সংস্কার নানা আবহ ও দিক লোকজীবনে এখনো সক্রিয় রয়েছে।

গ্রাম্য বা লোকজীবনে এখানো তাবিজ, কবজ, পানি পড়া, তেলপড়া, নুনপড়াসহ নানা আচার ও তন্ত্রমন্ত্র লোকচিকিৎসা, আদি ভৌতিক বিষয়াবলিতে বিশ্বাস, ক্রিয়া যেমন জ্বিন পরি, দেওদানব, ভুত-প্রেতনি-পিচাশে পাওয়া এগুলো তাড়ানো বন্দি করা, চালনা, চোর ধরা বাটিচালা, বাঁশডলা, পুতাপড়াসহ অসংখ্যা সংস্কৃতি, কুকুড়ে কামড়ানো, মানুষের লোকচিকিৎসা, বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ানো, সর্প দংশনের নানাবিধ চিকিৎসা প্রচলিত রয়েছে।

জেলার সর্বত্রই আদি ভৌতিক প্রাণিতে বিশ্বাস, আলামতের তান্ত্রিক ও নানা মাত্রিক চিকিৎসা, তদবির দেখা যায়। জেলার প্রায় প্রতিটি জনপদে, গ্রামে এতদ্‌বিষয়ক ওঝা, বৈদ্য, খোনার, চিকিৎসক রয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে যারা এ পেশা দেদারছে চালিয়ে যাচ্ছে যার উপর বেশ কিছু প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এক্ষণে কথিত পরীতে পাওয়া জনৈক জৈধনের (একজনের নাম) উপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন উল্লেখ করা হলো।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জৈধন, পিতা মৃত: ফাজিল মিয়া, সুলতান মৌলভির বাড়ি, পূর্ব সৈয়দপুর, লক্ষ্মীপুর, পেশায় জেলে। ছেলে ও মেয়ে ৮ থেকে ১০ জন। তিনদিন আগে সে পার্শ্ববর্তী

www.pathagar.com

কুশাখালীতে মাছ ধরতে যায়। হঠাৎ জাল ফেলে নিকটবর্তী তাল গাছে উঠতে থাকে। সাথের লোকজন ধস্তাধস্তি (হাতাহাতি) করে নামাতে চায় সে বাগ মানে না। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে পাতরে মাটি বা বালি খুড়তে থাকে। লোকজন অনেক কষ্টে তাকে বাড়িতে নিয়া যায়। এর পূর্বে আরো নাকি তিন চার বার তার এ দশা হয়েছিল। খোনার খলিফা দিয়ে তদবির করার পর প্রমাণিত হয়েছে বলে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা জানায়। তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা আজ থেকে বছর বিশেক আগে জৈধন মাছ ধরার কাজে ননিয়ার চর রাঙ্গামাটিতে কয়েক বছর ছিল। সেখান থেকেই তার এ দশার উৎপত্তি। সেখানে নাকি একদিন সে কবরস্থানে প্রস্রাব করেছিল এবং পানি খরচ করে নাই। যে কারণে তার উপর পরীর আছর হয়েছে। সেখানে জনৈক গুণিন এর চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেছে। এরপর দেশে আসার পর কয়েকবার তার অনুরূপ দশা হয়েছে। আজ পরীতে পাওয়ায় জনৈক ওঝা ঝাড় ফুঁক করেছে, কাজ হয়নি। তার সাথে নাকি পরী মাংসী হয়ে আছে। জনৈক ওঝার (মহিলা) মতে পরি নাকি তাকে নিয়ে যেতে চায়। সে ও ঝাঁড় ফুঁক করছে উপস্থিত পাওয়া গেল তাকে। পাশাপাশি দেখা গেল পরীকে তাড়ানোর জন্য গরুর হাড্ডি (হাঁড়) পুড়িয়ে রুগির নাকে তার ধুঁয়া দেয়া হচ্ছে। শুকনো মরিচ পুড়ে নাকে মুখে ধুয়া দেয়া হচ্ছে। (ভিডিও ধারণকৃত)

রোগীকে একটুপর জনৈক ওঝা এসে রুগিকে জেরা শুরু করল সে চলে যাবে কিনা বা কি নিয়ে যাবে। এরই ফাঁকে কাঁথার সুতা দিয়ে রুগির বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নখ বাঁধা হল। ফরমায়েশ দেয়া হলো বর বাঁশের জিংলা (কাঞ্চি) আনার জন্য। তাৎক্ষণিক বাগান থেকে বরবাঁশের একটি কাঁচা (কঞ্চি) এনে চার আঙুল পরিমাণ তিনখণ্ড করা হল। বাম হাতের তিন আঙুলের ফাঁকে তিন খণ্ড কঞ্চি লাগিয়ে চিপদেয়া শুরু হল। পাশাপাশি তেলপড়া চোখে মুখে অকাতরে ঘষামাঝা চালানো হলো। রুগির ছটফটানি ভীষণ বেড়ে গেল। এরই মধ্যে একটা শিশি (খালি বোতন) আনা হলো ও রুগিকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে (পরী) যাবে কিনা, কি নিয়ে যাবে সে একবার বলে এটা নিয়ে যাবে, একবার ওটা একবার অমুককে নিয়ে যাবে বলে। রুগির অবস্থা বেশ কাহিল। ওঝা বলে পিছা নিয়ে যেতে, না হলে তাকে বোতলে বন্দি করা হবে।

নমুনা : জনৈক বড় হুজুর (দুলা মিয়ার বাড়ির) ভূতে পাওয়া লোকের চিকিৎসা করতেন এভাবে। ভূতগ্রস্ত লোক তার পাশে অদুরে কুণ্ডলী আঁকতেন মাটির উপর বৃত্তাকার উঠানে বসিয়ে তারপর বাঁশবন থেকে একমুঠো কাঁচা বাঁশের কঞ্চি (বড় বাঁশের) কেটে এনে ঐ কঞ্চিতে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে ভুত তাড়ানিয়া দোয়া দরুদ পড়তেন এবং এ কঞ্চি দিয়ে কুণ্ডলীর ভেতর মাটির উপরে পূর্ণ এ শক্তি প্রয়োগ করে পিটতে থাকতেন। ভুতগ্রস্ত ব্যক্তি চিৎকার করতে থাকত তাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য। আশ্চর্যের বিষয় যতগুলো বেত হুজুর মাটিতে মারতেন ততগুলো বেত্রাঘাতের দাগ রুগির পিঠে (বাইঃউলি থাকত) স্পষ্ট দেখা যেত। এমনি অবস্থায় হুজুর নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন কোথা থেকে ঐ ভুত এসেছে, নাম ধাম কি, কি কারণে রুগিকে ধরেছে। প্রতুত্তরে ভুত

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তর দিত। এ অবস্থায় নানা লোকের বিভিন্ন সমস্যা, জটিলতার কথা হুজুর প্রশ্নাকারে করতেন ও ভুত জবাব দিয়ে যেত। হুজুর তাকে জেরা করত ছেড়ে গিয়ে আর আসবে কি না, ভুত বলত আর কখনো আসবে না। রুগী তার যাতায়াতের পথে খেইনে পড়েছে বলে সে তাকে ধরেছে। কখনো কোন ভুত বলত ঠিক দুপুর বেলায় বাঁশতলে গ্রস্তকে পেয়েছে, কখনো বলত সন্ধ্যার সময় তার খেইন পড়েছে, কখনো বলত ছনক্ষেতে তালগাছ তলে দিয়ে দুপুর লোক আসার সময় তাকে পেয়েছে, কখনো চালতাগাছ, তেতুলগাছ, তুলাগাছে তারা থাকে বলে জানায়। অবশেষে ভুত জুতা, পিছা, বা আমের ডাল মুখে করে নিয়ে সমস্ত লোককে ফেলে চলে যেত। ওটা যাবার পর এক সময় অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে যায়। কয়েক ঘন্টা পর আস্তে-আস্তে জ্বিনে ধরা লোক চেতন হয় ও ধীরেসুস্থেই ভালো হয়ে উঠে। এসব তাড়ানিয়া বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রমন্ত্র প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এখনো লোকজীবনে চালু আছে।

বচন (কলেরা, চিচক, ওলাওঠা ও ডায়রিয়া)

এক সময় মনে করা হতো সমাজে, জনপদে, পৃথিবীতে পাপের বোঝা ভারী হলে বিধাতা রুষ্ট হয়ে বিভিন্ন মহামারি প্রেরণ করে থাকেন। লোককে বুঝানো ও সৎপথে আনার জন্য। এসব নিয়ে নানা গুজব রটনা হতো যা সংগ্রহ জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে, এখনো এসব মতবাদ প্রচলিত রয়েছে লোকজীবন নদীভাঙা অঞ্চল, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, নতুন জনপদ, পুরোনো বাগবাগান, মসজিদ, মন্দির, নতুন চর ইত্যকার অঞ্চলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও এসবের জন্ম হয়ে থাকে, অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটলে বা দৃষ্ট হলেও এগুলোর জন্ম হয়। আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর পূর্বে তথা পঞ্চাশের মতান্তরে দেশের অর্ধেক মানুষ কলেরা, ওলাওঠায় মারা গিয়েছে বলে শোনা যায়। শাবল, খন্তা হাত থেকো থোয়া বা রাখা যেত না। প্রতি মুহূর্তেই মানুষ মারা যেত। অনেকের বংশে বাতি দেওয়ার মতো কোনও ব্যক্তিই জীবিত ছিল না। অনেক গ্রামে একজন মানুষও জীবিত ছিল না বলে কথিত আছে। সেলাইন আবিষ্কারের পূর্বে এ অবস্থা সারা দেশেই বিরাজমান ছিল। আজ থেকে (৩০/০৩/১২ ইং) ১০-১৫ বছর পূর্বেও চৈত্র বৈশাখ মাস এলে কলেরা, ডায়রিয়া ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ত। তখন যে সব বাড়িতে এ রোগ সে সব বাড়িতে পির ফকির এনে সারারাত এমনকি দিনেও জিকির আজকার করা হতো। সন্ধ্যার পর, ভর-দুপুরে মানুষ বাড়িতে বের হতো না বা চলাফেরা করত না। এসব নিয়ে নানা কথা কাহিনী প্রচলিত ছিল।

যেমন, এক লোক বাজার থেকে আসার সময় তিন মাথার মোড়ে দেখে একটা ছোট মেয়ে বসে বসে কাঁদতেছে, সে মেয়েকে কান্নার কথা জিজ্ঞাসা করলে মেয়ে কোনো উত্তর দেয় না বা অন্য পথে হেঁটে চলে যায়। ঐ লোক বাড়িতে আসার সাথে সাথে তার বমি শুরু হয়। এরপর সে মারা যায়। শুরু হয় পুরো বাড়িতে তাণ্ডব ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরূপ নানা গুজব কাহিনি লোক জীবনে প্রচলিত ছিল ও আছে। এর

www.pathagar.com

প্রতিকারের জন্য সকিনা খতম পড়ানো, ঘরে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত, আযান দেওয়া, বড় খতমের দোয়া-দরূদ পরিবারের সবাই মিলে পড়া ও জিকিরের অঞ্চল বিশেষে এখানো রেওয়াজ আছে।

সংগৃহীত রচনা, বচন ও জিগির

১. লা-ইলাহা, ইল্লাল্লাহু (২)
মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।
বিসমিল্লাতে গাছের মূল,
গাছে ধরে গোলাপ ফুল,
পাতায় পাতায় ঝিকির করে আল্লাহু রাসুল।

২. সামিরুন বাছিরের নাম
বোলকা পির রে হযরত আলী,
মাইরবো তোরে কড়ার বাড়ি,
তুই যাবি চিক্কুর ছাড়ি,
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

৩. আলীর আতঅ ঢাল তলোয়ার,
ফাতেমার আতঅ তীর
যেইমুইতোন (যেখান থেকে) আইছত বলা,
হেইমুই (সেই দিকে) যাগৈ হির।
লা-কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
চোলেমান পয়গাম্বরের আশা,
আলীর আতে খাঁড়া (২)
যেই দিগ দিয়ে আইছত বলা,
হেইদিগ দিয়ে যায়,
কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।
রাত ৪.২৫ মিনিট
৩০/০৩/১২
সংগ্রহ : শ্রুতি, স্মৃতি
মহিউদ্দিন দুলাল, এমদাদ হোসেন, পাগলার চর, কমলনগর।
জবি উল্যাহ দরবেশ, পিতা : ছলিম শাহ, মোল্লাবাড়ি, গোরারবাগ, লক্ষ্মীপুর।

সংস্কৃতি ধান শুকানো (পাকা সড়কে)

নাম : গিরিবালা রাণি দাস (৪০) স্বামী : বিরীন্দ্র নম দাস, গ্রাম : পশ্চিম চণ্ডীপুর, ডাকঘর : চণ্ডীপুর, রামগঞ্জ (মাদ্রাসা সংলগ্ন আলামিন মাদ্রাসা) সড়কে শুকানোর কারণ বাড়িতে জায়গা নেই। উঠোন নাই। লোকসংখ্যা বাড়ার কারণে ঘর-দুয়ার হয়ে গেছে

www.pathagar.com

তাই ধান শুকাতে দিয়েছে পাকা সড়কে। সমস্যা : অনেক গাড়ি বিছানো ধানের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়া হয়। এতে অনেক ধান ছিটকে রাস্তার পাশে ও নিচের ক্ষেতে পড়ে যায়, আবার কুড়িয়ে আনা সম্ভব হয় না। সুবিধা : প্রচুর রোদ পাওয়া যায় ও মোরগ তাড়াতে হয় না।

একই চিত্র পাওয়া যায় রাস্তায় ধান শুকানোতে। সমস্যা একই রকম জানালো দুই কিশোরী। এখানে সিএনজি সমস্যা নেই। গ্রাম : ভাদুর, ডাকঘর : ভাদুর, রামগঞ্জ।

প্রেত বিষয়ক : নাম : আবুল বাসার, বাবা : নুর মিয়া, বাড়ি : শাইরা বাড়ি, গ্রাম : নন্দনপুর, ডাকঘর : রামগঞ্জ, বয়স : ৫৩, পেশা : কৃষিকাজ। স্পট মির্জাবাড়ি, গ্রাম : কাজীরখিল, ডাকঘর : রামগঞ্জ, লোকশ্রুতি রয়েছে যে, মির্জাবাড়ির পাশের খালে ৭টা পায়খানা আছে। এখানে পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন হিন্দু বাড়ি ছিল। লোকশ্রুতি রয়েছে এখানে ভুত প্রেতের আড্ডা ছিল। অতীতে বহু ধরনের কাহিনি ঘটেছে এখানে।

লোকশ্রুতিতে পাওয়া যায়। আজ ১৯/১০/১২ রাত সাড়ে এগারটার সময় জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় হঠাৎ দেখতেছি কিসে যেন গাছ গাছাড়া ভাঙ্গি চুরমার করিতেছে। আমি তাদেরকে উদ্দেশ্যে করি বলি তোগোরে কি ভুতে হোঁদায়নি। এ ভোড় বলার পর তারা আঁরে আক্রমণ করিতে চাইছে। হারে ন কারণ আঁর আতঅ বালুগছা আছিল। এ এক ফাঁকে তারা আম গাছের ঠাইলা কয়েকটা ভাঙ্গি হালায় ও একটা নাইল 'গাছ গোড়াসহ উগাড়ি হালাই দিছে। পরে সকালে যাই দেখি ঐ গাছগুলো ভাঙ্গা ও উগাড়িইন্না।

ক্ষেত মজুর : দৈনিক মজুরি : ৪০০/- সময় : সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা।

পুরুষ লোকসংখ্যা ০৮ জন। বাকি সবাই অকর্মা। দৈনিক ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা। দৈনিক ঋণী নাই। কিস্তি নাই। শুধুমাত্র কৃষিশ্রমিক।

নাম : হাবিবুর রহমান, পিতা : মৃত. আব্দুল মালেক, গ্রাম : বাঁশঘর (উত্তর) ফকির বাড়ি, ডাকঘর : রামগঞ্জ, বয়স : ৪৫, পেশা : কৃষিকাজ, দৈনিক সকাল ৮ থেকে ৪টা, দৈনিক মুজুরি : ৪০০/-, দৈনিক ব্যয় ৩৫০ থেকে ৪০০/-, পরিবারে লোকসংখ্যা : ৫জন। আয়ের বা উপার্জনের আর কেউ নাই। ছৈয়ালি কাজ করে থাকেন। কাজ পেলে ঘর তৈরি। মানুষ এখন দালান কোঠা করে, ছৈয়ালি পাওয়া যায় না। ঋণ বা কিস্তি নাই। ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা ধার-কর্জ আছে। দুই জনেরই জায়গা জমি নাই। ভাড়া বাড়িতে থাকে। দুঃখ করে বলে, 'মানুষ ঈদে চাঁদে কত রঙ বেরংয়ের কাপড় হিঁদে লোক পেশাজীবী– গাছি/ ছৈয়াল আমরা যেইটা হিঁন্দি কাজ করি হেইটা হিঁন্দি ঈদ করি'। প্রসঙ্গত কোরবানি ঈদের আর ৭ থেকে ৮দিন বাকি।

হাটবাজার রূপান্তর স্থান : মীরগঞ্জ বাজার, ১২/১০/১২, সময় : ৪ টায় তথ্যদাতা : নাম : মো. রুহুল আমিন। পিতা : হাজী লোকমান, গ্রাম : পূর্ব কেরোয়া, ডাকঘর : ভূঁইয়া বাড়ি, পেশা : চাকরি (প্রকাশ) পূর্বপেশা : চাকরি (প্রাইভেট কোম্পানি) বয়স : ৪২, শিক্ষা : এসএসসি। বাজারের নাম : মীরগঞ্জ বাজার, (মীর পরিবার কর্তৃক বাজারের পাওনা তাদের নাম অনুযায়ী বাজারের নামকরণ হয়েছে)। বাজারের সময়কাল : তাঁর জন্মের পূর্ব থেকে বাজারের অবস্থান। তখনকার অবস্থা : আজ থেকে

www.pathagar.com

৩৫ থেকে ৪০ বছর পূর্বের দোকান-পাট, ঘর ছিল ১০ থেকে ১২ টা। চাউনি ছিল নারিকেল পাতার, বাঁশের বেতি, মুলী বাঁশের কোনো টিনের ঘর ছিল না। বাজার ছিল ছোটখাটো। এখন অনেক বড় বাজার হয়েছে। প্রায় দোকান ঘর পাকা। সামান্য টিনের ঘর রয়েছে। নারিকেল পাতা বা বাঁশের বেতি বা মুলী বাঁশের অস্তিত্ব নেই। তখন বাজারে মহিলারা আসত না। পুরুষেরাই হাট-বাজার করত। এখন মহিলা ও পুরুষের অবস্থান প্রায় সমান। বাজারে মহিলা কাস্টমার বেশি। এদের অবস্থান মধ্যবিত্ত পরিবার। অধিকাংশ প্রবাসী পরিবারের মহিলা।

তথ্যনির্দেশ

১. আশিস কুমার চক্রবর্তী, 'লোকসংস্কার', বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, (স.) দুলার চৌধুরী, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২২৮

২. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

সাধারণ জনগোষ্ঠী আদিমকাল থেকেই নিজ জীবনযাপনকে সহজসাধ্য করতে নানা প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। চারপাশের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছে জীবনের প্রয়োজনে। কৃষিজীবী, মৎসজীবী, তাঁতি প্রভৃতি শ্রেণি পেশার মানুষ, লাঙল, জাল, তাঁত, ঢেঁকি প্রভৃতি তৈরি করেছে। মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে নদীর পাশাপাশি প্রচুর খাল, বিল ও পুকুর ছিল। ফলে এখানে নানা ধরনের নৌ-যানের ব্যবহার রয়েছে। সে সূত্রে নৌকাসমূহ নির্মিত হয়।

১. ঢেঁকি

বিক্রমপুরে পূর্বে ঢেকিঁর খুব প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তা অনেক কম দেখা যায়। তবুও কিছু বাড়িতে ঢেঁকি এখনও দেখা যায়। ধান-চাল কুটতে ঢেঁকির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিক্রমপুরে সাধারণত বাড়ির পেছনের দিকে ঢেঁকিঘর থাকত। শীতের শুরুতে বাড়ির মেয়ে-বৌয়েরা ঢেঁকিতে চাল কুটে পিঠার আয়োজন করত।

২. যাঁতা

গৃহস্থ ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে যাঁতা আর একটি যন্ত্র বা হাতিয়ার, যা শস্যদানা ভেঙে অথবা গুঁড়া করে ডাল, আটা, ছাতু ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। পেষণের কাজে এরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। প্রায় তিন হাত ব্যাসার্ধের সমান দুটি পুরু ও ভারী গোলাকার প্রস্তর খণ্ড এর প্রধান উপকরণ। খণ্ড দুটি একটি মাটির কাঠামোর উপর বসানো হয়। মাটির কাঠামোটি অধিকতর প্রশস্ত ও গোলাকার; এর চারপাশে কিছুটা ফাঁকা রেখে কানা উঁচু করা হয়। যাঁতা ঘোরানোর সময় শস্যদানা চারদিক থেকে বেরিয়ে এই ফাঁকা স্থানে জমা হয়। কাঠামোর ঠিক মাঝখানে একটি শক্ত খুঁটি পোঁতা থাকে; প্রস্তর খণ্ড দুটির মধ্যভাগ গোল ছিদ্র করে এই খুঁটির ভেতর দিয়ে বসানো হয়। উপরের খণ্ডে বৃত্তের প্রান্তভাগে একটা ছোট ছিদ্র থাকে।

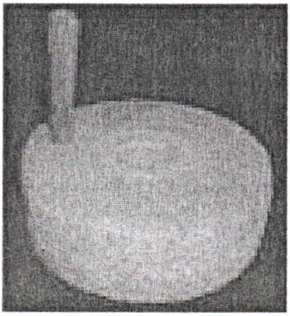

যাঁতা

www.pathagar.com

এতে কাঠের একটা সরু কিলক বা মুঠা সংযুক্ত করে তা এক হাতে ধরে ঘুরানো হয়। মুঠার বিপরীত দিকে ঈষৎ বক্র অপর একটি ছিদ্র থাকে; যাঁতা ঘুরাবার সময় মুঠ মুঠ করে শস্যদানা এই ছিদ্রপথে দিলে তা গড়িয়ে যাঁতার ভেতরে যায়। টুলের মতো দুপাশে দুটি মাটির তৈরি ঢিবি বসানো হয়। এর উপরে একজন অথবা মুখোমুখি দুজনে বসে যাঁতা ঘুরিয়ে পেষণের কাজ করে থাকে। ঘর্ষণের ফলে পাথর দুটি ভোঁতা হয়ে গেলে শিল-নোড়ার মতো ধার দিয়ে নিতে হয়। আটা গুঁড়ি করার জন্য মাটির কাঠামো আবশ্যক হয়, কিন্তু ডাল ভাঙার জন্য কাঠামো না হলেও চলে। উঠানে বা বারান্দায় চটের উপর যাঁতা পেতে মুগ, মুসরি, ছোলা ভেঙে ডাল তৈরি করা যায়। এ ধরনের যাঁতা আকারে ছোট ও স্থানান্তরযোগ্য হয়। সাধারণত ঢেঁকিঘরে ঢেঁকি ও যাঁতা বসানো হয়। ঢেঁকিঘর না থাকলে বাড়ির বারান্দার এক পাশে যাঁতা বসানো হয়। দেশজ এ প্রযুক্তি কমবেশি বিশ্বের বহু দেশেই প্রচলিত আছে। ধানকলের মতো আটাকল আমদানির আগে যাঁতার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। আটাকল চালু হলে এর ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পায়। তবে যেখানে আটাকল যায়নি, সেখানে যাঁতার ব্যবহার আগের মতোই বিদ্যমান আছে। লোকে স্থানীয় হাট-বাজার ও মেলা থেকে যাঁতা, পাটা ক্রয় করে থাকে। টেকসই হওয়ায় তারা এগুলি কয়েক পুরুষ ধরে ব্যবহার করতে পারে।

৩. বাঁশ বেতের মাছ ধরার যন্ত্র

এ জনপদে চাষাবাদের পাশাপাশি বাঁশ-বেত, মাছ শিকারের হাতিয়ার তৈরিতে অধিকাংশ লোক নিয়োজিত। চাষাবাদের পাশাপাশি সারা বছর এখানকার লোক কুটির শিল্প বিশেষত গৃহস্থালী জীবনে বাঁশ-বেতের নানাবিধ সামগ্রী, মাছ, শিকারের হাতিয়ার যেমন, জাল, ধন জাল, ঝাঁইজাল বড় জাল, বেয়ালের জাল, কৈ জাল বিঁধি ইত্যাধি নানাবিধ জাল) আন্তা, ভেণ্ডা, টুয়া, চালোইন, হারল তাছাড়া লাই, গুড়া, হাজি, টেবা, তোড়াইনয়া গুড়া প্রভৃতি সামগ্রী ঘরে বসেই নারীপুরুষ সম্মিলিতভাবে তৈরি করে। প্রায় বাড়িতেই কৃষি কাজের পাশাপাশি এ জাতীয় কুটির শিল্পের কাজ বিদ্যমান।

আন্তা তৈরি করছেন আবদুল মজিদ

www.pathagar.com

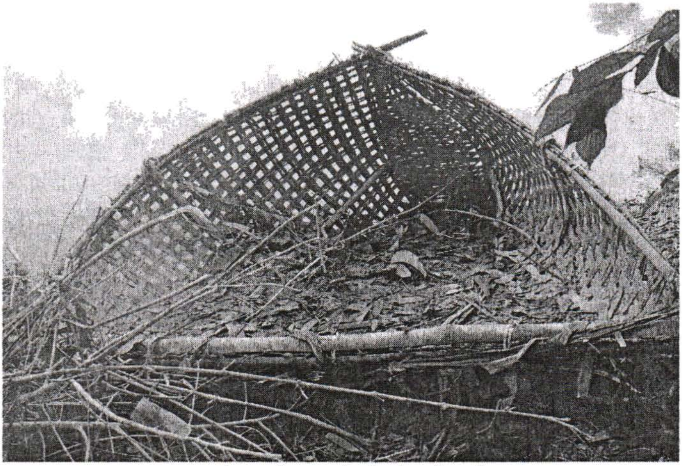

মাছ ধরার ভেঙার (হোরকা) দৃশ্য

মৎস্য শিকারের নানাবিধ সামগ্রী পুরো লক্ষ্মীপুর জেলার সর্বত্র তৈরি করা হতো। এক্ষেত্রে জেলার দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে ভৌগৌলিক ও সামগ্রিক তারতম্যের কারণে জেলার সাংস্কৃতিক বিষয়াবলিতে হেরফের রয়েছে। মাছ ধরা বা মৎস্য শিকারের হাতিয়ারের তাই তারতম্য দেখা যায়।

দূর অতীতের (৪০ থেকে ৫০ বছর) নানাবিধ মৎস্য শিকারের যন্ত্র বেশকিছু বিলুপ্ত, কিছু ক্ষয়িষ্ণু, অনেকগুলো বর্তমান।

বিলুপ্তের তালিকাও কম নয়। সংক্ষেপে : বড়কোচ, রাকসা, হাজাল, বুড়িজাল, পলো, আইডজাল, ছটকি জাল, দোনালী ও শিকের কোচ, কৈয়াজাল, টাঙ্গা, ঢাক ইত্যাদি নানা রকম মাছ ধরার সামগ্রী।

বর্তমানে প্রচলন রয়েছে

জাল, বিধি জাল, বেয়াল, শিকের কোঁচ, আন্তা, ভেগুা, টুয়া, হারল, চালোইন কারেন্ট জাল, ইলিশের জাল, ঢাক, ঝাঁইজাল।

জেলার কৃষিজীবী মানুষগুলোও সাংসারিক প্রয়োজনে তৈরি করত। এখনো কেউ কেউ করে থাকে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ছৈয়ালরাই করে থাকত এখনো করে। জেলার প্রতি বাড়িতেই একটা না একটা বাঁশঝাড় রয়েছে। এগুলোর উপকরণ প্রধানত বাঁশ। তারপর তড়কা (তালের আঁশ) টোঁয়াল (নারকেল গাছের থোঁড়) বেত, মোস্তাক ইত্যাদি যা সহজলভ্য। বাঁশ ব্যতিত বাকিগুলো বিনে পয়সায় সংগ্রহ করা যায় প্রাকৃতিকভাবে গাছ থেকে। ইদানিং প্লাস্টিকের পাত, তার, রশি ব্যাপকাকারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেত এখন দুস্প্রাপ্য।

www.pathagar.com

ক. ঋতুকাল : সারাবছরই একর্মের জন্য উপযোগী। তবে বর্ষা মৌসুম প্রধান।

ভূ-প্রকৃতি : এ অঞ্চলের মাটি উর্বর, দো-আঁশ, এ অঞ্চলে ফোঁড়াখালী খাল, মহেন্দ্র খাল, গোয়াইল্লা খাল, নানা ঝোরা ও দাঁড়া রয়েছে যা মাছ শিকারের জন্য আদর্শস্থান।

খ. আর্থিক মূল্য : বাঁশ বেতের সামগ্রীর এখনো মূল্যের তুলনায় খুবই নগণ্য। শিল্পীরা কৃষিজীবনের সাথে জড়িত বলে অল্পে তুষ্ট থাকেন। তাই এ শিল্প এখনো পুরোদমে টিকে আছে।

গ. এলাকা : হাট-বাজার পঞ্চাশ বছর আগেও এ এলাকায় ছিল না। বিশাল চরাঞ্চল ছিল। এখন কিছু কিছু হাট-বাজার গড়ে উঠেছে। পুকুরদিয়া বাজার, সফিগঞ্জ, তেওয়ারিগঞ্জ নতুন ও পুরাতন, ফরাসগঞ্জ বাজার, শান্তির হাট, (আট দশ বর্গমাইলের মধ্যে অবস্থিত।

নদনদী পুকুর দিঘি : পূর্বে (৫০ বছর) পুকুর ও দিঘির অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিল না। ৫ থেকে ৭ মাইল হেঁটে গিয়ে খাওয়ার ও গোসলের পানি আনতে হতো। এখন প্রতি বাড়িতেই পুকুর রয়েছে।

এখানে রয়েছে মহেন্দ্র খাল, ফোঁড়াখালি, গোয়াইল্লার খাল, চেঁউয়া খালী, অনেকগুলো ঝোরা, দাঁড়া।

আন্তা তৈরির দৃশ্য

আন্তা ভেণ্ডা

উপাদান বাঁশ ও তড়কা।

সংগ্রহ : বাঁশ অঞ্চল থেকে যেমন, চরশাহী, দিঘলী, কুশাখালী, হাজির পাড়া, মান্দারী, চন্দ্রগঞ্জ, তেওয়ারীগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা থেকে সংগৃহীত হয়।

www.pathagar.com

তড়কা : সহজলভ্য (তড়কা তালের আঁশ, তাল গাছের ডগার নিম্নাংশ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়।

হাতিয়ার : দা, মুগুর, পিঁড়ি, টেঁডিয়া, (বাঁধার জন্য সুতা ভোমরের সুতা)

প্রযুক্তি : নির্মাণকৌশল : বাঁশ কেটে বেতা ও শলা তৈরি করা হয়। তারপর হারল, বাঁশ, তড়কা ইত্যাদি তৈরি করা হয়ে থাকে।

উপাদান : বাংলা বাঁশ।

১টি বাঁশের দাম ১২০ টাকা।

আনা খরচ ৩০ টাকা।

১টি বাঁশে ২০টা হারল তৈরি হয়।

৮০ টাকা প্রতিটা হারল বিক্রি করা হয়।

মোট ১৬০০ টাকা।

২০টা হারল এক সপ্তাহে তিনজনে তৈরি করতে পারে।

ছাই

উপাদান : বাংলা বাঁশ, তড়কা (বিকল্প তসর, নাইলনের সুতা)

১টি বাঁশের দাম ১২০ টাকা

আনা খরচ ৩০ টাকা।

১টি বাঁশে ২০ থেকে ২২টি ছাই হয়।

প্রতিটি ছাই বিক্রি ১০০-১২০ টাকা।

২০টা ছাই বিক্রি ২০০০/- টাকা সময় এক সপ্তাহ ।

আন্তা

উপাদান : বাঁশ (বাংলা) তড়কা (বিকল্প তসর নাইলনের সুতা)

১টা বাঁশ ৮০ টাকা খরচ ২০ থেকে ১০০ টাকা

১টি বাঁশে আন্তা হয় ২০-২৫টি

প্রতিটি আন্তা বিক্রি হয় ৬০ টাকা

২০ টি আন্তা বিক্রয় মূল্য ১২০০/- টাকা

তিনজনের দুই দিন সময় লাগে স্বামী-স্ত্রী-১ মেয়ে।

রুমি- ৩২

স্বামী : নুরনবী (৪০)

লোকসংখ্যা : ০৫ জন।

কাজে জড়িত ৩ জন।

আকারআকৃতি : আকার চতুর্ভুজ (ছবি)

আন্তা : দৈর্ঘ্য ১৮˝, প্রস্থ্য : ৬˝, উচ্চতা : ১০˝

www.pathagar.com

নির্মাণকৌশল : একটা বাঁশ পানিতে জাগ দেয়া থেকে তুলে কাজের প্রয়োজনানুসারে কয়েক খণ্ড করা হয়। তারপর ফালি ফালি করে কেটে বেতা তৈরি করা হয়ে থাকে। বেতাকে আবার সরু করে শলাকার দিয়ে আন্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অনুযায়ী বা হলা করা হয়। চারকোণে দেয়ার জন্য ৪টা বাঁশের পাত দেয়া হয়, যাতে জিনিসটা শক্ত ও মজবুত হয়। এবার সর্বনিম্নের অংশ বিছানার মতো বিশেষ পদ্ধতিতে তালের আঁশ/তড়কা দিয়ে বাইন তুলে এ অংশ বানানো হয়। এবার চর্তুদিকের অংশ। দুপাশে সমান ও সমান্তরাল রেখে লম্বায় দুই পাশে সমান ও সমান্তরাল করে বানানো হয়। এখানে একটা বিশেষ দিক রয়েছে তা হল লম্বায় দুই পাশে পতুইর বা হতোইর রাখতে হয়। যা এক পাশে একটা অন্যপাশে দুটো হতোইর থাকে যা করতে শিল্পীকে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে হয়। যেখানে দিয়ে মাছ ঢুকে ভেতরে একাধিক খোপে আটকা পড়ে। উপরের দিকে চারকোণের এককোণে বা সুবিধাজনক জায়গায় বেতা কেটে একটা হোলাকৃতি বা চতুষ্কোণ ফাঁক করে রাখতে হয় দ্রুত মাছ আন্তার ভিতর থেকে ঝেড়ে বাহির করার জন্য। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড তৈরি হয়ে গেলে তা বিশেষ পদ্ধতিতে জোড়া লাগিয়ে পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র তৈরি করা হয়।

ব্যবহার বা মাছ ধরার কাজে পাতার কৌশল

মাছ ধরতে যন্ত্রের ব্যবহার করাকে আন্তা পাতা বলে।

কৌশল ও স্থান নির্বাচন : আন্তার উচ্চতা বেশ লক্ষ্যণীয় ক্ষেত, (পাতার) জলাশয়, পানির পরিমাণ অনুযায়ী আন্তার উচ্চতা এমনকি দৈর্ঘ্য প্রস্থেরও হেরফের হয়ে থাকে। বিশেষত পানির উচ্চতার উপর আন্তার উচ্চতা মিল থাকতে হবে যাতে পতোইর দিয়ে মাছ অনায়াসে ঢুকতে পারে। সেক্ষেত্রে আন্তার উচ্চতা ৬″ থেকে ৭″, ৮″, ৯″, ১০″,১১″ ও ১২ ইঞ্চি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ও হেরফের হয়ে থাকে। প্রথমেই লাগবে পরিমিত পানি, স্রোত বা প্রবাহ যে পরিবেশে মাছ চলাচল করে থাকে। আদর্শ স্থান হলো ধান ক্ষেতের আল (পানিতে ডুবন্তবা ডুবুডুবু। অথবা উঁচু আড়া যা কেটে আন্তা পাতা বা বসানো হবে। সে ক্ষেত্রে পানির স্রোত অবশ্যই বইতে হবে। আন্তা বসানোর সময় আন্তার পরিমাণ নিচের মাটি বা জমিন সমান করতে হবে যাতে নিচে দিয়ে মাছ যাতায়াত করতে না পারে। পাতার পর দুই পাশে ফাঁক ফোকর থাকলে মাটি দিয়ে ইনট্যাক্ট করতে হবে। সামনে পিছনে থাকবে উম্মুক্ত, সে দুদিকে খোলা পতুইর থাকবে। এরপর উপরে যে স্থান দিয়ে মাছ ঝাড়া হবে তাতে কচুরীপানা বা গাজা দিয়ে বন্ধ করতে হবে। বেশি খেয়াল রাখতে হবে দুদিকের পতুইর যাতে পানির উপর না থাকে বা বেশি পানিতে ডুবে না থাকে।

আন্তার মাছ : যে সব মাছ আন্তা পেতে ধরা হয় : পুঁটি, পাবদা, কৈয়া পোনা খৈয়াপোনা, কৈ, খৈয়া, মেনি (ভেদা) ট্যাকসা গুড়া, ইছাগুঁড়া (চিংড়ি) বাইন, ভুইচ্ছা (সাগুারা) কানিপোনা, গড়ি ও টাকি ইত্যাদি। (ট্যাকসা বৈছা)।

www.pathagar.com

ছাই : আকার/আকৃতি : ডোঙ্গার মতো।

দৈর্ঘ্য : ১৮˝ গোলাকৃতি বেষ্টনীবিশিষ্ট।

এক পাশে ৩২˝ সামনের দিক অন্য পাশে ৩০˝ পেছনের দিক। (আদর্শ স্থানীয়) সামনের দিক মুখ বলা হয়ে থাকে যাতে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যেখানে পতোইর থাকে (মাছ ঢোকার স্থান) এটা তৈরিতে দক্ষতার বেশ প্রয়োজন। যন্ত্রের ভেতরে ফাঁপা থাকে। পেছনের দিক প্রথম থেকে সরু হতে হতে শেষ সংকুচিত হয়। এ শেষের অংশ সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয় একটা আলাদা অংশ দিয়ে যাতে মাছ ঢুকলে কোন অবস্থাতেই বের হতে না পারে। বাঁশের শলাকা ও তড়কা দিয়ে গেঁথে গেঁথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ যন্ত্র তৈরি হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্যের দিক শলাকা ও চতুর্দিকে তড়কা দিয়ে গেঁথে বাঁশের শক্তপাত চর্তুদিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বেঁধে দেয়া হয়। যাতে যন্ত্র থেতলে বা বসে না যায়। দ্রুত মাছ বাহির করার জন্য সামনের পতোইর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনা হয়। কখনো কখনো পাতোইর খুলে মাছ বাহির করার ব্যবস্থাও থাকে।

স্থান নির্বাচন : পানির পরিমাণে পাততে হয়। অর্থাৎ যন্ত্র পানিতে ডুবে থাকে। কিন্তু পতোইরের মুখ খোলা থাকবে। বাকি সম্মুখভাগে মাটির বাঁধ থাকে। এ যন্ত্রে ধৃত মাছ— শিং মাগুর, গজার, শোল, বাইন, কৈ, খৈয়া, ইছা মাছ, টেংরা, মেনি মাছ ইত্যাদি।

চালি বা চালুইন : ঘন টেংরা বাইন বিশিষ্ট দুটো চালির খণ্ড বা অংশ থাকে যা দুদিক থেকে এসে আড়াআড়িভাবে সংযোগ করে বাঁধা থেকে আলতোভাবে ধাক্কা খেলে ফাঁক হয়ে যায়। যাত্রী চলে যাবার পর আবার এসে মিলে যায়। দুটো অংশ সমান হতে পারে, আবার একটা বড় একটা ছোটও হতে পারে। এ যন্ত্রের দৈর্ঘ্য ১৮˝ থেকে ২৪˝ পর্যন্ত হতে পারে। দুখণ্ড দুদিক থেকে আড়াআড়ি জোড়া লাগানো হয়।

নির্মাণকৌশল : আন্তা ও চাইয়ের মতো চিকন বাঁশের শলাকা তৈরি করে ১৮˝ থেকে ২৪˝ দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ১৪˝ থেকে ১৫˝ তড়কা দিয়ে বাইন তুলে তৈরি করা হয়। সমান বা অসমান দুই অংশ তৈরি করে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। এটা অনেকটা দরজার মতো সহজে ঢোকা যায়, জানপ্রাণ দিয়েও বের হওয়া যায় না।

পাতার স্থান : এ যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বাঁধা পুকুরে জান বা মাটির আড়া বা উচুঁ আলের মাঝখানে বা একপাশে পাতা হয়। এ যন্ত্রে নির্দিষ্ট স্থানে মাছ ঢোকানোর ব্যবহার মাত্র। যন্ত্রে কোনও মাছ আটকানো বা ধরা যায় না। বাঁধানো স্থানে কেটে দুই দিকের জলাশয় বা জলাধার সম্মিলিত করে মাঝখানে দুই দিক থেকে আড়াআড়ি যন্ত্র বসিয়ে ক্ষীণবাধার সৃষ্টি করা হয়। একমাত্র একদিক থেকেই ধাক্কা দিয়ে জোর করে ঢুকা যায়- বের হয়ে আসার রাস্তা থাকে না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি